ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৮

আলতামাশ

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৮

আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৮
আলতামাশ

পৃষ্ঠা ঃ ২৫৬ (ফর্মা ১৬)

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-১২
ISBN-984-8925-09-9

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে—বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। — মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সূচীপত্রঃ

দ্বিতীয় দরবেশ

ক্রুসেডাররা মসুলের সন্নিকটে পাহাড়ের অভ্যন্তরে যে বিপুল অস্ত্র ও তরল দাহ্য পদার্থ মজুদ করেছিলো, তদ্বারা সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা মুহূর্ত মধ্যে সব ধ্বংস করে দিলো। ক্রুসেডারদের জন্য সে ছিলো এক প্রচণ্ড আঘাত। তাদের সব আয়োজন, সব নাটক তছনছ হয়ে গেলো।

সংগ্রহটা ছিলো পাহাড়ের বিস্তীর্ণ গুহার অভ্যন্তরে। আগুন লাগার পর বিস্ফোরণে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মাটি কেঁপে ওঠে, যেনো ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু কেউ জানে না, ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো।

এ ঘটনায় ক্রুসেডারদের বড় মিত্র ইযযুদ্দীনের কোমর ভেঙে গেছে। ক্রুসেডাররা নিশ্চিত, এটা দুর্ঘটনা নয়– বরং সালাহুদ্দীন আইউবীর গুপ্তচরদের কাজ।

ক্রুসেডাররা মসুলের শাসনকর্তা ইযযুদ্দীনকে মিত্র বানিয়ে মসুলের পার্বত্য অঞ্চলে অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও রসদপাতি সংগ্রহ করে সুলতান আইউবীর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাদী নামক একটি মাত্র মেয়ে সঙ্গী হাসান আল-ইদরীসের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

জনগকে এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ক্রুসেডাররা এক দরবেশের নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করেছে, এই দরবেশ উক্ত পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন এবং খোদা তাকে মসুলের বিজয়ের ইঙ্গিত প্রদান করবেন। তারপর মসুল তথা ইযযুদ্দীনের সাম্রাজ্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু পরিণামে দরবেশও অস্ত্র গুদানের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে।

একদিন কেটে গেছে। মসুলের জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। রাতে যে বিস্ফোরণটা ঘটলো এবং এই যে মাঠ কেঁপে কেঁপে ওঠেছিলো, ঘটনাটা কী ঘটেছিলো তারা জানে না। বিষয়টা তাদের বলবার মতোও কেউ নেই। দাহ্য পদার্থগুলো কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। সেই সঙ্গে সুপরিসর

গুহায় যেসব রসদ রাখা হয়েছিলো, সেগুলোও পুড়ে যায়। ভয়ে কেউ ওদিকে পা বাড়াচ্ছে না। সকলের ধারণা, এটা হয় দরবেশের কেরামত, নয়তো আল্লাহর গজব। এমনি ভীতিকর এক পরিস্থিতিতে তাদের কানে একটি শব্দ ভেসে আসে– 'তিনি জাহান্নামে চলে গেছেন। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।'

ইনি সবুজ আবা পরিহিত আরেক দরবেশ। মাথায় লম্বা সাদা চুল। মুখে আবক্ষ-লম্বিত সাদা দাড়ি। মুখে বার্ধক্যের বলিরেখা। এক হাতে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা একটা লাঠি, অপর হাতে পাক কুরআন। প্রথম দরবেশের ন্যায় ইনিও হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেন এবং বাজারে ঢুকে পড়েন। উৎসুক জনতা ভক্তি গদ গদ চিত্তে তার চারপার্শ্বে এসে ভিড় জমায়। মাঝ বাজারে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'তিনি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে গেছেন, যিনি বলতেন খোদা তাকে ইশারা দেবেন। যদি তার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করো, তাহলে তোমরাও সেই জাহান্নামের আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। খোদা রাতের বজ্রনিনাদে তোমাদেরকে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আকাশ ছেয়ে যাওয়া সেই কালো ধোঁয়ার কথা মনে করো। আল্লাহর রোষকে ভয় করো। আমার হাতে যে পত্রখানা দেখতে পাচ্ছো, এটি মান্য করো। এটি আল্লাহর কালাম। এটি পাক কুরআন।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে বলুন'– 'এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে– 'এসব কী ছিলো? তিনি কে ছিলেন? আপনি কে? বলুন, রাতে মাটি কেনো কেঁপে ওঠেছিলো? কালো ধোঁয়াগুলো কী ছিলো?'

'তিনি আত্মহারা ছিলেন'– নতুন দরবেশ বললেন– 'পাগল ছিলেন। তিনি আল্লাহর রহস্যের জগতে হস্তক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বিজয় কিংবা অন্য কোন আগাম সংবাদ দিতে পারেন না। জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা সবই আল্লাহর হাতে। নিজেকে আল্লাহর দূত দাবি করে তিনি গুনাহগার হয়েছেন। তিনি তার শাস্তি পেয়ে গেছেন। তোমরা গিয়ে দেখে আসো, পাহাড় এখনো জ্বলছে। সেই মিথ্যাবাদী দরবেশকে এখনো যদি তোমরা সত্য বলে মান্য করো, তাহলে তোমরাও পুড়ে মরবে।'

'বলুন সঠিক কে?'– জনতা জিজ্ঞেস করে– 'আপনি কি সত্য?'

'না'– দরবেশ উত্তর দেন এবং কুরআনখানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন– 'আল্লাহর এই কালাম সত্য। সেই দরবেশকে ভুলে যাও। এই কিতাবের

কথা মান্য করো। আল্লাহ এর মধ্যে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কোনো মানুষ দিতে পারে না।'

দরবেশ সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেন।

দরবেশ দিনভর মসুলের অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা দিতে থাকেন– তিনি জাহান্নামে ভস্ম হয়ে গেছেন, তিনি নিজের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।

জনতা যেখানেই তাকে ঘিরে ধরছে, দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন– 'কোনো মানুষ গায়েব জানে না। কুরআনে যা কিছু আছে, তা-ই খোদার ইঙ্গিত।'

দরবেশ এক মসজিদে জোহর নামায আদায় করেন। আসর পড়েন অন্য মসজিদে। মাগরিব আরেক মসজিদে। মসজিদে ঢুকলেই মুসল্লীরা তাকে ঘিরে ধরছে। তিনি ওয়াজ করছেন– 'লোক সকল! একমাত্র কুরআনই সত্য। তোমরা কুরআনের ইঙ্গিত অনুযায়ী আমল করো।'

মাগরিবের নামায আদায় করে দরবেশ এক মসজিদ থেকে বের হন। এক বিরান অঞ্চল অভিমুখে হাঁটতে শুরু করেন। জনতাও তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। তিনি সকলকে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'এখন আর তোমরা আমার পেছনে এসো না। আমি সারা রাত ঐ বিজন এলাকায় ইবাদত করবো। আমি তোমাদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করবো।'

নতুন দরবেশ মানুষের উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলেন যে, তাদের মন থেকে প্রথম দরবেশের ভীতি দূর হয়ে গেছে। জনতাকে নিয়ে তিনি হাত তুলে দু'আ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান। মানুষ ওখানেই দাঁড়িয়ে কানাঘুষা শুরু করে। নিষেধ করার পর একজন মানুষও দরবেশের পেছনে যেতে সাহস করলো না।

কিন্তু এক ব্যক্তি দরবেশের পিছু নেয়। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখেনি। দরবেশ জনতার চোখের আড়ালে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। তাকে অনুসরণকারী লোকটিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। হঠাৎ দরবেশ কার যেনো পায়ের শব্দ শুনতে পান। দাঁড়িয়ে পেছন পানে তাকান। অন্ধকারে ছায়ার মতো কী যেনো দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ ছায়াটা থেমে যায় এবং বসে পড়ে। দরবেশ ইতিউতি তাকান আর কিছু না দেখে হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু তার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। এখন বারবার তিনি পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন।

দরবেশ আরো কিছু পথ এগিয়ে যান। এবার পেছনের লোকটা দরবেশের কাছাকাছি চলে এসেছে। দরবেশ কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। তিনি হাঁটার গতি মন্থর করে দেন। পেছনের লোকটা কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে বেড়ালের ন্যায় পা টিপে টিপে দরবেশের একেবারে কাছে চলে যায়। খঞ্জরধারী হাতটা উপরে তুলে ধরে। পেছন থেকে আঘাত হেনে দরবেশকে শেষ করে ফেলা তার পরিকল্পনা। খঞ্জরটা এখনো তার উপরে ঝুলছে। এমন সময় দরবেশ বিদ্যুতের ন্যায় মোড় ঘুরে দাঁড়ান। হাতের মোটা লাঠিটা উর্ধ্বে তুলে চারদিক ঘোরান। লাঠি আক্রমণোদ্যত লোকটির খঞ্জরধারী বাহুতে গিয়ে আঘাত করে। সেই সঙ্গে লোকটার পেটে এমন এক লাথি মারেন যে, লোকটা চিৎ হয়ে পেছন দিকে পড়ে যায়। দরবেশের এক হাতে কুরআন। লড়তে হবে অপর এক হাতেই। তিনি লোকটার মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত হানেন। তার খঞ্জর হাত থেকে ছুটে পড়ে যায়।

দরবেশ খঞ্জরটা তুলে নেন। আক্রমণকারী লোকটা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। দরবেশ তাকে বললেন– 'খঞ্জর আমার হাতে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো।'

লোকটি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। দরবেশ মুখে পশুর ডাকের ন্যায় শব্দ করেন। দূর এক স্থান থেকেও অনুরূপ শব্দ ভেসে আসে। দরবেশ পুনরায় শব্দ করেন। অন্ধকারে ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা যায়। দু'জন লোক দরবেশের কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়। দরবেশ হেসে বললেন– 'আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম, এই হতভাগা তা-ই ঘটাতে যাচ্ছিলো। আমার তো ধারণা ছিলো, দিনেই মসুলের কোনো এক স্থান থেকে তীর এসে আমার হৃদপিণ্ডে গেঁথে যাবে। কিন্তু তারা আমাকে রাতে এর দ্বারা খুন করাবার চেষ্টা করেছে। এই নাও তার খঞ্জর।'

দরবেশ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে লাঠি দ্বারা হাল্কা খোঁচা দিয়ে বললেন– 'ওঠ্ শয়তান। তুই কি মুসলমান?'

'হ্যাঁ হযরত!'– লোকটি আদবের সঙ্গে উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমান।'

দরবেশ ও তার সঙ্গী দু'জন খিল খিল করে হেসে ফেলেন। দরবেশ বললেন– 'আমাকে হযরত বলো না বন্ধু! আমি তোমার চেয়েও বেশি যুবক।'

'তোমার ছদ্মবেশ সার্থক হয়েছে।' দরবেশের এক সঙ্গী বললো।

তিনজন আক্রমণকারী লোকটাকে সঙ্গে করে দূরে এক তাঁবুতে নিয়ে

যায়। তাঁবুর সন্নিকটে চার-পাঁচটি উট বাঁধা আছে। আশপাশ টিলায় ঘেরা। লোকটাকে তাঁবুতে বসিয়ে রাখা হলো। তাঁবুতে বাতি জ্বলছে। দরবেশকে আশি বছরের বৃদ্ধ বলে মনে হয়েছিলো। এখন কথা বলছেন ঠিক একজন নওজোয়ানের ন্যায়। দরবেশ মুখের সাদা দাড়ি এবং মাথার কৃত্রিম চুল খুলে আসল রূপে আবির্ভূত হন। ভেজা কাপড়ে মুখমণ্ডলটা ভালোভাবে ডলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন। এখন তিনি বৃদ্ধ নন– পঁচিশ বছর বয়সের তাগড়া যুবক।

'তুমি আসলে কে?' আক্রমণকারী জিজ্ঞেস করে।

'যাকে তুমি হত্যা করতে এসেছো'– যুবক উত্তর দেয়– 'আমাকে খুন করতে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? লুকাবার চেষ্টা করলে তোমাকে বড় কষ্টদায়ক মৃত্যু ভোগ করতে হবে।'

'আমার কাছে লুকাবার মতো কিছুই নেই'– লোকটি উত্তর দেয়– 'মহলের এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর আমাকে বললেন, শহরে এক দরবেশ ঘুরে ফিরছে। তিনি আমাকে আপনার গঠন-আকৃতি ও বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, লোকটাকে অন্ধকারে হত্যা করতে হবে। কেউ যেনো টের না পায়। কাজটা করে গেলে আমাকে দু'শ' দিনার পুরস্কার দেবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন।'

'আহমদ ইবনে আমর কি আমাকে বৃদ্ধ এবং দরবেশই মনে করেছিলেন?'

'তা বলেননি'– লোকটি উত্তর দেয়– 'আমাকে শুধু বললেন, দরবেশটাকে খুন করতে হবে।'

ছদ্মবেশী এই দরবেশ ও তার সঙ্গী দু'জন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সদস্য। মসুলে কর্মরত। গত পর্বের কাহিনীর দরবেশের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর করার লক্ষ্যে আইউবী পক্ষের লোকেরা এই লোকটিকে দরবেশ সাজিয়ে নগরীতে ঘুরিয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত মানুষগুলো দরবেশদেরকে খোদার কণ্ঠ বলে বিশ্বাস করতো। প্রথম দরবেশকে ক্রুসেডাররা তাদের এক প্রতারণার সাফল্যের জন্য ব্যবহার করেছিলো। সুলতান আইউবীর লোকেরা তাদের এক যুবক সহকর্মীকে দরবেশের রূপে উপস্থাপন করে বিভ্রান্ত জনতাকে কুসংস্কার ও কল্পনাপূজা থেকে সরিয়ে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

আহমদ ইবনে আমর মসুলে ইবনে আমর নামে পরিচিত। মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের প্রশাসনের মন্ত্রী পদমর্যাদার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি সংবাদ পান, এক দরবেশ শহরে প্রথম দরবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে ফিরছেন। তিনি বুঝে ফেললেন, এই দরবেশ সুলতান আইউবীর পক্ষের লোক তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই তাকে খুন করা আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের কাছে প্রথম দরবেশের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং পাহাড়ের অভ্যন্তরে কী সব জ্বলছে জেনে ফেলবে।

সুলতান আইউবীর এই লোকটাকে হত্যা করার জন্য মহলের নিরাপত্তা বিভাগের এক সৈনিককে নির্বাচন করা হয়। তাকে দু'শ' দিনার পুরস্কারের প্রলোভন দিয়ে দরবেশকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই ভাড়াটে খুনী যাকে বৃদ্ধ মনে করছিলো, সে এক তাগড়া যুবক বলে আত্মপ্রকাশ করলো। তার জানা ছিলো না, বৃদ্ধরূপী এই যুবক এক অভিজ্ঞ লড়াকু গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈনিক।

ইবনে আমর প্রেরিত এই ঘাতককে তাঁবুতে দীপের আলোতে বসিয়ে বহু কিছু জিজ্ঞেস করা হলো। কিন্তু কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। সে ক্রুসেডারদের নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচর কিংবা নাশকতাকারী গ্রুপের লোক নয়। সে ভাড়ায় খুন করতে এসেছিলো। দরবেশরূপী লোকটি তার উভয় সঙ্গীর প্রতি তাকায়। তিনজন চোখে চোখে কথা বলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। একজন উঠে তাঁবু থেকে এক গজ লম্বা এক টুকরো রশি নিয়ে আসে। লোকটার পেছন থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ধরে রাখে। লোকটা ছটফট করতে শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিথর হয়ে যায়।

পরদিন। আহমদ ইবনে আমর মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের দেউড়িতে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার। ইয্যুদ্দীনেরও চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। ইবনে আমরের হাতে এক চিলতে কাগজ। সম্মুখে মেঝেতে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ, যার গলায় রশি পেঁচানো। সেই রশির সঙ্গেই এই চিরকুটটা বাধা ছিলো।

লাশটা নিরাপত্তা বাহিনীর সেই সৈনিকের, যাকে নতুন দরবেশকে হত্যা করতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। ইবনে আমর সারাটা রাত তার অপেক্ষায় নির্ঘুম অতিবাহিত করেছেন। ভোরে তার নিকট সংবাদ আসে, তার বাসভবনের সামনে একটি লাশ পড়ে আছে। তিনি দ্রুত ছুটে আসেন। ভবনের সম্মুখে মাটিতে তার সেই সৈনিকেরই লাশ পড়ে আছে। চোখ দুটো

খোলা। জিহ্বাটা বেরিয়ে আছে। গলায় রশি পেঁচানো। রশির সঙ্গে এক টুকরো কাগজ বাঁধা।

কাগজে লেখা আছে-

'মসুলের তথাকথিত শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন! তোমার এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর এই ব্যক্তিকে আমাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলো। আমি তার মৃতদেহটা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আহমদ ইবনে আমরের আঙ্গিনায় রেখে গেলাম। হতভাগা আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। তুমিও তেমনি এক হতভাগা যে, আজো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এতোটুকু ক্ষতি করতে পারোনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। কাফেরদের বন্ধুত্ব থেকে তুমি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আমরা তোমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবো না। একদিন তোমার লাশটাও তোমার প্রাসাদের আঙ্গিনায় পড়ে থাকবে। আহমদ ইবনে আমরের ন্যায় কর্মকর্তা-উপদেষ্টাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলো। এরা চাটুকারের দল। কখনোই তোমার অনুগত নয়। এরা তোমাকে পতনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শক্তিটা দেখো। তোমার সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বৈরুতে ক্রুসেডারদের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়েছিলো। কিন্তু আমরা তাকে গুম করে ফেলেছি। এখন সে সুলতান আইউবীর কাছে অবস্থান করছে। তোমার খৃস্টান বন্ধুরা পর্বতমালা খনন করে তার অভ্যন্তরে সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করেছিলো। আমরা সেসব ভস্ম করে তোমার সিংহাসনে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছি। তুমি তোমার এক সৈনিককে আমাকে খুন করতে প্রেরণ করেছিলে। আমরা নৈতিকতার সঙ্গে তার লাশটা তোমাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমরা জিন-ভূতের ন্যায় তোমাদের উপর সওয়ার হয়ে থাকবো। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তোমার পতন শুরু হয়ে গেছে। মুক্তি যদি পেতে চাও, তো সালাহুদ্দীন আইউবীর আনুগত্যের বিকল্প নেই। যাও সুলতান আইউবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ো এবং বাহিনীটাকে তার হাতে তুলে দাও। আমাদেরকে প্রথম কেবলা মুক্ত করতে হবে। এই জাগতিক ভোগ-বিলাস, রং-তামাশা ত্যাগ করো। রাজ্য-সিংহাসন কোনোদিন কারো সঙ্গে কবরে যায়নি।'

আহমদ ইবনে আমর লাশটা নিজ গৃহের সম্মুখ থেকে তুলে ইয্যুদ্দীনের সামনে নিয়ে রাখেন। ইয্যুদ্দীন পত্রখানা পাঠ করে আহমদ ইবনে আমরের হাতে ফেরত দিয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। ইবনে আমর ক্ষোভ প্রকাশ

কল্লেও ইয্‌যুদ্দীন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করছেন।

'আমি সংবাদ পেয়েছি, মসজিদে মসজিদেও নাকি এই নতুন দরবেশের আলোচনা চলছে'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এখন এই পত্র দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেলো দরবেশ আসলে দরবেশ নয়– সালাহুদ্দীন আইউবীর লোক।'

ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আমরের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে পেঁচিয়ে লাশটার উপর ছুঁড়ে মারেন।

'আমি তাকে খুঁজে বের করবো'– ইবনে আমর ক্ষোভের সাথে বললো– 'ধরে এনে জনসম্মুখে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।'

'আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এই একটা লোককে হত্যা করে তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদেরকে অন্যকিছু করতে হবে। অন্যকিছু ভাবতে হবে। আমি চাচ্ছিলাম, ক্রুসেডাররা আইউবীর উপর আক্রমণ করুক। কিন্তু জানি না তারা কেনো সামনে আসছে না। তারা চাচ্ছে প্রকাশে আমি আইউবীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হই। পরে তারা আমাকে এভাবে সাহায্য করবে যে, তাদের গেরিলা বাহিনী আইউবীর পার্শ্ব, পেছন এবং রসদের উপর কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে। এ প্রক্রিয়ায়ও আমি যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য অর্জন করতে পারি।'

'আর হবেও নিশ্চয়ই।' ইবনে আমর মেঝেতে পা দ্বারা আঘাত হেনে বললো।

'এই পত্রে সঠিক লেখা হয়েছে যে, তোমরা চাটুকার'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'আমি এক মহাসংকটে নিপতিত আর তোমরা আমাকে খুশি করার জন্য শিশুর ন্যায় কথা বলছো। তোমরা কি আমাকে ভালো কোন পরামর্শ দিতে পারো না?'

ইয্‌যুদ্দীন হাত তালি দেন। এক যুবতী সেবিকা ছুটে এসে অবনত মস্তকে সালাম করে দাঁড়িয়ে যায়। ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'দারোয়ানকে বলো, লাশটা তুলে নিয়ে কোথাও দাফন করে রাখুক।' বলেই তিনি নিজের খাস কক্ষে চলে যান। আহমদ ইবনে আমরও সঙ্গে আছেন। ইয্‌যুদ্দীন পুনরায় বেরিয়ে এসে সেবিকাকে বললেন– 'সোরাহি-পেয়ালা নিয়ে আসো। দারোয়ানকে বলে দাও, এদিকে যেনো কাউকে আসতে না দেয়।'

সেবিকা লাশটা দেখে ভয় পেয়ে যায়। মোচড়ানো কাগজটার উপর তার চোখ পড়ে। মেয়েটা আরবী জানে। খুলে লেখাগুলো পড়েই কাগজটা কাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। তারপর এক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে

দারোয়ানকে বললো, লাশটা তুলে দাফন করিয়ে ফেলো। বলেই একটা সোনার থালায় করে একটা সোরাহি আর দুটো পেয়ালা নিয়ে ইয্যুদ্দীনের কক্ষে ফিরে যায়।

'আর্মেনীয় সম্রাট আমার বার্তার উত্তর দিয়েছেন'– ইয্যুদ্দীন ইবনে আমরকে বলছেন– 'তিনি আমাকে তাঁর রাজধানী তালখালেদের পরিবর্তে হারযাম যেতে বলেছেন। নিজে তালখালেদ থেকে রওনা হয়ে গেছেন। আমি দু'দিন পর যাচ্ছি।'

সেবিকা পেয়ালায় দ্রুত মদ ঢালার পরিবর্তে ধীরে ধীরে কাপড় দ্বারা পেয়ালাগুলো মুছতে থাকে। মেয়েটা ইয্যুদ্দীনের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছে।

'আমার মনে হচ্ছে আর্মেনীয় সম্রাটের তালখালেদ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল।' ইবনে আমর বললো।

'কারণ সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন, তাই না?'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'তুমি ভয় করছো, আর্মেনীয় সম্রাটের অবর্তমানে সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অবরোধ করে ফেলবেন। না, এমনটা হবে না। হয়ও যদি আমরা আইউবীর উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাবো। এই যুদ্ধকে আমরা দীর্ঘ করে তুলবো এবং ক্রুসেডারদের অবহিত করবো। তারাও আইউবীর উপর আক্রমণ চালাবে। আমি নিশ্চিত, এমনটা হলে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী পিষে যাবে।'

'আপনি কবে যাচ্ছেন?' ইবনে আমর জিজ্ঞেস করে।

'দু'দিন পর।' ইয্যুদ্দীন উত্তর দেন।

মদ পরিবেশনে আর বিলম্ব করা যাচ্ছে না। সেবিকা পেয়ালা দুটোয় মদ ঢেলে দু'জনের সামনে পেশ করে। ইয্যুদ্দীন বললেন, এবার তুমি চলে যাও। সেবিকা দেউড়িতে গিয়ে দেখে লাশটা তুলে নেয়া হয়েছে। মেয়েটি এখনই বাইরে বেরুতে পারছে না। ডিউটি আছে। সে বসে বসে ভাবতে শুরু করে। হঠাৎ তার মুখ থেকে সশব্দে 'আহ!' বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে পেটটা চেপে ধরে। মাথাটা নত করে ফেলে। দারোয়ান ও অন্যান্য চাকররা ছুটে আসে। সেবিকা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো– 'হঠাৎ পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।' তৎক্ষণাৎ অন্য এক সেবিকাকে ডেকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারকে বলা হলো, পেটে হঠাৎ ব্যাথা শুরু হয়ে গেছে– প্রচণ্ড

ব্যথা। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বললেন, তোমাকে দু'দিন বিশ্রামে থাকতে হবে।

অল্প পরই সেবিকার সব ঠিক হয়ে যায়। ডাক্তার তাকে দু'দিনের ছুটি দিয়ে বললেন, নিজের কক্ষে গিয়ে আরাম করো। সেবিকা নিজ কক্ষে না গিয়ে অলি-গলি ঘুরে ইয্‌যুদ্দীনের স্ত্রী রোজি খাতুনের কক্ষে চলে যায়।

রোজি খাতুন কক্ষে উপবিষ্ট। ইয্‌যুদ্দীনের সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করে।

'পেট ব্যথার বাহানা করে এসেছি'– সেবিকা বললো– 'ডাক্তার আজ এবং কালকের ছুটি দিয়েছেন।'

মেয়েটি লাশের উপর থেকে যে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়েছিলো, সেটি কামিজের ভেতর থেকে বের করে রোজি খাতুনের হাতে দিয়ে বললো– 'এই কাগজটা এক সৈনিকের লাশের সঙ্গে ছিলো।'

রোজি খাতুন কাগজটা খুলে পাঠ করে বললেন– 'শাবাশ! আমাদের মুজাহিদরা কাজ করছে। তো এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগ্যরা আমাদের এই লোকটাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। আমি সংবাদ পেয়েছি, আমাদের এই দরবেশ মানুষের অন্তর থেকে ক্রুসেডারদের দরবেশের ভীতি ও প্রভাব বের করে দিয়েছে।'

'এই পত্র তারই'– সেবিকা বললো– 'আমি তার হাতের লেখা চিনি।'

রোজি খাতুন হেসে বললেন– 'আমি জানি। তুমি তার হাতের লেখা-ই নয়– হৃদয়টাও চেনো। তবে খেয়াল রাখবে, হৃদয়ের জালেই আটকে থেকো না। কর্তব্য সকলের আগে।'

সেবিকা লজ্জা পেয়ে যায়। লাজুক কণ্ঠে বললো– 'এ পর্যন্ত নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে কর্তব্যের পথে আসতে দেইনি। ফাহ্‌দকেও এ কথাই বলি, আমি তোমাকে ভালোবাসি ঠিক; কিন্তু কর্তব্য যেনো সবার উপরে থাকে।'

ফাহ্‌দ সেই যুবক, যে দরবেশের রূপ ধারণ করেছিলো। বাড়ি বাগদাদ। গোয়েন্দা হওয়ার জন্য যতোগুলো গুণের প্রয়োজন, সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। রূপবান যুবক। দু'বছর যাবত মসুলে অবস্থান করছে এবং সফলতার সাথে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। এই সূত্রেই ইয্‌যুদ্দীনের এই সেবিকার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ। দু'জন দু'জনের হৃদয়ে ঢুকে গেছে।

সেবিকা শহরে থাকে। তবে তার বেশিরভাগ সময় কাটে রাজপ্রাসাদে ডিউটিতে। গুপ্তচরবৃত্তির গোপন তৎপরতা ছাড়াও অন্য প্রয়োজনে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে থাকে।

'আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি, এখনো তা বলা হয়নি'– সেবিকা রোজি খাতুনকে বললো– 'ইয্‌যুদ্দীন দু'দিন পর আর্মেনিয়ার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম যাচ্ছেন। মদ পরিবেশনের সময় আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি আহমদ ইবনে আমরকে বলছিলেন, আর্মেনিয়ার সম্রাট বার্তা পঠিয়েছেন, তিনি তালখালেদ থেকে হারযাম অভিমুখে রওনা করেছেন এবং আমার সঙ্গে ওখানে সাক্ষাৎ করবেন। আমি বের হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই পেট ব্যথার অজুহাত তৈরি করে আপনার কাছে এসেছি।'

রোজি খাতুন নিজ উরুতে চাপড় মেরে বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী তালখালেদ অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। আমার জানা নেই, তালখালেদে আমাদের গুপ্তচর আছে কিনা। সংবাদটা আইউবীকে জানানো আবশ্যক। হতে পারে তিনি দু'জনকে হারযামেই পাকড়াও করে ফেলবেন। কাজটা তুমিও করতে পারো। ফাহ্‌দ কিংবা তার কোনো একজন সঙ্গীর নিকট যাও। সংবাদটা অবহিত করে আমার পক্ষ থেকে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবী এই মুহূর্তে তালখালেদের পথে থাকবেন। সংবাদটা যেনো তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়। তুমি এক্ষুনি যাও।'

সেবিকা চলে যায়।

পরক্ষণেই ইয্‌যুদ্দীন রোজি খাতুনের কক্ষে প্রবেশ করেন। চেহারায় প্রচণ্ড ভীতির ছাপ। রোজি খাতুন তার এই পেরেশানীর কারণ জানেন। তথাপি জিজ্ঞেস করেন– 'আপনাকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। কারণ কী?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রুতা আর ক্রুসেডারদের বন্ধুত্বের শিল-পাটায় পিষে যাচ্ছি।' ইয্‌যুদ্দীন পরাজিত কণ্ঠে বললেন।

'আমার পূর্ণ আন্তরিকতা, হৃদ্যতা আপনার সঙ্গে'– রোজি খাতুন বললেন– 'কিন্তু যখন আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষে কথা বলি, তখন আপনার সন্দেহ জাগে, আমি তার সমর্থক এবং আপনার বিরোধী। আপনার প্রকৃত সমস্যা এই নয় যে, আপনার ও সালাহুদ্দীন আইউবীর মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আপনি সেই জাতিকে বন্ধু ভেবে বসেছেন, যারা আপনার বন্ধু হতে পারে; কিন্তু আপনার ধর্মের আপন হতে পারে না। ক্রুসেডাররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাকে ধোঁকা দেবে এবং অবশ্যই দেবে।'

'তবে কি আমি আইউবীর নিকট গিয়ে আত্মসমর্পণ করবো?'– ইয্‌যুদ্দীন

তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন– 'তা-ই যদি করি, তাহলে নিজ বাহিনীকে কীভাবে মুখ দেখাবো!'

'সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে প্রজা নয়– মিত্র বানাতে চান।' রোজি খাতুন বললেন।

'তুমি লোকটার মতলব বুঝতে পারোনি'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের কথা বলেন। আসলে তিনি ক্ষমতালোভী।'

'তার অর্থ হচ্ছে, আপনি তার সঙ্গে লড়াই করবেন'– রোজি খাতুন বললেন– 'এ-ই যদি আপনার সংকল্প হয়ে থাকে, তাহলে অস্থির না হয়ে আপনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করুন।'

'আমার পেরেশানীর কারণ হচ্ছে, সালাহুদ্দীন গোয়েন্দা এবং নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছেন'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'তুমি বোধ হয় জানো, আমার এমন যোগ্য সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বৈরুতে বল্ডউইনের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়ে সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি সংবাদ পেয়েছি, সে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট আছে। আমার সকল গোপন তথ্য তার কাছে। আমি খৃস্টানদের দ্বারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, তরল দাহ্য পদার্থ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়েছিলাম। কিন্তু সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ আমার এক নিরাপত্তা কর্মীর লাশ আমার নিকট এসেছে!'

'তাই নাকি? কেউ তাকে খুন করেছে নাকি? রোজি খাতুন কিছুই জানেন না ভান ধরে জিজ্ঞেস করেন।'

'হ্যাঁ'– ইয্যুদ্দীন আসল কথা গোপন রেখে বললেন– 'তাকে কেউ হত্যা করেছে। তাকে বিশেষ এক কাজে পাঠানো হয়েছিলো। ঘাতক সালাহুদ্দীন আইউবীরই লোক মনে হচ্ছে।'

লাশের সঙ্গে থাকা ফাহ্‌দের পত্রখানা রোজি খাতুনের কাছে। কিন্তু তিনি ভান ধরেছেন, কিছুই জানেন না। ভাবেন, ইয্যুদ্দীন এমনিতেই ভীত। আরো ভয় ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

'আপনার ভালোভাবে জানা আছে, সালাহুদ্দীন শুধু রণাঙ্গনেই লড়েন না'– রোজি খাতুন বললেন– 'তিনি যখন নিজ গৃহে ঘুমিয়ে থাকেন, তখনো তার শত্রুরা মনে করে, তিনি তাদের মাথার উপর বসে আছেন। এই মুহূর্তে তিনি তালখালেদ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, যেনো তিনি মসুলে বসে বসে নিজ তত্ত্বাবধানে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করছেন।

ক্রুসেডারদের বাহিনীর অবস্থাটা দেখুন। আইউবীর বাহিনীর তুলনায় তারা দশ গুণ। তবু তারা মুখোমুখি এসে যুদ্ধ করার সাহস পাচ্ছে না। খৃস্টানদের তুলনায় আপনার যে সৈন্য আছে, তাতো আপনি জানেন। তাছাড়া আপনার বাহিনীতে এমন সব কমান্ডারও আছে, যারা আপনার অনুগত নয়। তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে।'

ইয্‌যুদ্দীনের ভীতি আরো বেড়ে যায়। বললেন– 'আমি এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারবো না। দু'দিন পর আমি বাইরে এক জায়গায় যাবো। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সফল হবো।' তিনি নিশ্চুপ হয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। খানিক পর বললেন– 'রোজি! আমি তোমার সঙ্গে আমার একটা বাসনা সম্পৃক্ত করে রেখেছি।'

'আমি আপনার প্রতিটি আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করবো'– রোজি খাতুন বললেন– 'আপনি যদি আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে বলেন, তা-ও করবো। আমি আপনার এক সন্তানের মা হয়েছি। আপনার বাসনা আমি পূরণ না করলে কে করবে বলুন। বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি। আপনি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করুন।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'এখনই জিজ্ঞেস করো না কোথায় যাচ্ছি। বিষয়টা এখনো গোপন রাখতে হবে। ফিরে এসেই আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবো। তবে পরিস্থিতি যদি আমার বিপক্ষে চলে যায়, তাহলে আমি তোমার কাছে আশা রাখবো, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে সমঝোতা করিয়ে দেবে। হতে পারে তখন আমি গেলে তিনি আমাকে গ্রাহ্য করবেন না।'

রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে এই পরামর্শ দিলেন না যে, তার চেয়ে বরং পরাজিত হওয়ার আগেই আপনি আইউবীর সঙ্গে আপস করে নিন। ইয্‌যুদ্দীন কোথায় যাচ্ছেন, তাও তিনি জিজ্ঞেস করলেন না। সব তো তাঁর জানাই আছে। তাছাড়া ইয্‌যুদ্দীন যখন বিষয়টা এখনো গোপনই রাখতে চাচ্ছেন, তাহলে অযথা ঘাটানোর প্রয়োজন কী। তিনি জানেন না, তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একজন বিজ্ঞ গোয়েন্দা নারীর সঙ্গে কথা বলছেন। যা হোক, রোজি খাতুন ইয্‌যুদ্দীনকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন,

যখনই প্রয়োজন হবে আমি সুলতান আইউবীর সঙ্গে আপনাকে সমঝোতা করিয়ে দেবো। ইয়্যুদ্দীনের ভীতিকর অবস্থা দেখে রোজি খাতুনের হৃদয় সাগরে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়।

ইয়্যুদ্দীন অবনত মস্তকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। রোজি খাতুনের ব্যক্তিগত সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করে। মহিলা রোজি খাতুনেরই সমান বয়সী। প্রবেশ করেই রোজি খাতুনকে জিজ্ঞেস করে, সম্রাটকে অনেক পেরশান দেখা গেলো। এই সেবিকাও রোজি খাতুনের গোপন মিশনের সহকর্মী।

'ঈমান আর চরিত্র ত্যাগ করলে মানুষের এই দশাই ঘটে'– রোজি খাতুন বললেন– 'এই যে শাসকরা জাতি ও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে আপন সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, এরা বৃক্ষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ডালের মতো। ডালের পাতাগুলো ঝরে যাবে। তারপর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। শেষে ডালগুলো শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। যে বস্তুটা আমার স্বামীকে মদ-নারীর আসক্তে পরিণত করেছে, সে হলো ক্ষমতার লোভ। লোকটি ক্রুসেডারদের মধুর বিষ শিরায় ঢুকিয়ে নিয়েছে। আমার স্বামী ইয়্যুদ্দীন রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন। তার তরবারী ক্রুশের হৃদপিণ্ড কর্তন করতো। কিন্তু আজ তিনি নিজ ঘরে ভয়ে কাঁপছেন। তার বীরত্ব হারিয়ে গেছে। আমার কাছে– একজন নারীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। রাজত্বের নেশা আর মদ-নারী মানুষের এ দশাই ঘটায়। তার ভাগ্যে পরাজয় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। একজন সেনাপতি যখন সিংহাসনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার গোটা বাহিনী দীন ও ঈমান থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারপর দেশ ও জাতির মর্যাদা মাটিতে মিশে যায়। দুশমন মাথার উপর চড়ে বসে।'

ফাহ্দকে তথ্য সরবরাহ করতে রওনা হয়ে গেছে ইয়্যুদ্দীনের সেবিকা। ফাহ্দ যেখানে থাকার কথা, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু ফাহ্দের ঘরে তালা। সাধারণত উষ্ট্রচালকের বেশে থাকে ফাহ্দ। দু'টি উট সঙ্গে রাখে আর ব্যবসায়ীদের মালপত্র ভাড়া টানে। ভাড়ার অপেক্ষায় যেখানে উট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েটি সেখানে যায়। ফাহ্দ সেখানেও নেই। উষ্ট্রচালক হিসেবে ফাহ্দের নাম অন্য। সেই নাম নিয়ে এক উষ্ট্রচালককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ফাহ্দ ভাড়া নিয়ে এক জায়গায় গেছে।

সেবিকা জায়গাটার নাম জেনে নিয়ে সেদিকে হাঁটা দেয়। কিন্তু মেয়েটি জানে না এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে।

লোকটা মসুলের মুসলমান। কিন্তু খৃস্টানদের চর। ইয্যুদ্দীনের মহলের কর্মচারি। সেবিকাকে সে ডাক্তারের নিকট দেখেছিলো। মেয়েটিকে চিনতো সে। ডাক্তারের ব্যবস্থা নিয়ে যখন সে মহল থেকে বের হচ্ছিলো, তখনো তাকে সে দেখেছিলো। তবে জানতো না, মেয়েটা রোজি খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। সে দেখলো, মেয়েটি এতো দ্রুত হাঁটছে, যেনো তার কোনো অসুখ নেই। লোকটা খৃস্টানদের তৈরিকরা গুপ্তচর। মেয়েটিকে তার সন্দেহ হয়। ইয্যুদ্দীনের গোয়েন্দা ব্যবস্থা অতোটা উন্নত নয়। খৃস্টানরা তার মহলে চর ঢুকিয়ে রেখেছে তা তিনি জানেন না। তাদের কাজ দুটো– এক. ইয্যুদ্দীনের প্রতি চোখ রাখা, পাছে তলে তলে তিনি সুলতান আইউবীর বন্ধু হয়ে যান কিনা। দুই. ইয্যুদ্দীনের মহলে এবং মসুলে আইউবীর যেসব লোক গোয়েন্দাগিরি করছে, তাদের চিহ্নিত করা।

খৃস্টানদের এই চরটা মেয়েটার অনুসরণ শুরু করে। যখন দেখলো, মেয়েটা আরো দ্রুত হাঁটছে এবং কাউকে খুঁজে ফিরছে, তখন তার সন্দেহ আরো পোক্ত হয়ে গেলো। এবার দেখতে হবে, মেয়েটা কাকে তালাশ করছে। মেয়েটা সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তাহলে তার মাধ্যমে অন্য গোয়েন্দাদেরও ধরা যাবে। ফাহ্‌দ ভাড়া নিয়ে যেখানে গেছে, মেয়েটি সেদিকে হাঁটা দেয়। খৃস্টানদের চরটাও তার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে।

এক স্থানে উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে। ফাহ্‌দও মালপত্র নামাচ্ছে। ফাহ্‌দ মেয়েটিকে দেখে ফেলে। কাছ ঘেঁষে অতিক্রম করতে করতে মেয়েটি ফাহ্‌দের চোখে চোখ রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফাহ্‌দ তাড়াতাড়ি উটের পিঠ থেকে মালামাল খালাস করে মেয়েটির পেছনে চলে যায়। এক উটের লাগাম হাতে ধরা। অপরটির লাগাম এটির পেছনে বাঁধা। মানুষ আসছে, যাচ্ছে। ফাহ্‌দ মেয়েটির কাছে চলে যায়। মেয়েটি দাঁড়াচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আনমনে হাঁটছে। আশপাশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ফাহ্‌দেরও বাহ্যত সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েটি ফাহ্‌দকে তথ্য দিচ্ছে।

মেয়েটির ফাহ্‌দকে যা বলবার বলা হয়ে গেছে। শেষে বললো, কাজ শেষ করে জায়গামতো আসো– গল্প করবো। তবে কর্তব্য সকলের আগে।

আচ্ছা, সুলতান আইউবীর ফৌজ এখন কোথায় জানো তো, না?'

'জানি'– ফাহ্‌দ উত্তর দেয়– 'আমি এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'আল্লাহ্ হাফেজ।'

'ফী আমানিল্লাহ।'

মেয়েটি একদিকে মোড় নেয়। সেদিকে একটি গলিপথ। দেখে, এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে আসছে। তার মনে পড়ে যায়, ফাহ্‌দের সন্ধানে আসবার সময় লোকটাকে তিন-চারবার দেখেছিলো। এই লোকটাকে সে মহলেও দেখেছে। লোকটা কে হতে পারে, খানিক চিন্তা করার পর স্মরণ আসে, লোকটা মহলের কর্মচারি। মেয়েটির মনে সন্দেহ জাগে। লোকটার মতিগতি বুঝবার জন্য মেয়েটি কয়েকবার তার প্রতি তাকায়। লোকটা তার পিছু ছাড়ছে না। মেয়েটি লোকালয় থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যায় তাকে অনুসরণকারী লোকটিও। খানিক দূরে এক স্থানে ঝোপ-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। লোকটি তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। তাতে বোধ হয় তার সন্দেহ জাগে, মেয়েটা কারো অপেক্ষায় বসে পড়েছে। লোকটি বেশ সম্মুখে চলে যায়।

মেয়েটি অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক। সে দ্রুত ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সেখান থেকে বসে বসে ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটি গলিপথে অদৃশ্য হয়ে যায়। লোকটি বেশ দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। অন্য এক পথে মেয়েটি যে ঝোপের আড়ালে বসে পড়েছিলো, সেখানে চলে আসে। তার ধারণা, ওখানে অন্য কেউও আছে। কিন্তু কাছে এসে দেখে, কেউ নেই। মেয়েটিও নেই। সে এদিক-ওদিক তাকায়। মেয়েটির নাম-চিহ্নও নেই।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজ গৃহে চলে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আর্মেনিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবনের সবচে' বড় ঝুঁকিটা মাথায় তুলে নিয়েছেন তিনি। খৃস্টান বাহিনী যে কোন সময় ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। অথচ তিনি একা। মুসলমান আমীরগণ তাঁর প্রতিপক্ষ। নিজ নিজ রাজ্য ও শাসন ক্ষমতা আলাদা আলাদাভাবে মুঠোয় রাখার জন্য তারা নিজেদের ঈমান খৃস্টানদের হাতে বিক্রি করে ফেলেছেন। গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা ছিলো মূলত খৃস্টানদেরই ষড়যন্ত্রের ফল। এখন সুলতান আইউবী সে সকল মুসলিম শাসককে তরবারীর জোরে নিজের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার

পরিকল্পনা হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে শাসক আমার দলে ফিরে আসবে না, সে স্বাধীনও থাকতে পারবে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি দুর্গ তিনি দখলও করে নিয়েছেন এবং সেগুলোর অধিপতিরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। এবার তিনি সেই শাসকদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন, যারা অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের মাঝে বাহিনী নিয়ে ঘুরে ফিরছেন, যা মূলত বিরাট এক ঝুঁকি।

'তোমাদের লক্ষ্য যদি মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদেরকে ভয় করা চলবে না'– সুলতান আইউবী তালখালেদের পথে এক ছাউনিতে বসে নিজ সালারদের বলছেন– 'আমি জানি, তোমরা কী ভাবছো। আমি খৃস্টানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর অবস্থায় ভুল পথে বাড়িয়েছি, আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তোমাদের কেউ একমত না হয়ে থাকো, তাহলে আমি তাকে সঙ্গতই মনে করবো। আমি তাকে বলবো না, আমার সিদ্ধান্ত মান্য করে তুমি আমার ভুল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করো। আমি বরং তাকে বলবো, তুমি আমার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করো, অন্তর থেকে সমস্ত ভীতি ও কুমন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে দাও। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস– মুসলমানের প্রথম কেবলা। আল্লাহ আমাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন যে, আমাদেরই কতিপয় ভাই ঈমান বিক্রি করে ফেলেছেন। প্রথম কেবলা নয়– তাদের ক্ষমতার প্রয়োজন। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুরা! যখন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে, তখন লেখা হবে, আমাদের কালের সৈন্যরা কাপুরুষ ও অযোগ্য ছিলো। পরাজয়ের অভিশাপ সর্বদা সৈন্যদের ভাগেই ফেলা হয়। শাসক গোষ্ঠী যদিও তলে তলে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে, তবু অনাগত বংশধর সৈন্যদেরই উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে।'

'আমাদের একদিন আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। তিনি আমাদের উপর যে কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা পালন করতে হবে। সেই কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে আমাদেরকে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যারা কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আমার হৃদয়ে তাদের প্রতি কোনো মমতা নেই। আজ যদি আমরা এই বিভক্তির ধারা রুখে না দেই, তাহলে একদিন এই প্রবণতা ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্যগুলো নামে ইসলামী হবে; কিন্তু তার শাসকরা নিজেদের

রাজত্ব ও ভোগ-বিলাসিতা অটুট রাখার জন্য আপন শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করবে এবং ঈমান নিলাম করে বেড়াবে। আপন শত্রুকে তুষ্ট করার জন্য তারা তলে তলে একে অপরের শিকড় কাটতে থাকবে। দুর্বল শত্রুটাও তাদের কাছে শক্তিশালী মনে হবে। একজন শাসক তার সকল প্রজাকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেবে। কাজেই জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিটাকে এখনই নিয়ন্ত্রিত করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।'

'আমি কথাগুলো বারবার এ জন্য ব্যক্ত করছি, যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা– যা কিনা সময়ের বড় প্রয়োজন– তোমাদের হৃদয় জগতে অংকিত হয়ে যায় এবং পাছে আপন ভাইকে সামনে দেখে– যে কিনা আমাদের ধর্মের শত্রু– তোমাদের তরবারী অবনত না হয়ে পড়ে। জাতির কেন্দ্র ও ঐক্য বিনষ্টকারী ভাই শত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমরা তালখালেদ অবরোধ করতে যাচ্ছি এবং এটি আমাদের সর্বশেষ বিরতি। এর পরেই তালখালেদের অবস্থান। অবরোধে কার কার ইউনিট অংশগ্রহণ করবে, আমি তোমাদেরকে অবহিত করেছি। রিজার্ভ ফোর্স আমার সঙ্গে থাকবে। কমান্ডো বাহিনীটি ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে সেই পথগুলোকে আয়ত্ত্বে নিয়ে নেবে, যেসব পথে খৃস্টান বাহিনীর আসবার আশঙ্কা আছে কিংবা আর্মেনীয় বাহিনী অবরোধ ভাঙতে আসতে পারে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক খৃস্ট বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা নেই। তারপরও সতর্ক থাকা আবশ্যক।'

'আমরা আর্মেনিয়া দখল করতে চাই না। আর্মেনীয় সম্রাটকে আমাদের শর্ত মান্য করতে বাধ্য করতে হবে। আমি তোমাদেরকে বলেছি, ইয্যুদ্দীন আর্মেনীয় সম্রাটের সাহায্য প্রত্যাশী। আমাদেরকে আর্মেনিয়ার উপর আপদরূপে আবির্ভূত হতে হবে, যাতে আর্মেনিয়ার সম্রাট ইয্যুদ্দীনকে সাহায্য দিতে না পারে। তবে আমি তোমাদেরকে কোনো প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে চাই না। এমনো হতে পারে, আর্মেনীয় বাহিনী ও জনসাধারণ আমাদের এমন কঠোর মোকাবেলা করবে যে, আমাদেরকে পিছপা হতে হবে। আর তখন ইয্যুদ্দীনও আমাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। আক্রমণ করতে পারে হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনও। আমাদের পতন দেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীরগণও আমাদেরকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট করার চেষ্টা করবে। এসব ফলাফল এবং আশঙ্কাসমূহকে সামনে রেখেই আমাদেরকে লড়াই করতে হবে। আমি তোমাদেরকে

মানচিত্র দেখিয়েছি। কারো মনে কোনো সংশয় থাকলে দূর করে নাও। এই অবরোধ ও আক্রমণ আমাদেরকে এমন মহাবিপদে ফেলে দিতে পারে যে, আমরা পরাজয়ও বরণ করতে পারি।'

সুলতান আইউবী যখন তাঁর শেষ ছাউনীতে নিজ সালারদেরকে পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনাবলী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। মানচিত্রটা তাঁর সম্মুখে পড়ে আছে। দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানের কানে কী যেনো বললো। সুলতান বললেন– 'এক্ষুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

দারোয়ান তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে মাথায় ইঙ্গিত করে। ফাহ্‌দ তাঁবুতে প্রবেশ করে। সে পথে কোথাও না থেমে মসুল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠোঁট শুষ্ক। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। গোয়েন্দা উপনেতা হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁবুতে উপস্থিত।

'মনে হচ্ছে বিশ্রাম ছাড়াই তুমি পথ অতিক্রম করেছো'– সুলতান আইউবী ফাহ্‌দকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বসে পড়ো।' সুলতান দারোয়ানকে ডাক দিয়ে বললেন– 'এর খাবার এখানেই নিয়ে আসো।'

'সংবাদটা এমন ছিলো যে, বিশ্রামের সুযোগ নেয়া অপরাধ মনে হচ্ছিলো'– ফাহ্‌দ ক্ষীণকণ্ঠে বললো– 'আমার ঘোড়াটা বোধ হয় জীবিত নেই।'

'খবর বলো।'

'আর্মেনিয়ার সম্রাট তার রাজধানীতে নেই'– ফাহ্‌দ রিপোর্ট প্রদান করে– 'তিনি হারযামে তাঁবু গেড়েছেন। ইয্‌যুদ্দীন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম যাচ্ছেন। বুঝাই যাচ্ছে, তারা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হবে। আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে তার দু'প্লাটুন সৈন্যও থাকবে। ইয্‌যুদ্দীনও দু'তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে আসছেন।'

'এই রাজারা রাজকীয় ধারায় একত্রিত হচ্ছে'– সুলতান আইউবী মুচকি হেসে বললেন– 'মসুলে খৃস্টানদের মতিগতি কী?'

'ক্রুসেডারদেরকে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে'– ফাহ্‌দ উত্তর দেয়– 'তাদের অস্ত্র ডিপোর ধ্বংসের সংবাদ আপনি শুনেছেন। আমরা ওখানকার লোকদের অন্তর থেকে প্রথম দরবেশের প্রভাব-প্রবঞ্চনা দূর করে দিয়েছি।'

'আর্মেনীয় সম্রাট ও ইয্‌যুদ্দীনের হারযামে সাক্ষাৎ ঘটবে এ সংবাদ তোমরা কোথা থেকে পেয়েছো?'– সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন–

'আমি কীভাবে বিশ্বাস করবো এ তথ্য সঠিক?'

'রোজি খাতুনের তথ্য ভুল হতে পারে না।' ফাহ্‌দ উত্তর দেয়।

'আল্লাহ এ মহিয়সী নারীকে হেফাজত করুন।' সুলতান আইউবী বললেন। আবেগের আতিশয্যে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

'রোজি খাতুন আপনাকে সালাম বলেছেন'– ফাহ্‌দ বললো– 'বলেছেন, ইয্‌যুদ্দীনের পা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই উপড়ে গেছে। ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। একটা আঘাত হানতে পারলে তার হাঁটু ভেঙে যাবে।'

'মসুলে কোনো সামরিক তৎপরতা চোখে পড়ছে কি?'– সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন– 'কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি?'

'খৃস্টান গুপ্তচর ও উপদেষ্টারা তৎপর'– ফাহ্‌দ উত্তর দেয়– 'কোনো যুদ্ধ প্রস্তুতি চোখে পড়েনি। ইয্‌যুদ্দীন খৃস্টানদের থেকে যে ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তাতো আপনি ভালোভাবেই জানেন। নগরীতে আমাদের লোকেরা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে এবং রোজি খাতুন ও তাঁর কন্যা শামসুন্নিসার প্রচেষ্টায় দুর্গ ও প্রাসাদের প্রতিটি কোণ্‌ ও প্রতিটি গোপন তথ্য আমাদের নজরে থাকছে।'

'শাবাশ! বন্ধু শাবাশ!'– সুলতান আইউবী দাঁড়িয়ে ফাহ্‌দের গালে হাতের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'তুমি জানো না, তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছো তা কতো মূল্যবান! আমি আশাবাদী, এখন আর অতো রক্তারক্তি হবে না, যতোটুকু অবরোধ ও আক্রমণে হয়ে থাকে।' সুলতান সালারদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এখন আর আমরা তালখালেদ অবরোধ করবো না। ফৌজ ওদিকেই যাবে। গেরিলাদের একটি মাত্র ইউনিট আমার সঙ্গে হারযাম অভিমুখে যাবে।'

হারযাম একটি মনোরম জায়গা। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ঝর্নাধারা ও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। আছে সবুজে ঢাকা টিলা-পর্বতও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর আরো রং চড়িয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে জায়গাটাকে জান্নাতে পরিণত করে নিয়েছেন আর্মেনিয়ার সম্রাট। ক্যানভাসে-শামিয়ানায় তৈরি তাঁবুটা যেনো এক রাজপ্রাসাদ। ভেতরে রঙিন আলোর ঝাড়-লণ্ঠন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ছয়টি ঘোটকযান ও রক্ষী বাহিনী। নাচ-গানের বিশেষ আয়োজন করা আছে। আর্মেনিয়ার সবচে' রূপসী গায়িকাদের এনে হাজির করা হয়েছে। হেরেমের নির্বাচিত মেয়েদের জন্য

আলাদা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। আর্মেনীয় সম্রাট মারদীনের আমীরকেও আমন্ত্রণ করেছেন। মারদীন আর্মেনিয়ারই সন্নিকটস্থ একটি অঞ্চল, যার আমীর কুতুবুদ্দীন গাজী। মারদীন তার জমিদারী। শামিয়ানা-ক্যানভাস ও তাঁবু থেকে সামান্য দূরে আর্মেনীয় সম্রাটের দু'প্লাটুন সৈন্য তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছে।

আর্মেনীয় সম্রাট মারদীনের আমীরের সঙ্গে দু'তিন দিন যাবত শিকার খেলতে থাকেন। তারপর একদিন মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন এসে পৌঁছেন। তিনিও সঙ্গে করে দু'প্লাটুন নির্বাচিত সৈন্য নিয়ে আসেন। রাতে নাচ-গানের আসর বসে। সোরাহির পর সোরাহি মদ শূন্য হতে থাকে। মদ আর নারী এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে, এই মুসলিম আমীর-উজীর ও সালারগণ প্রথম কেবলার সঙ্গে খানায়ে কা'বাকেও ভুলে গেছেন। রাতটা বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে তারা দিনভর গভীর ঘুম ঘুমান। অপরদিকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেখান থেকে দু'আড়াই মাইল দূরে এক স্থানে একটি গেরিলা ইউনিটের সঙ্গে পাথুরে মাটির উপর ঘুমিয়ে আছেন। তিনি ছোট্ট একখানা সফরী তাঁবু সঙ্গে রেখেছেন, যাতে স্থাপন করতে ও গুটাতে বেশি সময় না লাগে। এখানে তিনি সুলতান নন-গেরিলা সৈনিক হয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবী হারযামের উক্ত রাজকীয় ক্যাম্পটার পরিসংখ্যান নেয়া এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য যাযাবরের বেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফাহ্দও আছে তাদের মধ্যে। ফাহ্দের পরণে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়। তিন-চারজন গোয়েন্দা আপন আপন উটের লাগাম ধরে ক্যাম্পের চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। কেউ তাদেরকে সরে যেতে বললে তারা হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে। ফাহ্দ রাজকীয় শামিয়ানার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে সেই যুবতী সেবিকাকে দেখতে পায়, যে তাকে রোজি খাতুনের বার্তা পৌঁছিয়েছিলো। ফাহ্দ মেয়েটিকে চিনে ফেলে। মেয়েটি ইয্যুদ্দীনের খাস সেবিকা। এখানে তাঁরই সঙ্গে এসেছে।

ফাহ্দ ভিখারীর ন্যায় হাঁক দেয়– 'শাহজাদী! আপনার গোলাম সফরে আছে। কিছু খেতে দিন না।'

'ভাগো এখান থেকে'– মেয়েটি দূর থেকে ধমক দেয়– 'অন্যথায় ধরা খাবে।'

'ফাহ্দকে মসুলে কেউ ধরতে পারেনি'– ফাহ্দ আসল কণ্ঠে বললো– 'এখানে তুমি ধরিয়ে দেবে!'

'উহ!'– মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকটির নিকটে চলে আসে– 'তুমি এসে পড়েছো? দেখলে তো, আমার সংবাদ মিথ্যা ছিলো না। কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও দাঁড়িয়ে থেকো না। রাতে কোথায় থাকবে? আজ ক্লান্ত আশা করি তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাবো।'

'তুমিই তো বলেছিলে, কর্তব্যের উপর আবেগকে জয়ী হতে দিও না'– ফাহ্দ বললো– 'আমাদের কর্তব্য এখনো পালিত হয়নি। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

'সবকিছু দেখে নিয়েছো?'– মেয়েটি জিজ্ঞেস কর– 'সুলতান কোথায়?'

'সুলতান শীঘ্রই এসে পড়বেন।' ফাহ্দ উত্তর দেয়।

'ঐ, লোকটা কে রে?'– কারো কণ্ঠ শোনা যায়– 'হতভাগাকে তাড়িয়ে দাও ওখান থেকে।'

মেয়েটি ফাহ্দকে ধমকাতে শুরু করে। ফাহ্দ সেখান থেকে চলে যায়। মেয়েটি একটি তাঁবুর আড়ালে আড়ালে ফাহ্দের চলে যাওয়া দেখতে থাকে। ভাবে, ফাহ্দের দায়িত্ব কতোই না ঝুঁকিপূর্ণ, কতোই না কষ্টকর! মেয়েটির চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। এই সুঠাম যুবকটাকে মনে-প্রাণে কামনা করে মেয়েটি। কিন্তু যখন তার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করে, তখন আলোচনা আবেগের কম এবং কর্তব্যের বেশি করে থাকে। সুলতান আইউবী যে ক'টি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, সেসব এই ফাহ্দ আর মেয়েটির ন্যায় গোয়েন্দাদের বদৌলতেই জিতেছেন। এরা শত্রুর ঘরে অবস্থান করে গোপন যুদ্ধ লড়ে থাকে। এদের জীবন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখে থাকে। এই যুবক ফাহ্দ আর সেবিকা মেয়েটির মাঝে ভালোবাসা আছে। কর্তব্য যদি প্রতিবন্ধক না হতো, তাহলে মেয়েটি তাকে এভাবে জীবন হাতে নিয়ে ঘুরে-ফিরতে বারণ করে দিতো। মেয়েটি জানে, ফাহ্দ এই পাথুরে ভূমিতে রাতে কোথায় ঘুমায়।

'যাক গে, আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে মিলিত হবো।' মেয়েটি মনে মনে বলে নিজ কাজে চলে যায়।

রাতের প্রথম প্রহর। হারযামের শাহী ক্যাম্পে আজ নাচ-গানের কোনো প্রোগ্রাম নেই। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে। আর্মেনীয় সম্রাটের শামিয়ানায় তার সঙ্গে ইয্যুদ্দীন ও মারদীনের আমীর কুতুবুদ্দীন গাজী উপবিষ্ট। ইয্যুদ্দীন বলছেন–

'সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সালাহুদ্দীন তার সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত

করছে। আমরা যদি তার জোটভুক্ত হয়ে যাই, তাহলে সে আমাদেরকে তার গবর্নর নিযুক্ত করে রাখবে। আমরা স্বাধীন থাকতে পারবো না। ইতোমধ্যে তিনি মুসলিম আমীরদের বেশ ক'টি দুর্গ দখল করে নিয়েছেন এবং তার সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে সে সকল আমীর ও দুর্গপতি তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে প্রতিহত না করি, তাহলে তিনি মসুল দখল করেই ক্ষান্ত হবেন না– হাল্‌বের উপরও চড়াও হয়ে বসবেন। কিন্তু আমি একা তো আর তার সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। ইয্‌যুদ্দীন আমার সঙ্গে আছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সালাহুদ্দীন বাহিনী নিয়ে লুটেরার ন্যায় ঘুরে ফিরছে, সেই পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দীনকে তার বাহিনী হাল্‌ব থেকে বের হতে দেয়া সমীচীন হবে না। হাল্‌বের প্রতিরক্ষা অধিক জরুরি। কারণ, অঞ্চলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি জানি'– আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'খৃস্টানদের দৃষ্টিও হাল্‌বের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'সে কারণেই আমি খৃস্টানদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করছি না'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের থেকে তারা হাল্‌ব দাবি করবে।'

'অবশ্যই করবে'– কুতুবুদ্দীন গাজী বললেন– 'আমি মনে করি আপনাদের আপসে সন্ধি করে নেয়া উচিত। আপনাদের দু'জনের বাহিনী একত্রিত হলে সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করতে পারে।'

'আমি জানতে পেরেছি, আইউবীর বাহিনী তালখালেদ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে।' ইয্‌যুদ্দীন বললেন।

'আইউবীর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই'– আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সীমান্তের কাছে ঘেঁষবেন না। আমি তার অগ্রযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেছি। তিনি অন্য কোনো দিকে যাচ্ছেন।'

'আমার ক্রুসেডারদের উপর কোনো আস্থা নেই'– ইয্‌যুদ্দীন বললেন– 'তারা আমাকে সব ধরনের সাহায্য প্রদান করছে বটে; কিন্তু যুদ্ধ শুধু সরঞ্জাম আর উপদেষ্টাদের দ্বারা লড়া যায় না। তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি, আমি আইউবীকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলি আর তোমরা তার উপর আক্রমণ করো। তাদেরকে আমি এই পরামর্শও দিয়েছিলাম যে, তোমরা দামেশ্‌ক এবং বাগদাদকে অবরোধ করে ফেলো। যদি তারা আমার এই পরামর্শ মোতাবেক কাজ করে, তাহলে সালাহুদ্দীন আমাদের সীমানা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু জানি না তারা কী চিন্তা করছে।'

'তারা আমাদের প্রত্যেককে তাদের প্রজা বানানোর চিন্তা করছে'– আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবী না থাকলে ক্রুসেডাররা আমাদেরকে খেয়ে ফেলতো। তাদের উপর আমাদের আস্থা না রাখা উচিত।'

'তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য দিন'– ইয্যুদ্দীন বললেন– 'আমি এগিয়ে গিয়ে আইউবীর উপর আক্রমণ করি। আপনিও তার উপর হামলা করুন।'

এ বিষয়টির উপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মতবিনিময় হয়। শেষে আর্মেনীয় সম্রাট এই শর্তে ইয্যুদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন যে, তার বাহিনীর সেনা সদস্য এবং পশুদের খাদ্যের দায়িত্ব ইয্যুদ্দীন বহন করবেন। ইয্যুদ্দীন শর্তটা মেনে নেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর পেছন থেকে আক্রমণ করবে। ইয্যুদ্দীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধ লড়তেও জানেন, লড়াতেও জানেন। তিনি সেখানে বসেই যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেন।

❖ ❖ ❖

এখন রাত দ্বি-প্রহর। ইয্যুদ্দীন ও আর্মেনীয় সম্রাট যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। হঠাৎ কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দে রাতটা যেনো কেঁপে ওঠে। আর্মেনীয় সম্রাট দারোয়ানকে ডেকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন– 'যেসব সৈন্যের ঘোড়া রশি খুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, সকালে তাদেরকে এখানে নিয়ে আসবে। গাঁধাগুলো কেমন অসচেতনের ঘুম ঘুমাচ্ছে।'

কিন্তু এই ঘোড়া তার ফৌজের নয়। এরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর গেরিলা সৈনিক। সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের মধ্যে। এটা তাদের কমান্ডো অপারেশন।

খানিক পরেই বাইরে প্রলয় শুরু হয়ে যায়। আইউবীর গেরিলারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ধেয়ে এসে ক্যাম্প অতিক্রম করে চলে যায়। তাদের হাতে প্রদীপ ছিলো। এই প্রদীপের আগুন দ্বারা ফৌজের তাঁবুগুলো ভস্ম করে চলে যায়। কয়েকটি তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। ঘুমন্ত সৈনিকরা বিড়বিড়িয়ে ওঠে। পরক্ষণেই বাহিনীর আরেকটি ঢেউ ধেয়ে আসে, যারা বর্শা ও তরবারী দ্বারা যাকেই সামনে পাচ্ছে, কেটে কেটে অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রজ্বলমান তাঁবুগুলো আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। এবার শুরু হয় তীরের

বর্ষণ। জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীরও আছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলোর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের আর্তচিৎকার কেয়ামতের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার পশুগুলোর বাঁধন খুলে যায় এবং উট-ঘোড়াগুলো ছুটে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। এই ঘটনাযজ্ঞ ও হাঁক-চিৎকারের মধ্যে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে উচ্চকণ্ঠের শব্দ ভেসে আসে– 'অস্ত্র ফেলে দাও। ইয্‌যুদ্দীন! তুমি আমাদের হাতে এসে ধরা দাও। আর্মেনিয়ার সম্রাট! তোমার তালখালেদ আমাদের অবরোধে আছে।'

কিন্তু একজনও এসে ধরা দিচ্ছেন না। ইয্‌যুদ্দীন তার এক অনুগত কমান্ডারকে বললেন, আমাকে একটা ঘোড়া দাও। কমান্ডার বড় কষ্টে তাকে একটা ঘোড়া এনে দেয়। তিনি তাতে আরোহণ করে সুযোগ বের করে এই কেয়ামতের মধ্য থেকে বেরিয়ে যান। নিজ বাহিনী, ব্যক্তিগত আমলা-কর্মকর্তা এবং সঙ্গে করে আনা মেয়েদের কী হবে, তার কোনো ভাবনাই ভাবলেন না। আপন জীবনটা রক্ষা করে কোনো মতে পালিয়ে যান।

সেকালের এক ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, সুলতান আইউবী ঘেরাও সংকীর্ণ করে সেই শাসকগুলোকে ধরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তার একটি কারণ এই হতে পারে, তিনি সেই শাসকমণ্ডলীকে নিজের জোটভুক্ত করে ফিলিস্তীন জয়ে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। তবে কারণ যাই থাকুক, ১১৮৩ সালের এই যুদ্ধটা সুলতান আইউবী তাঁর গেরিলাদের দ্বারা এভাবেই লড়িয়েছেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাউকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেননি। এই গেরিলা অভিযানটা সুলতান আইউবী নিজে পরিচালনা করেছেন।

আর্মেনীয় সম্রাট পালানোর পরিবর্তে সেখানেই অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলেন। রাত কেটে যায়। ভোর হলে এবার দেখা গেলো আসল চিত্র। ক্যাম্পে ভস্মীভূত তাঁবুমালার ছাই-ভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। মৃতদেহগুলো এখানে-সেখানে পড়ে আছে। আহতরা ছটফট করছে। উট-ঘোড়াগুলো ওদিক-ওদিক ঘুরে ফিরছে। যারা আক্রমণ করলো, তারা কোথায় গেলো পাত্তা নেই। আর্মেনীয় সম্রাট জানতেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখানেই কোথাও অবস্থান

করে থাকবেন। আইউবীকে কোথায় পাওয়া যাবে ভাবতে শুরু করেন। ইত্যবসরে তিনি দু'জন আরোহীকে দেখতে পান। তারা এগিয়ে আর্মেনীয় সম্রাটের সম্মুখে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সালাম করে। লোক দু'জন সুলতান আইউবীর সামরিক কর্মকর্তা।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আপনাকে সালাম বলেছেন'– একজন বললো– 'তিনি বলেছেন, তাঁর কাউকে গ্রেফতার করার ইচ্ছে নেই। ইয্যুদ্দীন ফেরত যান এবং মসুল চলে যান এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আর আর্মেনীয় সম্রাটের জন্য সুলতানের বার্তা হচ্ছে, সুলতানের ফৌজ তালখালেদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আপনি সন্ধ্যা নাগাদ সংবাদ পেয়ে যাবেন। আপনার ফিরে পৌঁছার আগে আপনার রাজধানী আমাদের দখলে চলে আসবে। আপনি যদি মিসর-সিরিয়ার সুলতানের শর্তাবলী কবুল করে নেন, তাহলে তালখালেদ থেকে ফৌজ ফিরে আসতে পারে। তবে আপনার যদি মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনার জন্য আগে পরিণতি ভেবে দেখার পরামর্শ আছে। আপনি উত্তর দিন। এই মুহূর্তে আপনি আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমার সালাম বলবে'– 'আর্মেনীয় সম্রাট বললেন– 'আমি বিকাল নাগাদ আমার এক মন্ত্রীকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করছি।'

উভয় আরোহী ফিরে যায়। আর্মেনীয় সম্রাটের যে মন্ত্রী এ মুহূর্তে তার সঙ্গে আছে, তার নাম বকতিমোর। সম্রাট তাকে বললেন, আমাদের আইউবীর সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। ওদিকে তালখালেদ অবরুদ্ধ, এদিকে আমরা। তুমি যাও, সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলো, আপনি আপনার ফৌজ প্রত্যাহার করে নিন। আমরা আপনার কোনো শত্রুর সঙ্গে কোনো সন্ধি বা ঐক্য গড়বো না।

বকতিমোর বিচক্ষণ মন্ত্রী। তিনি সুলতান আইউবীর সঙ্গে কথা বলেন। সুলতান কঠিন কঠিন শর্ত আরোপ করেন। বকতিমোর সকল শর্ত মেনে নেন। তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবীর কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না।

সুলতান আইউবী অবরোধ তুলে নেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই তালখালেদ অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

❖ ❖ ❖

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ারে বকর। সে যুগে জায়গাটার নাম ছিলো উমাইদা। সামরিক দিক থেকে জায়গাটার অপরিসীম গুরুত্ব ছিলো। তার আশপাশের অঞ্চলে যারা বসবাস করতো, তাদের অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলো। সুলতান আইউবীর বহু সৈনিক অত্র অঞ্চলের বাসিন্দা। সেনা সংকট দেখা দিলে সুলতান আইউবী এখান থেকে লোক নিয়ে তা পূরণ করতেন। এখানকার সাধারণ মানুষ সুলতান আইউবীর সমর্থক ছিলো বটে; কিন্তু শাসকরা নিজ নিজ ক্ষমতার স্বার্থে আইউবীর বিরোধী ছিলো এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও খৃস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত ছিলো।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে দিয়ারে বকর অভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দেন। অগ্রযাত্রা ছিলো বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন। সুলতান আইউবী তাঁর সালারদেরকে শুধু এতোটুকু অবহিত করেন যে, দিয়ারে বকর অবরোধ করে জায়গাটা দখল করে নিতে হবে। বিজয় অর্জিত হলে তার আমীরের কোনো শর্ত মান্য করা হবে না এবং তার প্রতি কোনো প্রকার মমতা প্রদর্শন করা হবে না।

'আমার অভিমত হচ্ছে ঐ আমীরদের উপর কোনো প্রকার জুলুম না করাই উচিত হবে'— এক সালার বললেন— 'তাদের বাহিনীকে আমাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিয়ে তাদেরকে নামমাত্র আমীর থাকতে দিন।'

'এখন আর আমি জাতির আস্তিনে কোনো সাপই পুষবো না'— সুলতান আইউবী বললেন— 'আমি সংবাদ পেয়েছি, এই লোকটি তার অঞ্চলের লোকদেরকে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করছে এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, যে শাসক কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তারা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। তাদের এই গাদ্দারী খুবই ভয়ানক হয়ে থাকে। কেননা, তারা জাতির শত্রু থেকে সাহায্য নিয়ে সেই সাহায্য জাতিরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে। আমি এ জাতীয় ব্যক্তিদের মস্তক পিষে ফেলতে চাই। যাতে আমার প্রকৃত শত্রু তথা খৃস্টানরা যখন আমার মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, তখন পেছন থেকে আমার উপর আক্রমণ করার মতো কেউ না থাকে

এবং মাটি ফুড়ে বেরিয়ে কোনো সাপ যেনো আমাকে দংশন করতে না পারে। দিয়ারে বকর আল্লাহর সৈনিকদের ভূখণ্ড। আমাদের বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈনিক এই ভূখণ্ডের লোক। আমরা যদি আমাদের সেই যোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের ক্ষমা করি, তাহলে অত্র ভূখণ্ডের সাধারণ লোকদের ঈমানও নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের যুদ্ধবিদ্যাও হারিয়ে যাবে।'

'সমগ্র জাতি তথা কোনো দেশের সকল মানুষ গাদ্দার কিংবা বেঈমান হয় না। শাসক যদি ঈমান বিক্রেতা হয়; তাহলে জাতির ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়, উন্নততর জাতিও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। তাদের চেতনা মরে যায়। পরিণতিতে জাতি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জীবিত থাকে না। আমাদেরকে এ জাতীয় শাসকদের পতন ঘটিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আপনারা দেখেছেন, বাগদাদের খেলাফত পঙ্গু হয়ে গেছে। খেলাফতের আদেশ-নিষেধ পালিত হলে আমাদেরকে এসব সেনা অভিযান পরিচালনা করে ফিরতে হতো না। দেশের অস্থিতিশীলতা দূর করা এবং ঈমান নিলামকারী শাসকদের নির্মূল করা সেনাবাহিনীর কর্তব্য। আমি পুনর্ব্যক্ত করতে বাধ্য যে, ইতিহাস বলবে, হিজরী ষষ্ঠ শতকের বাহিনী অকর্মণ্য ছিলো। তারা না তাদের খেলাফতের মর্যাদা অটুট রেখেছে, না শত্রুকে দমন করেছে।'

দিয়ারে বকর অবরোধের কাজটা এতো দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, ভেতরের লোকেরা মোকাবেলা করার সুযোগই পায়নি। সুলতান আইউবী ঘোষণা করেছেন, চেষ্টা করবে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি যতো কম হয়। ভেতরে আইউবীর গোয়েন্দা ছিলো। তাছাড়া সুলতান নিজেও নগরীর শাসকদের মহল ও হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই মিনজানিকের সাহায্যে যেসব তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করা হলো, সবই সরকারি ভবনগুলোর উপরই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাইরে থেকে ঘোষণা করা হয়েছে– 'দিয়ারে বকরের আমীর! অস্ত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আসো।' কিন্তু দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে আমীর পাল্টা ঘোষণা দেন, অস্ত্র ত্যাগ করা হবে না। পারো যদি যুদ্ধ করে শহর দখল করে নাও।

দিয়ারে বকরের বাহিনী দৃঢ়পদে মোকাবেলা করে। সুলতান আইউবী অবরোধের অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ দেখে তিনি বুঝে ফেললেন, এই অবরোধ দীর্ঘ হবে এবং এর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশিই কুরবানী দিতে হবে।

পাঁচিল ভাঙার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়। কিন্তু উপর থেকে তাদের উপর আগুন ও ভারি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। প্রধান ফটকের উপর মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে সলিতাওয়ালা তীর ছোঁড়া হয়। তাতে ফটকের কাঠের অংশটা পুড়ে যায় বটে; কিন্তু লোহার অংশ অটুট থাকে, যার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তথাপি ফটক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আকাশে তীর উড়ছে।

সুলতান আইউবী বিস্মিত যে, ভেতরের লোকেরা এতো কঠোর মোকাবেলা কেনো করছে! রহস্যটা পরে উন্মোচিত হয় যে, অবরোধের সংবাদ প্রকাশ পাওয়ামাত্র শহরে ঘোষণা করে দেয়া হয়, ক্রুসেডাররা শহর অবরোধ করেছে। এই ঘোষণায় নগরবাসী জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা ফৌজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখা গেছে, চারদিকে ফৌজের সঙ্গে সাধারণ মানুষও যুদ্ধ করছে। কিন্তু সুলতান আইউবী তারপরও নির্দেশ দেননি, নগরীর উপরও গোলা নিক্ষেপ করো।
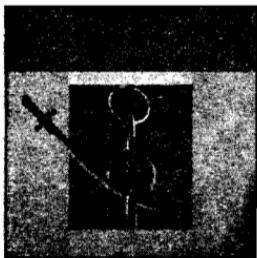
অবরোধ আট দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বেশি ক্ষতি আইউবীর বাহিনীর হচ্ছিলো। কেননা, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল একের পর এক সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলো আর তীরের নিশানায় পরিণত হচ্ছিলো। কিন্তু পরে বিস্ময়কর ঘটনা এই ঘটে যে, হঠাৎ একদিন নগরীর পাঁচিলে ধ্বনিত হয়ে ওঠে- 'এরা ক্রুসেডার নয়- ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী! তার পতাকা দেখো। মুসলমানগণ! তোমরা আপসে লড়াই করছো।' পরক্ষণে সুলতান আইউবীর বাহিনীতে দিয়ারে বকরের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার ছিলো, তারা উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিতে শুরু করে- 'আমরা তোমাদেরই সৈন্য- তোমাদেরই ভাই! দুর্গের ফটক খুলে দাও।'

নগরীর ভেতরে সুলতান আইউবীর যে গুপ্তচর ও আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী ছিলো, অবস্থা বেগতিক দেখে তারাই ছুটে গিয়ে জনতার কানে

দিয়েছে, অবরোধকারীরা খৃস্টান বাহিনী নয়– মুসলমান এবং ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কাজটা সহজ ছিলো না। একজন শত্রুর গোয়েন্দা জনগণকে স্বাধীনতা ও সরকারী ঘোষণার পরিপন্থী কথা বলতে পারে না। এই অভিযানে দু'চারজন গোয়েন্দা ধরাও পড়েছে। তারা সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। অবরোধের ৯ দিনের মাথায় ফৌজ ও সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা-চেতনা বদলে যায়। জনগণ প্রশাসনের বাধা ও হুমকি উপেক্ষা করে নগরীর ফটক খুলে দেয়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নগরীতে প্রবেশ করলে জনগণ তাকবীর ধ্বনি তুলে তাঁকে স্বাগত জানায়। নারীরা বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে মাথার ওড়না ছুঁড়ে ফেলে সুলতানকে স্বাগত জানায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দিয়ারে বকরের আমীরকে নগরী ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তিনি নুরুদ্দীন ইবনে কারা আরসালানকে নগরীর আমীর নিযুক্ত করেন। সুলতান আইউবী তাকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করে উক্ত অঞ্চল থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন।

১১৮৩ সালের মে মাসে সুলতান আইউবী দিয়ারে বকরের ক্ষমতা দখল করে হাল্‌ব অভিমুখে রওনা হন। হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীন এবং মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন তাঁর সবচে' বড় মুসলিম দুশমন। তাই হাল্‌ব-মসুল এখন তাঁর টার্গেট।

হাবীবুল কুদ্দুস

বিজয়া অর্জন করে কে না আনন্দিত হয়? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কোনো যুদ্ধ কিংবা অবরোধে জয়ী হলে তাঁরও চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ভেসে ওঠতো। তাঁর বাহিনী উল্লাস করতো, উট-বকরি-দুম্বা জবাই করে ভালো খাবারের আয়োজন করতো এবং আরামে একটা ঘুম দিতো। কিন্তু ১১৮৩ সালের এই দিনগুলোতে তাঁর চেহারায় আনন্দের কোনো ছাপ ছিলো না। তাঁর সৈন্যদেরও উল্লাস করতে দেখা যায়নি। অথচ এক বছর সময়ে তিনি বেশক'টি দুর্গ জয় করে নেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের ন্যায় শক্তিশালী শাসক থেকে পরাজয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শর্ত মান্য করতে বাধ্য করেন।

ঐতিহাসিকগণ এ সময়টাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিজয়ের কাল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার মানসিক অবস্থাটা ছিলো, যেনো প্রতিটি জয়ের পর তার চেহারায় একটা করে রেখা জন্ম নিচ্ছে– বার্ধক্য ও হতাশার বলিরেখা। এর একটি বিজয়েও তিনি আনন্দিত নন। তার গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী বিজয়ীর ঢংয়ে একের পর এক রিপোর্ট দিচ্ছেন, গত রাতে আমার বাহিনী অমুক স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে দুশমনের এ পরিমাণ ক্ষতি করেছে, অমুক সময় আমরা এই সাফল্য অর্জন করেছি ইত্যাদি। কিন্তু রিপোর্ট শুনে সুলতান আইউবী শুধু মাথা দুলিয়ে তাকে সাধুবাদ জানিয়েই মাথাটা নত করে ফেলছেন, যেনো তাঁর হৃদয়ের ওপর এমন এক বোঝা এসে চেপেছে, যা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

'আমাকে মোবারকবাদ সেদিন জানাবে; যেদিন তোমরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসবে।' একদিন সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের বললেন। তারা দিয়ারে বকরের বিজয়ের পর সুলতানকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছিলো। শুনে তাঁর

চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে ওঠে, যেনো তিনি উদ্গত অশ্রুধারা প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন– 'তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, আমরা ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করতে এবং তাদেরকে আমাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। কর গণনা করে বলো, তোমরা ক' বছর যাবত আপন ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো? হিসাব করো, আমরা একে অপরের কী পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছি। একে কি তোমরা বিজয় বলবে? এই গৃহযুদ্ধে আমি যে বিজয় অর্জন করছি, তা আমার-তোমার বিজয় নয়– সেসব ক্রুসেডারদেরই বিজয়। দু'ভাই যখন আপসে লড়াই করে, তখন তাদের উভয়ের শত্রু সফল হয়। আমরা আপন ভাইদের উপর যে বিজয় অর্জন করেছি, আমি তাকে বিজয় বলতে প্রস্তুত নই।'

'ক্রুসেডাররা দমে গেলো কেনো?'– এক সালার বললেন– 'আমরা আপনাকে তাদের উপরও বিজয় অর্জন করে দেখাবো।'

'তারা যেখানে থমকে বসে রয়েছে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার এবং যুদ্ধ করার প্রয়োজন কী?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যুদ্ধের প্রথম নীতি কী? শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা। খৃস্টানরা আমাদের সামরিক শক্তিকে আমাদের ভাইদের হাতে ধ্বংস করানোর সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমরা আপসে যুদ্ধ করে করে দুর্বল হয়ে চলেছি আর ক্রুসেডাররা সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। ফিলিস্তিনীদের উপর তাদের কব্জা শক্ত হয়ে চলছে। শাসন-রাজত্ব মূলত আল্লাহর। মানুষের উপর যখন রাজত্বের নেশা চেপে বসে, তখন ধর্ম ও জাতির মর্যাদা মূল্য হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতালিপ্সু মানুষ আপন কন্যাদেরকে উলঙ্গ নাচাতে শুরু করে। মিথ্যা ও প্রতারণাকে বৈধ ও জরুরি মনে করে। ক্রুসেডাররা উম্মতে রাসূলকে রাজ্যে রাজ্যে বিভক্ত করে চলেছে আর আল্লাহর সৈনিকদেরকে এই রাজ্যে রাজ্যে ভাগ করে ইসলামের সামরিক শক্তিকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।'

'আমরা এসব অঞ্চল থেকে ফৌজের জন্য অনেক ভর্তি পাচ্ছি'– এক সালার বললেন– 'ভালো ভালো সৈনিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ভর্তি হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি এতে আনন্দিত নই'– সুলতান আইউবী সকলকে চমকে দিয়ে বললেন– 'এরা আমাদের বাহিনীতে শুধু এই জন্য ভর্তি হচ্ছে যে,

তারা জানে, আমরা যে শহর জয় করি, আমাদের বাহিনী সেখানে লুট করে বেড়ায় এবং সেখানকার রূপসী মেয়েরা তাদের হয়ে যায়।'

'আমরা তো আমাদের বাহিনীকে এমন লুটতরাজ ও নারীর শ্লীলতাহানির অনুমতি কখনো দেইনি!' অপর এক সালার বললেন।

কিন্তু আমাদের শত্রুরা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবী তার বাহিনীকে লুটতরাজ ও বিজিত অঞ্চলের যুবতী মেয়েদের তুলে এনে উপভোগ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে স্বয়ং মুসলমানদেরই অন্তরে ইসলামী ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা কোথাও থেকে জনগণের সাহায্য না পাই। বরং কোনো নগরী অবরোধ করলে সেখানকার মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যেনো আমাদের বাহিনীর মোকাবেলা করে। মনে রেখো আমার বন্ধুরা! সেনাবাহিনী ব্যতীত জনগণ আর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ব্যতীত সেনাবাহিনী দুশমনের জন্য সহজ হয়ে যায়। তোমরা আপন শত্রুর পরিচয় লাভ করো। তোমাদের শত্রু বুদ্ধিমান। তারা আমাদের জাতি ও ফৌজের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছে। কুরআন সীসাঢালা প্রাচীরের রূপ ধারণ করার আদেশ শুধু জনগণকে কিংবা শুধু সেনাবাহিনীকে প্রদান করেনি। সীসাঢালা প্রাচীর জনগণ ও সেনাবাহিনী মিলেই কেবল গড়তে পারে। এই প্রাচীরে ফাটল ধরানোর সকল পন্থা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে অযোগ্য, কাপুরুষ ও দস্যুতে পরিণত করা, যাতে তারা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে।'

'দিয়ারে বকরের মানুষদের উপর তো এমন কোনো ক্রিয়া দেখা যায়নি'– সারেম মিসরী বললেন– 'তারা যখনই জানতে পারলো, অবরোধকারী আমরা এবং তাদের শাসকরা তাদের বাহিনীকে ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তারা আমাদের জন্য নগরীর ফটক খুলে দিয়েছে।'

'সেখানে আমাদের অনেক গোয়েন্দা ছিলো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'সেখানকার সবক'টি বড় মসজিদের ইমাম আমাদের লোক ছিলেন। তারা সেখানকার মানুষদেরকে শুধু নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের ওয়াজই শোনাননি। সেই সঙ্গে তাদেরকে ক্রুসেডারদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা এবং নিজেদের ঈমান নিলামকারী আমীর-শাসকদের

সম্পর্কেও সম্যক ধারণা প্রদান করেছেন। তারা জনসাধারণকে এই ধারণা প্রদান করেছেন যে, কোনো মুসলমান যখন অপর মুসলমানের রক্ত ঝরায়, তখন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে এবং আল্লাহ সেই লোকালয়টির উপর গজব নাযিল করেন। তোমরা বোধ হয় জানো না, দিয়ারে বকরে দরবেশ, সুফী ও আলেমের বেশে ক্রুসেডারদের গোয়েন্দারা অবস্থান করছিলো এবং মুসলমানদের চেতনা ধ্বংসের জন্য কাজ করছিলো। কিন্তু আমাদের লোকেরা তাদের কতিপয়কে গোপনে অপহরণ করে হত্যা করেছে এবং তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এখন যে ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এখানে ক্রুসেডারদের নাশকতা–অরাজকতা সফল হয়ে চলছে।'

'এই যেসব সৈনিক লুটতরাজের লোভে ভর্তি হচ্ছে, এরা কি গোটা বাহিনীকে নষ্ট করবে না?' সালার জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি কি দেখোনি তাদেরকে কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে?'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাদেরকে প্রশিক্ষণে সামরিক মহড়ার যে নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছি, তা-ই তাদেরকে সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর নিয়ে আসবে। আমি বাহিনীতে তাদেরকে এমনভাবে বণ্টন করছি যে, তারা বাহিনীর উপর নয়– বরং বাহিনী তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আমি অনতিবিলম্বে এই মর্মে লিখিত আদেশ জারি করতে যাচ্ছি যে, আমাদের কোনো সৈনিককে লুটতরাজ কিংবা কোনো নারীর প্রতি হাত বাড়াতে দেখলে তাকে ঘটনাস্থলেই শায়েস্তা করে ফেলবে। দুশমনের অভিযোগসমূহকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণের একটা পন্থা হলো, ফৌজ আপন চরিত্র বলে বিজিত লোকদের উপর এবং স্বজাতিরও মন জয় করে নেবে। আমাদেরকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, ইহুদী-খৃস্টানরা সর্বকালে ইসলামের সৈনিক ও জনগণের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকবে। তারা যেমন আমাদের জনসাধারণের চরিত্র ধ্বংসের চেষ্টা করবে, তেমনি সেনাবাহিনীরও। এভাবে উভয় পক্ষের ঈমান ও জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করে একে অপরের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। কাজটা তারা মুসলমানদের হাতে করাবে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফোরাত নদীর তীরে তাঁবুতে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের

শাসকদেরকে অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন এবং বেশক'টি দুর্গও জয় করে ফেলেছেন। এরা সেসব মুসলিম শাসক, যারা গোপনে গোপনে ক্রুসেডারদের বন্ধু এবং সুলতান আইউবীর বিরোধী ছিলেন। সুলতান আইউবীর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস, যাকে খৃষ্টানরা দখল করে 'জেরুজালেম' নাম রেখেছে। কিন্তু আপন মুসলিম শাসক ও আমীরগণ তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফৌজকে দিন কয়েকের বিশ্রাম দেয়ার লক্ষ্যে সুলতান ফোরাতের তীরে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এখানে বসে বসে তিনি ঘোড়া, খচ্চর, উট ও রসদের অভাব পূরণ করে নিচ্ছেন।

অল্প পরেই সূর্যটা অস্ত যাবে। সুলতান আইউবী ফোরাতের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর সালার এবং গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরী উপস্থিত আছেন। তাদের থেকে সামান্য দূরে সাদা জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। লোকটি দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করে রেখেছেন। সুলতান আইউবী ওদিকে এগিয়ে যান। নিকটে পৌঁছে দেখেন, সেখানে চারটি কবর বিদ্যমান। একটি কবরের শিয়রে একটি লাঠি প্রোথিত আছে। তার সঙ্গে একখানা তক্তা বাঁধা। তক্তায় লাল বর্ণে আরবীতে লেখা আছে–

"ওমর আল-মামলুক!

আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করুন।

–নাসরুল মামলুক"

তার পার্শ্বের কবরের উপর তেমনি অপর এক তক্তায় অনুরূপ লাল হরফে লেখা আছে–

"নাসরুল মামলুক!

আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।"

সুলতান আইউবী লেখা দু'টি পড়ে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যে লোকটি ফাতিহা পাঠ করছিলেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। পোশাকে-ধরনে লোকটাকে বিজ্ঞ আলেম মনে হলো। সুলতান তার প্রতি তাকালে তিনি সামান্য অবনত হয়ে বললেন– 'আমি এ মহল্লার মসজিদের ইমাম। যখনই জানতে পাই অমুক স্থানে শহীদের কবর আছে, সেখানে ছুটে গিয়ে ফাতিহা পাঠ করি। আমার বিশ্বাস, যে স্থানে শহীদের রক্ত ঝরে, সে জায়গা মসজিদের ন্যায় পবিত্র হয়ে যায়। আমি মানুষকে বলে থাকি, মুজাহিদ এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর ঘোড়ার

ক্ষুরের উড়ানো ধূলিকে আল্লাহও সম্মান করেন। মহান আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকে সর্বোত্তম ইবাদত আখ্যা দিয়েছেন।'

'কিন্তু যারা আল্লাহর পথে জীবন কুরআন করে শাহাদাতবরণ করে থাকে, তাদের কেউ চেনে না। ইতিহাসে তাদের নয়– আমার নাম আসবে। অথচ যাদের মাধ্যমে আমি মর্যাদা লাভ করেছি, তারা হচ্ছে এরা, আপনি যাদের কবরে ফাতিহা পাঠ করছেন।' সুলতান তাঁর সালারদের প্রতি তাকান এবং কবরের ফলক দুটোতে হাত বুলিয়ে বললেন– 'এই শব্দগুলো লাল রঙে আঙুল চুবিয়ে লেখা হয়েছে। উভয় ফলকের লেখক একই ব্যক্তি মনে হচ্ছে।'

'লাল রং নয়, সুলতানে মুহতারাম!'– গেরিলা বাহিনীর সালার সারেম মিসরী বললেন– 'এ রক্ত। ওমর আল-মামলুকের ফলকের লেখাটা নাসরুল মামলুক নিজ দেহের রক্ত দ্বারা লিখেছেন। আর নিজ কবরের ফলকও নিজের রক্তে লিখে শাহাদাতবরণ করেছেন। ষোল-সতের দিন আগে আমরা নদী থেকে বড় একটা নৌকা পাকড়াও করেছিলাম। তাতে দুশমনের গেরিলাদের জন্য রসদ বহন করা হচ্ছিলো। সে তথ্য আপনি জানেন। নৌকাটা আমাদের আটজন গেরিলা পাকড়াও করেছিলো। তাদের এ চারজন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা প্রথমে সংবাদ পাই, রাতে নদীপথে বড় একটি নৌকা অতিক্রম করবে, তাতে দুশমনের রসদ ও অস্ত্র থাকবে। আমি আমার আটজন সৈনিক প্রেরণ করি। তারা ছোট্ট একটি নৌকায় করে অভিযান পরিচালনা করে।'

'মধ্যরাতের দিকে নদীর অপর তীর ঘেঁষে ঘেঁষে নৌকাটা যাচ্ছিলো। আমাদের কাছে তথ্য ছিলো, তাতে চার-পাঁচজন লোক থাকবে। কিন্তু আমাদের গেরিলাদের নৌকা তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলে দেখা গেলো, তারা অন্তত বিশজন। আমাদের গেরিলারা দুশমনের নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দুশমনের তরবারীধারী সৈনিকরা আমাদের নৌকায় লাফিয়ে এসে পড়ে। আমাদের গেরিলাদের নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিলো। তারা নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দুশমনের নৌকায় উঠে গিয়ে তার পালের রশি কেটে দেয়। উভয় নৌকায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আমাদের গেরিলারা দুশমনের বড় নৌকা থেকে আমাদের নৌকায় অবস্থানরত দুশমনের প্রতি তীর ছোঁড়ে। মোটকথা, আমাদের সৈনিকরা

বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে যুদ্ধ করে উভয় নৌকা নিয়ে ফিরে আসে। দুশমনের প্রাণে রক্ষা পাওয়া সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে পৌঁছে যায়।'

'নৌকা দু'টি কূলে এসে ভিড়ে। সংবাদ পেয়ে আমি তাদের দেখতে যাই। সূর্য উদিত হচ্ছিলো। এক নৌকায় ওমর আল-মামলুক এবং তার দু'সঙ্গীর লাশ। অন্যরা সকলে আহত। নাসরুল মামলুক বেশি আহত। তার গায়ে দু'টি গভীর জখম বর্শার আর দু'টি তরবারীর। তার সংজ্ঞা ছিলো। ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার পর বললেন, আমাকে একখানা তক্তা এনে দিন। আমি তাকে তক্তা এনে দিলাম। এ সময় তিনি আর তার চিকিৎসা করতে দেননি। তক্তা পেয়ে তাতে তিনি নিজের রক্তে শাহাদাত অঙ্গুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে ওমর আল-মামলুকের নাম ও এই লেখাগুলো লিখেন। তারপর তক্তাটা আমাকে দিয়ে বললেন, এটি ওমর আল-মামলুকের কবরের উপর স্থাপন করে দেবেন। আমি তক্তাখানা একটি লাঠির মাথায় বেঁধে ওমর আল-মামলুকের শিয়রে গেড়ে রাখি।'

'নাসরুল মামলুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুতেই থাকে। কোনোক্রমেই রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না। তৃতীয় দিন তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আমি তাকে দেখতে আসলে ডাক্তার নিরাশা প্রকাশ করেন। স্বয়ং নাসরুল মামলুক অনুভব করতে শুরু করেছেন, তিনি বাঁচবেন না। তিনি অনুরূপ আরেকখানা তক্তা দিতে বললেন। তক্তার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি তক্তাখানা নিজের কাছে রেখে দেন। রাতে সংবাদ পাই, নাসরুল মামলুক শহীদ হয়ে গেছেন। আমি গেলাম। তার এক আহত সঙ্গী তক্তাখানা আমাকে দিয়ে বললো, নাসর নিজের এক জখম থেকে পট্টি খুলে ফেললে ক্ষতস্থান থেকে দর দর করে রক্ত বের হচ্ছিলো। তিনি নিজ রক্তে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে এই লেখাটা লিখেছেন— "নাসরুল মামলুক! আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।" সঙ্গী জানায়, নাসরুল মামলুক বলেছিলেন, তাকে যেনো তার বন্ধু ওমর আল-মামলুকের পার্শ্বে দাফন করা হয়। এভাবে এই দু'টি ফলক একই শহীদের রক্তে লেখা হয়েছে।'

'এরা দু'জন মামলুক ছিলো মহামান্য ইমাম!'— সুলতান আইউবী ইমামকে উদ্দেশ করে বললেন— 'আপনি জানেন, মামলুক কোন্ বংশের মানুষ। এরা সেই গোলাম বংশের মানুষ, যাদেরকে মুক্ত করা হয়েছিলো। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) দাস প্রথা নিষিদ্ধ করে বলেছেন,

মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। দেখছেন না, এই গোলামরা কিরূপ কীর্তি দেখালো। এরা আটজন ছিলো। কিন্তু বিশজন সৈনিকের হাত থেকে এতো বড় নৌকাটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। আমার ফৌজে মামলুক আর তুর্কিদের প্রতি আমার যতোটুকু আস্থা আছে, অন্যদের প্রতি ততো নেই।'

'এখন মানুষ পুনরায় মানুষের গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছে'– ইমাম বললেন– 'সিংহাসনের মালিক হওয়ার কসরত এ জন্যই করা হচ্ছে যে, মানুষকে গোলাম বানানো হবে। কিন্তু মানুষ বোঝে না, সিংহাসন কোনদিন কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেনি। ফেরাউনও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আল্লাহ সেই সকল মানুষকে শিক্ষামূলক শাস্তি দান করেছেন, যারা সিংহাসনে আসীন হয়ে মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে।'

সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। লোকটির অবস্থা বলছে, সে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। কমান্ডার নিকটে এসে বললো– 'কায়রো থেকে দূত এসেছে।'

'কী সংবাদ নিয়ে এসেছো?' সুলতান আইউবী দূতকে জিজ্ঞেস করেন।

'সংবাদ ভালো নয়।' বলেই দূত কটিবন্ধ থেকে ভাঁজকরা একখানা কাগজ বের করে সুলতান আইউবীর হাতে দেয়। সুলতান নিজ তাঁবুতে চলে যান।

তাঁবুতে বসে সুলতান কাগজের ভাঁজ খোলেন। গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানের লেখা চিঠি। আলী লিখেছেন–

'আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি দীনদার ও দুঃসাহসী নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস দশদিন যাবত নিখোঁজ। ক্রুসেডারদের নাশকতা ও অপতৎপরতা দিন দিন বেড়ে চলছে। এখানে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধ লড়ছি। ঈমান বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে এ সমস্যায় আপনাকে পেরেশান হওয়ার আবশ্যক নেই। আমরা দুশমনকে সফল হতে দেবো না। পেরেশানী সৃষ্টি করেছেন হাবীবুল কুদ্দুস। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার শুধু নিখোঁজ হওয়াই অস্থিরতার কারণ নয়। আমরা আরো একটি আশঙ্কা অনুভব করছি। আপনি জানেন, হাবীবুল কুদ্দুসের অধীনে যে ক'টি সেনা ইউনিট রয়েছে, প্রতিজন সৈনিক তার এতোই অনুরক্ত যে, তারা তার ইঙ্গিতে জীবন কুরবান করে

দিতে প্রস্তুত থাকে। আশঙ্কা হচ্ছে, যদি তিনি নিজ থেকে দুশমনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে থাকেন, তাহলে অধীন সৈন্যদেরকে তিনি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কে দিতে পারেন। আমি তার অনুসন্ধানে এখনো নিরাশ হইনি। আপনার নিকট আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি, অনুসন্ধানকালে যদি তিনি সামনে এসে পড়েন আর আমার তাকে হত্যা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে হত্যা করবো কিনা। আপনার স্থলাভিষিক্ত আমীরে মেসের আমাকে এর অনুমতি দেননি। তিনি এই অনুমতি সরাসরি আপনার থেকে নিতে বলেছেন। আমি যদি তাকে খুঁজে বের করতে না পারি, তাহলে আপনি আমার নিকট জবাব চাইবেন। আর যদি তিনি আমার হাতে খুন হন, তা-ও হয়তো আপনি পছন্দ করবেন না। এই নায়েব সালারের দুশমনের কাছে থাকা আমাদের জন্য বড় বিপজ্জনক।'

সুলতান আইউবী তৎক্ষণাৎ কাতেব ডেকে পত্রের উত্তর লেখাতে শুরু করেন–

'প্রিয় আলী বিন সুফিয়ান!

তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হাবীবুল কুদ্দুসের উপর আমার যতোটুকু আস্থা ছিলো, ততোটুকু আছে তোমারও উপর। যে লোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে সম্মত হয়ে যায়, সে আল্লাহকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় সে আমার ন্যায় একজন সামান্য মানুষকে ভয় করবে কেনো? হাবীবুল কুদ্দুসের মতো মানুষও ধোঁকা দিতে পারে, এর জন্য তোমাদেরকে বিস্মিত না হওয়া উচিত। ঈমান একটা শক্তি, একটা সম্পদ। কিন্তু এই শক্তি-সম্পদ হীরা-জহরতের ন্যায় চিক চিক করে না। এর মধ্যে নারীর রূপের আকর্ষণ নেই। তাছাড়া ঈমান ক্ষমতার মসনদও নয়। মানুষের মধ্যে যখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও হীরা-জহরতের লোভ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তার ঈমান পরিত্যাগ করতে সময় লাগে না। হাবীবুল কুদ্দুসকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। প্রয়োজন মনে করলে আমি তাকে হত্যা করে ফেলার অনুমতি দিলাম। তবে জানবার চেষ্টা করো, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কিনা। পরিস্থিতি তুমি ভালো জানো। যা ভালো মনে হয় করো। সালতানাতের স্বার্থ আর ধর্ম অগ্রগণ্য। যেখানে হাজার হাজার সৈনিক শত্রুর হাতে জীবন দিচ্ছে, সেখানে একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু বড় কোনো বিষয় নয়। হাবীবুল কুদ্দুস গাদ্দার প্রমাণিত হলে তার পেছনে বেশি সময় ব্যয় করো না।

সময় অনেক মূল্যবান। আল্লাহর নিকট গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। আমরা সকলে গুনাহগার। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্ত্বাই পবিত্র। তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

সুলতান আইউবী পত্রের নীচে সীল-মোহর এঁটে দূতের হাতে দিয়ে বললেন, রাতটা বিশ্রাম করে সকাল সকাল রওনা হয়ে যাও।

সময়টা ছিলো ইসলামের ইতিহাসের এক সংকটময় কাল। এদিকে আরব ভূখণ্ড মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে চলেছে। খৃস্টান ও ইহুদীরা মুসলমানদের মাঝে গাদ্দার ও কুচক্রী সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে গৃহযুদ্ধে উস্কে দিয়েছে। ওদিকে মিসরে এই কাফেররাই মুসলিম কর্মকর্তাদের মাঝে গাদ্দার জন্মদানে ব্যস্ত রয়েছে। জনসাধারণের মাঝে সুলতান আইউবীর শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছে এবং আইউবীর বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত লজ্জাজনক সব অপবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা এসব তৎপরতা চালাচ্ছে গোপনে– অতি সন্তর্পণে। আলী বিন সুফিয়ান এবং কায়রোর কোতওয়াল গিয়াস বিলবীস এসব অভিযান-অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া দূর এবং অপরাধীদের পাকড়াও করার কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন।

একজন নায়েব সালারের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সাধারণ ঘটনা নয়। কিন্তু তার কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হাবীবুল কুদ্দুস বিশ্বাসঘাতকের দলে যোগ দিতে পারেন, কেউ ভাবতেই পারছেন না। কিন্তু সময়টাও এমন যে, গাদ্দারী একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নিখোঁজ হওয়ার পর অনেকে মন্তব্য করেন, কেনো, তিনি ফেরেশতা তো আর নন। তার তিনজন স্ত্রী আছে। এটা কোনো দোষের বিষয় ছিলো না। তার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের ঘরে চার-চারজন করে স্ত্রী আছে। হাবীবুল কুদ্দুস জীবনে কোনদিন মদ ছুঁয়ে দেখেননি। নামায-রোযার পাবন্দ মানুষ। যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের জন্য আতঙ্ক হয়ে আবির্ভূত হওয়ার মতো দুঃসাহসী ও সমর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

তার সবচে' বড় গুণটি হচ্ছে, বাহিনীর প্রতিজন সৈন্যের তিনি প্রিয় মানুষ। তার অধীন কমান্ডার ও সৈনিকরা এমন ধারায় লড়াই করে, যেনো তার নির্দেশে নয়– ভক্তি-শ্রদ্ধার বলে যুদ্ধ করছে। অনেক সময় মনে হতো, এই বাহিনী তার নিজস্ব ফৌজ এবং তারা সুলতান

আইউবীর নয়– হাবীবুল কুদ্দুসের ইঙ্গিতে লড়াই করছে। তার ইউনিটে তিন হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী সৈনিক আছে। তারা তীরন্দাজিতে এতো দক্ষ যে, অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লে তীর ব্যক্তির গায়ে গিয়ে আঘাত হানে।

আলী বিন সুফিয়ান অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। গিয়াস বিলবীস পুলিশ প্রধান এবং সিভিল ইন্টেলিজেন্সে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই দু'জনেরই অভিমত হচ্ছে, দুশমন হাবীবুল কুদ্দুসকে জালে আটকে ফেলেছে। উদ্দেশ্য হতে পারে, তার মাধ্যমে তারা আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যকে বিদ্রোহী বানাতে চাচ্ছে। পাঁচ হাজার সৈন্য কম কথা নয়। হাবীবুল কুদ্দুসের নিখোঁজ হওয়ার পর এই সৈনিকদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস এই বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, এটা করা হলে তারা বিদ্রোহ করার না হলেও বিদ্রোহী হয়ে যাবে। তদস্থলে তাদের মাঝে নানা বেশে গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা ব্যারাকে সৈনিকদের সঙ্গে মিশে গপশপ শুনতে থাকে। কমান্ডারদের প্রতিও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়।

গভীর নজরদারি রাখা হয়েছে হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরের উপর। তার তিন স্ত্রীর একজনের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। দু'জন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী। জিজ্ঞাসাবাদে তারা শুধু এটুকু বললো যে, একদিন সন্ধ্যায় তার নিকট দু'জন লোক এসেছিলো। তিনি তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যান; পরে আর ফিরে আসেননি। চাকর-বাকরদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তাদের থেকেও কোন তথ্য পাওয়া গেলো না। গোপনে স্ত্রীদের সম্পর্কে তথ্য নেয়া হলো। তাদের একজনও সন্দেহভাজন প্রমাণিত হলো না। শুধু এটুকু তথ্য পাওয়া গেলো যে, কম বয়সী দু'জনের একজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশি ছিলো। তার নাম যোহরা। মেয়েটি এক আরোহী প্লাটুন কমান্ডারের কন্যা।

কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করা হলো, নিজের সমান বয়সী একজন পুরুষের কাছে যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিলে কেনো? হাবীবুল কুদ্দুস কি তোমাকে বাধ্য করেছিলো?

'না'– কমান্ডার উত্তর দেয়– 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস ইসলাম ও জিহাদের অতোটুকু অনুরক্ত, যতোটুকু আমি। আমি তাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে লড়েছি। তিনি বলতেন, মুমিনের তরবারী খাপ থেকে বের

হওয়ার পর দুশমনের সর্বশেষ সৈনিকটিকে শেষ না করা পর্যন্ত খাপে ফিরে না আসা উচিত। তিনি আরো বলতেন, কুফরের ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকে। তিনি গাদ্দারদের এতো ঘৃণা করতেন যে, এক সীমান্ত লড়াইয়ে সুদানীরা আকস্মিকভাবে হামলা করলে আমাদের দু'জন অশ্বারোহী সেনা পালাতে উদ্যত হয়। নায়েব সালার ঘটনাটা দেখে ফেলেন। তিনি তাদেরকে ধরে আনতে আদেশ করেন। তাদেরকে ধরে আনা হলো। নায়েব সালার তাদের কিছু জিজ্ঞেস করা বা কিছু বলা ব্যতিরেকেই তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে পিঠে একজনকে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকাতে নির্দেশ দেন। ঘোড়া যখন তাদের নিয়ে ফিরে আসে, তখন ঘোড়ার দেহ থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিলো এবং তাদের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। পেছনে বাধা সৈনিকদের অবস্থা এই ছিলো যে, তাদের পরনে কাপড় ছিলো না এবং গায়ের চামড়া ছিলে ছিলে গোশত পর্যন্ত খসে পড়েছে। যখন যুদ্ধ শেষ হয়, ততোক্ষণে সুদানীদের অধিকাংশ সৈনিক মারা গেছে। কিছু ধরা পড়েছে এবং বাদ বাকিরা পালিয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস বাহিনীর সকল সৈন্যকে একত্রিত করে নিজের সৈনিক দু'জনের লাশ দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর পথে লড়াই করা থেকে পলায়নকারীদের এই শাস্তি ইহকালীন। পরকালে তাদের দেহ অক্ষত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'

'আমরা সকলে জিহাদ ও শাহাদাতের জযবায় উদ্দীপ্ত। একদিন আমার এই মেয়েটা আমার সঙ্গে ছিলো। আমার পিতা আমাকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন, আমিও মেয়েকে সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। আমার এক পুত্র এই মুহূর্তে সুলতান আইউবীর ফৌজের সঙ্গে সিরিয়ায় অবস্থান করছে। আমি মেয়েকে বলতাম, আমাদের নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায় এক মর্দে মুজাহিদ। সেদিন নায়েব সালার আমার মেয়েটাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ কে? বললাম, আমার মেয়ে এবং মুজাহিদা। অনেক দিন পর তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই। আমি মেয়ের মায়ের সঙ্গে আলাপ করি। সে বললো, মেয়ে তো আগে থেকেই বলছে, সে ইসলামের একজন সৈনিকের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক। এভাবে আমি খুশি মনে আমার এই মেয়েকে নায়েব সালারের নিকট বিয়ে দিই। এখন

শুনেছি, তার নাকি কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এই দুর্ঘটনায় কেউ যদি অন্তর থেকে ব্যথা পেয়ে থাকে, তো সে শুধু আমার কন্যা। তার অপর দুই স্ত্রী বলছে, মরে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করে নেবো।'

'আমি এখন নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে'– এই কণ্ঠ কায়রো থেকে বহু দূরে সেসব ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে উত্থিত হলো, যেখানে কোনো এক ফেরাউন তার আমলে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলো। সে যুগে জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম ও সবুজ-শ্যামল ছিলো। অঞ্চলটা পাহাড়ি এবং নীল নদের কূলে অবস্থিত। পর্বতমালা গাছ-গাছালি ও সবুজ-শ্যামলে ঢাকা। নদীটা খানিক পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। এখন এলাকাটা এক ভীতিময় জায়গা। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের গায়ে শেওলার আস্তর জমে আছে। চিলের ন্যায় বড় বড় চামচিকারা দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধ্বংসাবশেষের অলিন্দ ও কক্ষগুলোতে মানুষের অসংখ্য হাড়-খুলি পড়ে আছে। সেকালের নানা রকম অস্ত্রও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এখন কেউ সেদিকে মুখ করে না। জনশ্রুতি আছে, জায়গাটায় এখন জিন-পরী ও ভূতেরা বাস করে, যারা জীবিত মানুষদেরকে শিকার করে বেড়ায়।

সেই ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসে এক ব্যক্তি বলছে– 'আমি নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে। তবে না-ই যদি আসে, তাহলে এখান থেকে জীবিত যেতে দেবো না।'

'আমরা লোকটাকে হত্যা করতে এখানে আনিনি'– অন্য একজন বললো– 'হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ঘর থেকে বের করে এখানে তুলে আনার প্রয়োজন ছিলো না। আমরা তাকে বিশেষ এক কাজের জন্য এনেছি। সে কাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে।'

'হাশিশ ক্রিয়া করছে।'

হাশিশ দ্বারা তোমরা কারো ঈমান ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে পারবে না। এই লোকটি পাঁচ হাজার সৈনিকের সামরিক শক্তির মালিক। শুধু তাকে নয়– আমাদেরকে তার গোটা বাহিনীকে হাতে আনতে হবে এবং তাদেরকে মিসরের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে হবে। তারপর মিসর আমাদের হয়ে যাবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর

অবস্থা সেই সিংহের ন্যায় হয়ে যাবে, যে বহু শিকারের বেষ্টনীতে আবদ্ধ থেকে গর্জন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার ভাগ্যে মৃত্যু অবধারিত হয়ে আছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর এই নায়েব সালার যদি তার বাহিনীকে একটু ইশারা করে, তো কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা তার আদেশ মান্য করবে।'

হাবীবুল কুদ্দুস উক্ত ধ্বংসাবশেষের এক কক্ষে উপবিষ্ট। নীচে নরম গালিচা বিছানো, পেছনে গোল তাকিয়া। আয়েশের সকল উপকরণই সেখানে বর্তমান। এক ব্যক্তি সম্মুখে বসে তার চোখে চোখ রেখে আছে এবং বলছে– 'মিসর আমার রাজ্য। সালাহুদ্দীন আইউবী ইরাকী কুর্দি। তিনি আমার রাজ্য দখল করে আছেন। আইউবী আমার রাজ্যের রূপসী মেয়েদের দ্বারা নিজ হেরেম পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য সমগ্র মিসর দখল করে নেবে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের ঠোঁটে মুচকি হাসি। চেহারায় খুশির আভা। তিনি বিড় বিড় করে ওঠেন– 'আমার তরবারী কোথায়? আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবো। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য একদিনে মিসরের বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করে ফেলবে।'

'ক্রুসেডাররা আমার বন্ধু'– লোকটি তার চোখে চোখ রেখে বললো– 'তারা আমাকে সাহায্য করবে। বন্ধু তো সে, যে বিপদের সময় সাহায্য করে।'

'আমার তরবারী কোথায়?'– হাবীবুল কুদ্দুস খানিক স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করেন– 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। মিসরের মেয়েরা অত্যন্ত রূপসী হয়ে গেছে। মিসর আমার, মিসর আমার।'

একটি মেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। মেয়েটার পরিধানের পোশাক এমন, যেনো উলঙ্গ। মাথার রেশম-কোমল চুলগুলো খোলা। হাল্কা গোলাপী বর্ণের সুঢৌল দেহ। মেয়েটা হাবীবুল কুদ্দুসের গা-ঘেঁষে বসে পড়ে। একটা বাহু হাবীবুল কুদ্দুসের কাঁধের উপর আলগোছে রেখে দেয়। তার রেশমী চুলগুলো হাবীবুল কুদ্দুসের গণ্ডদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন– 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে।'

মেয়েটি এক ধারে সরে গিয়ে বললো– 'কিন্তু আমাকে সুলতান আইউবী দখল করে আছেন।'

হাবীবুল কুদ্দুস অকস্মাৎ মেয়েটিকে টেনে কাছে এনে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'তোমাকে কেউ দখল করতে পারবে না। তুমি আমার। মিসর আমার।'

যে যাবত সালাহুদ্দীন আইউবী জীবিত আছেন কিংবা যতোক্ষণ পর্যন্ত মিসরের উপর তার রাজত্ব আছে, সে যাবত না আমি তোমার, না মিসর তোমার।'

'আমি তাকে খুন করে ফেলবো'- হাবীবুল কুদ্দুস বললেন- 'আমি আইউবীকে হত্যা করবো।'

'থামো'- কক্ষে একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গর্জে ওঠে। লোকটা খৃস্টান। মিসরী ভাষায় কথা বলছে- 'তোমরা হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীরা হাশিশ আর গুপ্তহত্যা ব্যতীত কিছুই জানো না। মেয়েটাকে তার কাছে থাকতে দাও। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

লোকটি তাকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে বললো- 'এখন আর ওকে হাশিশ দিও না। তার নেশা কেটে যেতে দাও। তার হাতে সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করাতে হবে। তার মাধ্যমে তার বাহিনীকে বিদ্রোহে উস্কে দিতে হবে। আমার এসে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্যথায় আমি তার এই অবস্থা হতে দিতাম না। সংজ্ঞা ঠিক রেখে তাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর শত্রু বানাতে হবে। তোমরা লোকটাকে যেরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে অপহরণ করে এনেছো, আমি অন্তর থেকে তার জন্য তোমাদের প্রশংসা করি। এর বিনিময়ে তোমাদেরকে এতো পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে, যা তোমরা অতীতে কখনো পাওনি। কিন্তু হাশিশ প্রয়োগ করে তোমরা আমাদের কাজ কঠিন করে দিলে। এখন তার নেশা দূর করার ব্যবস্থা নাও।'

ক্রুসেডারদের গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা এবং মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের পন্থা-পদ্ধতি অত্যন্ত পরিপক্ক। তাদের এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতা ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের দৃষ্টি সুলতান আইউবীর ফৌজ ও প্রশাসনের প্রতিজন অফিসার-কর্মকর্তার উপর নিবদ্ধ। অপরদিকে আরবের আমীর-উজির এবং বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা সম্পর্কেও তারা অবহিত। তাদের প্রচেষ্টা, অধিক থেকে অধিকতর শাসক ও কর্মকর্তা তাদের অধীন হয়ে যাক এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াক। ইহুদীরা সম্পদ ও নারী দিয়ে তাদের পুরোপুরি সাহায্য করে যাচ্ছে। কাফেরদের বিশেষজ্ঞগণ মুসলিম শাসক প্রমুখদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে রেখেছে।

একদল সুন্দরী নারী, মদ আর হীরা-জহরতের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। একটি দল তাদের, যারা স্বতন্ত্র রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করে তার স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তৃতীয় দলে আছে তারা, যারা দেশ ও জাতির অফাদার এবং পরিপক্ক মুসলমান। এই তৃতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাত করা ক্রুসেডারদের স্বতন্ত্র একটি মিশন। সুলতান আইউবীর গোপন পলিসি-পরিকল্পনা সময়ের আগে অবগত হওয়া এবং তাঁর সৈন্যদের দ্বারা তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানো ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে তারা এই মিশন পরিচালনা করছে। এই পরিপক্ক দীনদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের হাত করার জন্য তাদের নিকট কয়েকটি পন্থা আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অপহরণ করে দলে ভেড়ানো। একটি হচ্ছে হত্যা করা। প্রয়োজন হলে হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের ভাড়া নেয়া হতো।

নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস এমন একজন কর্মকর্তা, যাকে হত্যা করায় ক্রুসেডারদের কোনো লাভ নেই। বরং তাকে হাত করে তার বাহিনীকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে হবে। ক্রুসেডাদের মুসলিম এজেন্টরা তাদের অবহিত করেছে, হাবীবুল কুদ্দুস ঈমান নয়– জীবন দেয়ার মতো মানুষ এবং তার মধ্যে এমন জযবা ও অস্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, যদি তাকে তার বাহিনীসহ এক লাখ শত্রুসেনার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তাহলে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা এই বিশাল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

ক্রুসেডাররা বিষয়টা যাচাই করে দেখেছে। কখনো করেছে অস্বাভাবিক রূপসী যুবতীকে নিরাশ্রয় এতীম নির্যাতিতার বেশে সাহায্যের জন্য কিংবা কোনো মেয়েকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রেরণ করে। কখনো বা ভোজসভা কিংবা খেলাধুলার অনুষ্ঠানে কোনো সুন্দরী মেয়েকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস কখনোই তাদের জালে আটকা পড়েননি, যেনো তিনি পাথর।

মিসরে বিদ্রোহ করানো ক্রুসেডারদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, সালাহুদ্দীন আইউবী সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের অঞ্চলগুলোতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মুসলিম আমীদেরকে যুক্তি-প্রমাণ কিংবা তরবারীর মাধ্যমে নিজের অনুগত বানিয়ে চলেছেন। এরপরই তিনি ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করবেন। ফিলিস্তীন থেকে তার মনোযোগ সরানোর একটা পন্থা এই হতে পারে যে, মিসরে তাঁর যে ফৌজ আছে, তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য উস্কে দেয়া হবে।

ইতিপূর্বে ক্রুসেডাররা সুদানীদেরকে মিসরী ফৌজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলো। সুদানী বাহিনী হামলাও করেছিলো। কিন্তু সুদানী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক ছিলো হাবশী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত তারা ছিলো হুজুগে মাতাল। এই একযোগে লড়াই করে তো এই একসঙ্গে পালিয়ে যায়। ক্রুসেডাররা তাদেরকে মিসরের বিরুদ্ধে উস্কে রাখে; কিন্তু যুদ্ধ করাবার কথা ভাবেনি। এখন তারা মিসরী বাহিনীরই দ্বারা বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাদের বিবেচনায় হাবীবুল কুদ্দুসই এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি। তাই খৃস্টান গোয়েন্দা ও বিশেষজ্ঞগণ তাকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের দ্বারা কর্মটা করিয়ে ফেলে।

এক সন্ধ্যায় দু'জন লোক হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরে যায়। তারা একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললো, ওখানকার একটি মসজিদের ছাদ ধসে গেছে। এখন পুরো মসজিদটিই নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। এলাকাবাসী আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে কাজটা করে ফেলতে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজন মুরুব্বীর প্রয়োজন। আপনি এলে কাজটা সহজে হয়ে যাবে। এ মর্মে তারা বেশকিছু আবেগময় কথা বলে হাবীবুল কুদ্দুসের হৃদয়টা গলিয়ে ফেলে। তিনি তাদের সঙ্গে রওনা হয়ে যান। নগরী থেকে বেরিয়ে গেলে আরো চার ব্যক্তি তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। হঠাৎ ছয়জন মিলে তাকে ঝাপটে ধরে ফেলে উল্লিখিত স্থানে নিয়ে যায়। ওখানে পৌঁছেই তার অজান্তে তারা তাকে হাশিশ খাইয়ে দেয়।

কায়রোতে মিসরী গোয়েন্দারা হাবীবুল কুদ্দুসের অনুসন্ধানে গলদঘর্ম সময় অতিবাহিত করছে। সকলেরই ধারণা, তিনি সুদানী কিংবা ক্রুসেডারদের নিকট চলে গেছেন। নিজ বাহিনীর উপর হাবীবুল কুদ্দুসের কী পরিমাণ প্রভাব বিদ্যমান, আলী বিন সুফিয়ানের তা জানা আছে। সে কারণে তিনি মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নরের অনুমতিক্রমে বিষয়টা সুলতান আইউবীকে অবহিত করে রেখেছেন। ধারণা ছিলো, তিনি তার নির্ভরযোগ্য কমান্ডারদের নিকট কোন বার্তা প্রেরণ করবেন। গোয়েন্দারা চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখে। কিন্তু কারো প্রতি তার কোনো বার্তা আগমনের কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। তার বাহিনীর কোনো কমান্ডার উধাও হয়ে যায় কিনা সেদিকেও কড়া নজর রাখা

হচ্ছিলো। কিন্তু এতোদিনে একজন কমান্ডারও উধাও হয়নি।

খৃস্টান লোকটি গোটা রাত হাবীবুল কুদ্দুসের নেশার ক্রিয়া দূর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। পরদিন সে হাবীবুল কুদ্দুসের পাশে গিয়ে বসে। হাবীবুল কুদ্দুস এখনো ঘুম থেকে জাগ্রত হননি। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে তিনি এদিক-ওদিক তাকান। খৃস্টান লোকটির উপর চোখ পড়ামাত্র তিনি উঠে বসেন এবং গভীর দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন।

'আমি দুঃখিত যে, লোকগুলো আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছে'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এতো বিস্মিত ও অস্থির হবেন না। অভাগারা আপনাকে হাশিশ পান করিয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলো। আপনি হাশিশ আর ফেদায়ীদের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তারা আপনাকে অপমান করেছে। এর জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আপনাকে কোনো স্বপ্ন দেখাবো না। আমি আপনার সম্মুখে অত্যন্ত সুদর্শন এক বাস্তবতা উপস্থাপন করবো। আপনি নিজেকে কয়েদি ভাববেন না। আমি আপনার মর্যাদা উঁচু করে দেবো। আপনার একবিন্দু অপমান হতে দেবো না।'

'এরা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'পরে বোধ হয় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়েছিলো।' তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– 'সেটা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম জায়গা ছিলো। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে?'

'আপনি নিজেকে জাগ্রত করুন'– খৃস্টান বললো– 'এসব হাশিশের ক্রিয়া। আপনি প্রথম দিন থেকেই এখানে আছেন।'

'আমাকে অপহরণ করা হয়েছে?'– হাবীবুল কুদ্দুস বাস্তবতায় ফিরে আসতে শুরু করেছেন। খানিক ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি কে?'

'আমি আপনার এক মুসলমান ভাই'– খৃস্টান বললো– 'আমার আপনার থেকে নেয়ার মতো কিছু নেই। আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

'আমি যদি এই লেনদেন অস্বীকার করি, তাহলে?'

'তাহলে আপনি জীবিত ফেরত যেতে পারবেন না'– খৃস্টান বললো– 'আপনি কায়রো থেকে এতো দূরে আছেন যে, আমরা আপনাকে মুক্ত করে দিলেও আপনি মরে যাবেন।'

'সেই মৃত্যুকেই আমি বরণ করে নেবো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমি শত্রুর কয়েদখানায় মৃত্যুবরণ করতে চাই না।'

'আপনি না আটক আছেন, না আপনি আমাদের শত্রু'– খৃস্টান বললো– 'অপদার্থগুলো আপনার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করে আপনার মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

'কথাগুলো বলার জন্য অপহরণ করে আমাকে এতো দূরে নিয়ে আসার কী প্রয়োজন ছিলো?'

'আমি যদি কায়রোতে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম, তাহলে আমরা উভয়ে এতোদিনে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে চলে যেতাম'– খৃস্টান বললো– 'ওখানে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস পায়ে পায়ে গোয়েন্দা দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেমাগ তার ভাববার যোগ্য হয়ে গেছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, তিনি খৃস্টান নাশকতাকারীদের কবলে এসে পড়েছেন। জিজ্ঞেস করেন– 'তুমি ক্রুসেডারদের লোক, নাকি সুদানীদের?'

'আমি মিসরের লোক'– খৃস্টান জবাব দেয়– 'আপনিও মিসরী। আপনি বাগদাদী, শামী কিংবা আরবী নন। মিসর মিসরীদের। এ দেশটা নুরুদ্দীন জঙ্গী-সালাহুদ্দীন আইউবীর পৈতৃক জমিদারি নয়। এটা ইসলামী রাষ্ট্র। এখানে আল্লাহর রাজত্ব চলবে। এবার শাসন করবে মিসরী মুসলমানরা। আপনি কি কখনো ভেবে দেখেননি, যারা আমাদের উপর রাজত্ব করছেন, তারা বাগদাদ ও দামেশ্‌ক থেকে এসেছেন এবং মিসরকে সিরিয়ার সঙ্গে একীভূত করে এক রাজ্য গঠন করেছেন?'

'তুমি কি আমাকে মিসরকে সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে মুক্ত করার জন্য উস্কানি দিচ্ছো?'

'আমি জানি, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবীকে পয়গম্বর না হলেও পীর-মুরশিদ অবশ্যই মনে করেন'– খৃস্টান বললো– 'আমি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না। আইউবীর মধ্যে অনেক গুণ আছে। আপনি তাকে যতোটুকু পছন্দ করেন, আমি তার চেয়ে কম করি না। কিন্তু আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, লোকটা আর কতোদিন বেঁচে থাকবেন। তারপর মিসর তার যে ভাই কিংবা পুত্রের হাতে আসবে, তার মধ্যে তো আর আইউবীর গুণাবলী থাকবে না। তখন মিসর আরেক ফেরাউনের কব্জায় চলে যাবে।'

'আমার দ্বারা তুমি কী কাজ করাতে চাও?'

'আপনি যদি আমার বক্তব্য বুঝে থাকেন, তাহলে আমি বলতে পারি, আপনি কী কাজ করতে পারেন'– খৃস্টান উত্তর দেয়– 'আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আগে সন্দেহ দূর করুন। আমি আপনাকে চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। আপনি এইমাত্র ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। হতভাগ্যদের দেয়া হাশিশের ক্রিয়া এখনো দূর হয়নি। আমি আপনার জন্য নাস্তা পাঠাচ্ছি। এতোদিনে লোকগুলো আপনাকে গোসল করার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। আমি আপনাকে একটি কূপে নিয়ে যাবো।'

খৃস্টান লোকটি উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। সামান্য পরে অপর এক ব্যক্তি এসে বললো– 'আমার সঙ্গে চলুন। নাস্তার আগে গোসলটা সেরে নিন।'

জীর্ণ ভবন থেকে হাবীবুল কুদ্দুসকে অন্য এক পথে বের করে নেয়া হয়। পথটি পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরের দিকে চলে গেছে। খানিক দূরে একটি ঝরনা, যার স্ফটিকস্বচ্ছ পানি ক্ষুদ্র একটি প্রাকৃতিক পুষ্করিনীতে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস কয়েকটি পর্বত ঘুরে ঘুরে ঝরনার নিজট গিয়ে পৌছুলে দেখতে পান, দু'টি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছে আর একে অপরের গায়ে পানি ছিটাচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। মেয়ে দুটো হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই বিজন ভূমিতে মেয়ে দুটোকে জিন-পরী বলে মনে হলো। হাবীবুল কুদ্দুস এদিক-ওদিক তাকান। সবদিকেই পাহাড়। তিনি পেছন দিকে দৃষ্টপাত করেন। তার সঙ্গে আসা লোকটি তার সামনে সামনে হাঁটছে।

হাবীবুল কুদ্দুস হঠাৎ ছোঁ মারার মতো করে এক বাহু দ্বারা লোকটার ঘাড় ঝাপটে সাধ্য পরিমাণ চেপে ধরে অপর হাত দ্বারা পূর্ণ শক্তিতে তার পেঁটে তিন-চারটি ঘুষি মারেন। লোকটি দম আটকে মরে যায়। হাবীবুল কুদ্দুস লাশটা টেনে-হেঁচড়ে একটি ঘন ঝোঁপের পেছনে ফেলে দিয়ে নিজে পালাতে উদ্যত হন। এক পাহাড়ের মধ্যকার পথটা আগেই দেখে নিয়েছেন। সেখানে পৌছে দেখতে পান, এক ব্যক্তি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি শুধু বললো– 'ফেরত'। হাবীবুল কুদ্দুস নিরস্ত্র। অগত্যা মাথানত করে পেছন পানে মোড় ঘোরান। কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন মাত্র। হঠাৎ উক্ত খৃস্টান লোকটি তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি মিটি মিটি হাসছে।

'আমি আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করি'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এই অঞ্চল থেকে বের হতে পারবেন না। অযথা বোকা সাজবেন না। গোসল করে আমার সঙ্গে আসুন।'

হাবীবুল কুদ্দুস সুবোধ বালকটির ন্যায় পুকুরে নেমে গোসল করে কাপড় পরিধান করেন। খৃস্টান লোকটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পথে তিনি খৃস্টানকে জিজ্ঞেস করেন– 'এই মেয়েগুলো কি তোমাদের সঙ্গে থাকে?'

'হ্যাঁ, এমনি বিজন অঞ্চলে এমন চাকচিক্য সঙ্গে রাখতে হয়'– খৃস্টান বললো– 'আপনারও তো ওখানে তিনটি বউ ছিলো। এখন প্রয়োজন হলে আপনিও এদের যাকে পছন্দ হয়, সঙ্গে রাখতে পারেন।'

এমন সময় এক মেয়ে নাস্তা নিয়ে আসে। হাবীবুল কুদ্দুস তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটি তার পাশে বসে পড়ে। খৃস্টান লোকটি বেরিয়ে যায়। মেয়েটি কথা ও আচরণে হাবীবুল কুদ্দুসকে পাগল করে তোলে। অনেক পরে যখন খৃস্টান ফিরে আসে, তখন মেয়েটি চলে যায়। তখন হাবীবুল কদ্দুসের মনে আক্ষেপ জাগে।

'আপনি স্বাধীন মিসরের প্রধান সেনাপতি হবেন'– খৃস্টান বললো– 'আপনার বাহিনীতে যে তিন হাজার পদাতিক এবং দু'হাজার অশ্বারোহী আছে, তারা প্রত্যেকে আপনার অনুগত ও অনুরক্ত। আপনি তাদেরই সাহায্যে মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবী যদি আক্রমণ করেন, তাহলে কি আমি এই বাহিনী দ্বারা মিসরকে তার থেকে রক্ষা করতে পারবো?'

'মিসরের বাহিনীতে যেসব সুদানী মুসলমান রয়েছে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে'– খৃস্টান বললো– 'আইউবীর বাহিনীতে যেসব মিসরী আছে, আমরা তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবো, এটা গৃহযুদ্ধ নয়– মিসরীয়দের মিসরকে মুক্ত করার লড়াই। আপনি আপনার বাহিনী দ্বারা বিদ্রোহ করাবেন। আপনাকে সামরিক শক্তি সরবরাহ করার দায়িত্ব আমাদের।'

খৃস্টান লোকটি স্ববিস্তার হাবীবুল কুদ্দুসকে তাদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে। হাবীবুল কুদ্দুস এখন আর আপত্তি করছেন না। বরং এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যেনো তিনি সম্মত হয়ে গেছেন।

'আমি কায়রো ফিরে না গেলে বিদ্রোহ কীভাবে করাবো?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'আপনাকে কায়রো যেতে হবে না'– খৃস্টান বললো– 'আপনি এখান থেকেই আপনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গীদেরকে বার্তা প্রেরণ করবেন। বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা আমরা করবো। আপনি আমাদের একজন মূল্যবান লোককে হত্যা করে ফেলেছেন। সেই অপরাধে আমরা আপনাকে মেরে ফেলতে পারি। আমাদের বাহু এতো লম্বা যে, আপনার বংশের প্রতিজন সদস্যকে আমরা খুন করতে পারি। আপনি যদি আমাদেরকে ধোঁকা দেন, তাহলে আমরা তা-ই করে দেখাবো।'

'তার মানে, এখানে আমাকে বহুদিন থাকতে হবে।' হাবীবুল কুদ্দুস বললেন।

'কিছুদিন তো থাকতেই হবে।' খৃস্টান উত্তর দেয়।

'আমার একটি প্রয়োজন পূরণ করে দাও'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'তুমি আমাকে দু'টি মেয়ে পেশ করেছো। আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চাই। এমনও হতে পারে, এরূপ রূপসী মেয়েদের জালে আটকা পড়ে আমি নিজের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাবো। তার চেয়ে বরং আমার ছোট স্ত্রীকে এখানে এনে দাও। তার নাম যোহরা। আমি তাকে বার্তা আদান-প্রদানেও ব্যবহার করতে পারবো।'

'তাহলে তো তাকে অপহরণ করতে হবে'– খৃস্টান বললো– 'আমরা যদি বলি, আপনি তাকে আসতে বলেছেন, তাহলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া তিনি আমাদেরকে ধরিয়েও দিতে পারেন। বরং আমি আপনাকে যে উত্তম বিকল্প পেশ করেছি, আপনি তাই বরণ করে নিন। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য অন্য কারো ঠিকানা দেন।'

'তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমাকে কায়রো পৌছিয়ে দাও। আমি এক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়ে দেবো।'

'এ হতে পারে না'– খৃস্টান বললো– 'আমরা যা কিছু করছি মুহতারাম! মিসরের স্বার্থেই করছি। আর তাতে আপনারও স্বার্থ আছে। আমি কিংবা আমার সংগঠনের কোন সদস্য মিসরের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখি না। আপনি বুঝবার চেষ্টা করুন।'

'আমি বুঝে ফেলেছি'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আর আমি বুঝে-শুনেই কথা বলছি। তোমরা আমার স্ত্রী যোহরাকে আমার নিকট চলে আসতে সংবাদ পাঠাও। সে যে কাজ করতে পারবে, অন্য কেউ তা পারবে না। তার চলে আসার পর দেখবে, আমি কীভাবে পরিকল্পনা সফল করে তুলি।'

❖ ❖ ❖

যে মহিলা যোহরার পথ আগলে দাঁড়ালো, সে এক ভিখারিনী। মহিলা দু'তিন দিন যাবতই দেখে আসছে, প্রতি দিন দুপুরের পর যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের ঘর থেকে বের হয়ে পিতার ঘরে যাচ্ছে। ভিখারিনী তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো– 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস আপনাকে যেতে বলেছেন। এই নিন তার নিজ হাতে লেখা চিঠি।'

যোহরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ে। তার স্বামীরই হাতের লেখা। ভিখারিনী বললো– 'তিনি যেখানেই আছেন নিজে গেছেন। এতো বড়ো ব্যক্তিত্বটাকে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে না। তিনি কেবলই আপনাকে কামনা করছেন এবং বলছেন, আমি যোহরাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। আমি আপনাকে এও বলে দিচ্ছি, যদি আপনি আমাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন কিংবা পুলিশে খবর দেন, তাহলে দু'জনকেই হত্যা করা হবে। আপনার হাবীবুল কুদ্দুসের নিকট যাওয়া খুবই জরুরি।'

'আমি তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করবো?' যোহরা জিজ্ঞেস করে।

'আমি ভিখারিনী নই'– মহিলা জবাব দেয়– 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমিও আপনার ন্যায় রাজকন্যা। আমাদের উদ্দেশ মহৎ ও পবিত্র। আপনি মনে কোনো সংশয় রাখবেন না।'

মহিলা আরো এমন অনেক কথা বলে, যদ্বারা যোহরা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে মহিলার কথা মতো রাতে একস্থানে চুপি চুপি উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি যে, মহিলা বলেছিলো বিষয়টা আপনার ও আপনার স্বামীর জীবন-মরণের এবং মিসরের স্বাধীনতা ও গোলামীর সাথে সম্পৃক্ত।

রাতে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যোহরাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ভিখারিনীর সঙ্গে দু'জন পুরুষ এসে হাজির হয়। অন্ধকারে যোহরা লোক দু'জনকে চিনতে পারেনি। ভিখারিনীকে চিনেছে তার কণ্ঠে। কিন্তু এখন তার ভিখারিনীর বেশ নেই– এক রূপসী তরুণী। সে যোহরাকে বললো– 'আল্লাহর উপর ভরসা করে এদের সঙ্গে চলে যান। অন্তরে কোনো ভয় রাখবেন না।'

যোহরাকে একটি ঘোড়ায় তুলে বসানো হয়। তারাও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। যোহরা এমন এক সফরে রওনা হয়, যার গন্তব্য তার জানা

নেই। মহিলা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। শহর থেকে দূরে এক স্থানে পৌঁছে আরোহীরা যোহরাকে বললো, তোমার চোখে পট্টি বাঁধতে হবে। যোহরা একা। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি তার নেই। তার চোখে পট্টি বেঁধে দেয়া হলো।

দু'দিন পরে খবর হলো, নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ছোট স্ত্রীও নিখোঁজ হয়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্ত করা হলো। গোয়েন্দারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় তাকে অপহরণ করা হয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস সম্পর্কেও সকলের ধারণা, তিনি ক্রুসেডার কিংবা সুদানীদের নিকট চলে গেছেন। এখন মানুষ বলছে, তার স্ত্রীও তার কাছে চলে গেছে। কেউ জানে না, মহিলা কখন কীভাবে গেছে।

এতোক্ষণে যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের নিকট পৌঁছে গেছে। সেই কক্ষে তার চোখ খোলা হলো, যেখানে তার স্বামী তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মেয়েটা এই গোটা রাত এবং আগের আধা দিন সফরে ছিলো। পথে খাওয়া-দাওয়ার সময় শুধু তার চোখ খুলে দেয়া হয়েছে। অপহরণকারীরা তার সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলেনি। তারা তাকে অভয় দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসে।

হাবীবুল কুদ্দুসকে দেখার পর যোহরার দেহে প্রাণ ফিরে আসে। খৃস্টান লোকটা সঙ্গে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বললো– 'ইনি আমাদের বন্ধু। আমরা এখানে কারো কয়েদি নই। তুমি অনেক ক্লান্ত। আজ রাতটা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে বলবো, তোমাকে কী করতে হবে। তুমি অনেক সময় বলতে, তোমার পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করতে ইচ্ছে হয়। আমার এই বন্ধু তোমার জন্য বেশ ভালো সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

খৃস্টান দু'জনকে একাকি রেখে বাইরে বেরিয়ে যায়।

যোহরা এখনো তরুণী। রূপে আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলার চাঞ্চল্য, দুরন্তপনা এখনো পুরোপুরি বিদ্যমান। হাবীবুল কুদ্দুস যে দু'টি মেয়েকে পুকুরে গোসল করতে দেখেছিলেন, সন্ধ্যার খানিক আগে তারা যোহরার কক্ষে এসে পড়ে। এসেই এমনভাবে আলাপ জমিয়ে ফেলে, যেনো যোহরা তাদের বহুদিনের চেনা। তারা যোহরাকে অন্তরঙ্গ বান্ধবীর ন্যায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এলাকাটা ভয়ংকর এক ধ্বংসাবশেষ বটে, কিন্তু মেয়েগুলো যেখানে থাকে, সেটি এখন সাজানো-গোছানো কক্ষ। রঙিন

ঝাড়বাতি জ্বলছে। এই কক্ষে প্রবেশ করলে ধ্বংসাবশেষের কল্পনাও মনে আসে না। যোহরা অল্প সময়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এক মেয়ে যোহরাকে বললো– 'তোমার বাবা-মা কতো নিষ্ঠুর, তারা তোমার ন্যায় ফুটন্ত কলিটাকে এই বৃদ্ধের পায়ে নিক্ষেপ করেছে। লোকটা তোমাকে ক্রয় করেনি তো?'

'হ্যাঁ'– যোহরা বেদনামাখা কণ্ঠে বললো– 'তিনি আমাকে ক্রয় করেছেন। আমি পালিয়েও কোথাও যেতে পারছি না। আমার অন্য কোন আশ্রয়ও নেই।'

'আশ্রয় পেলে পালিয়ে যাবে?'

'সেই আশ্রয় যদি আমার বর্তমান জীবন থেকে উন্নত হয়, তাহলে অবশ্যই পালাবো'– যোহরা বললো এবং জিজ্ঞেস করলো– 'তিনি আমাকে এখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? তোমরা কারা? তিনি আমাকে বিক্রি করছেন নাকি?'

'তুমি যদি আমাদের নিকট এসে পড়ো, তাহলে রাজকন্যা হয়ে থাকবে'– এক মেয়ে বললো– 'তোমাকে বলে দেবো, আমরা কারা। তবে তার আগে দেখতে হবে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকার যোগ্য কিনা। তুমি কি আমাদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে আমাদের ন্যায় উলঙ্গ হয়ে পুকুরে গোসল করতে পারবে?'

'ঐ পশুটা থেকে আমাকে মুক্ত করে দাও, তো যা বলবে তা-ই করবো।' যোহরা উত্তর দেয়।

এক ব্যক্তি যোহরাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে আসে। বললো, নায়েব সালার খাবার সামনে নিয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন।

যোহরা চলে গেলে যে খৃস্টান লোকটি হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো, সে কক্ষে প্রবেশ করে। মেয়েরা আনন্দ প্রকাশ করে বললো– 'মেয়েটা আমাদের কাজের এবং বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা। তুমি অনুমতি দিলে আমরা তাকে নিজেদের রঙে রঙিন করে নিতে পারি। দেখেছো তো, কতো রূপসী। চঞ্চলতা, দুরন্তপনা আছে। দেহ কঠোরতা সহ্য করতে পারবে। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি ভাবছি লোকটা বলতো, এই স্ত্রীর উপর তার আস্থা আছে। বার্তা আদান-প্রদান করতে পারবে'– খৃস্টান বললো– 'মেয়েটা সত্যিই যদি লোকটাকে ঘৃণা করে থাকে, তাহলে তো সে তাকে ধোঁকা

দেবে এবং আমাদের প্রত্যেককে ধরিয়ে দেবে। তার অর্থ হচ্ছে, এ কাজে আমাদেরকে তাড়াহুড়া করা যাবে না। লোকটা আমাদের জালে এসে পড়েছে। আমাকে সে মিসরী মুসলমান ও দেশপ্রেমিক বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সে আমাদের হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েটা যদি তাকে ধোঁকা দিতে রাজি হয়, তাহলে আমরা তাকে ব্যবহার করতে পারি। আমি তাকে যাচাই করে দেখবো। তোমরা রাতে অল্প সময়ের জন্য তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমার কাছে রেখে কোনো এক বাহানায় তোমরা বেরিয়ে যাবে।'

আহারের কিছুক্ষণ পর মেয়েরা পুনরায় গল্প করার নাম করে যোহরাকে নিয়ে আসে। তারা তাকে পূর্বের চেয়ে বেশি ফ্রি বরং বলা চলে অনেকটা বেহায়া বানিয়ে ফেলেছে। খৃস্টান এসে উপস্থিত হলে যোহরাকে রেখে মেয়ে দুটো বেরিয়ে যায়। মেয়েরা যোহরার সঙ্গে যে ধারায় কথা বলেছিলো, পুরুষটিও একই ধারায় কথা বলে। খৃস্টান তাকে যাচাই যা করার করে এক পর্যায়ে বাহুতে আকড়ে ধরে কাছে টানতে শুরু করে। যোহরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো– 'আমি এমন সস্তা নই যে, একটু ইঙ্গিত করলেই কারো কোলে লুটিয়ে পড়বো।'

উত্তরটা খৃস্টান লোকটার ভালো লাগে। যে কারো হাতে আসবার মতো মেয়ে নয়। তাদের গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী মেয়েদের যেসব গুণ থাকে, এর মধ্যেও সেসব বিদ্যমান। সামান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যোহরা তাকেও বলেছে, স্বামীটার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু যেহেতু সে বাধ্য এবং ঘৃণার কথা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তিনি মনে করেন, আমি তাকে ভালোবাসি।

'এখনো ঘৃণা প্রকাশ করবে না'– খৃস্টান বললো– 'আমি তোমাকে তার থেকে মুক্ত করিয়ে দেবো। তুমি রাজকন্যাদের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। তুমি এখানেই বসে থাকো। আমি তোমার বান্ধবীদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খৃস্টান কক্ষ থেকে বেরিয়ে মেয়েদের নিকট চলে যায়। বললো– 'মেয়েটা কাজের। নিজেদের ছায়ায় নিয়ে নাও। হাবীবুল কুদ্দুস মেয়েটাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে। আমরা তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে নিয়ে সংবাদ আদান-প্রদানে কাজে লাগাবো। তাকে জালে আটকানো তোমাদের কাজ। রাজকীয় জীবনের মুলা দেখাও। আর তাকে কী উদ্দেশ্যে কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে, তোমরা জানো।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকে এবং খৃস্টান পুরুষ ও মেয়ে দুটোকে বলতে থাকে, স্বামীর প্রতি আমার অন্তহীন ঘৃণা। মেয়ে দুটো তাকে সঙ্গে রাখতে এবং বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ঝরনার পুকুরে নিয়ে গেলে যোহরা অবলীলায় পরিধানের সমুদয় কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পুকুরে নেমে মেয়ে দুটোর সঙ্গে খেলতে শুরু করে। তারপর এটা তার নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে যায়। যোহরা রাত কাটাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। আর দিবস অতিবাহিত করছে মেয়ে দুটোর সাথে। মাঝে-মধ্যে দিনের বেলা খৃস্টান পুরুষও তার সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথাবার্তা বলছে। চার-পাঁচ দিনেই যোহরা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে মেয়ে দুটোর রঙে রঙিন হয়ে যায়। তার চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা বেহায়াপনার রং ধারণ করতে শুরু করেছে। মেয়েরা ধীরে ধীরে তাকে তাদের রহস্যময় জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যে খৃস্টান লোকটি হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে হাবীবুল কুদ্দুস তাকে বেশ সাহায্য করেছেন। হাবীবুল কুদ্দুস এখন তার পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তি। সে হাবীবুল কুদ্দুসকে মিসরী ফৌজের দু'জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ দু'জন অফিসারের নাম বলে, যারা গোপনে গোপনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরোধিতা করছে এবং বিদ্রোহের কথা চিন্তা করছে। হাবীবুল কুদ্দুসকে হাত করার চিন্তা প্রথমে তাদেরই মাথায় আসে। এই খৃস্টান লোকটি নিজেকে দেশপ্রেমিক মিসরী মুসলমান পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। তার দায়িত্ব মিসরে সেনা বিদ্রোহ ঘটানো।

যোহরা মেয়ে দুটোর সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, এখন বলার উপায় নেই, মেয়েটা কোনো সম্ভ্রান্ত পিতা-মাতার কন্যা এবং একজন মুসলিম নায়েব সালারের স্ত্রী। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে নিজের অনুগত স্ত্রী মনে করতেন।

একদিন যোহরা মেয়েদের বললো, এই জীর্ণ ভবন আর পর্বতবেষ্টিত জগতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছি। মেয়েরা বললো, ঠিক আছে, আমরা তোমাকে এই বাইরের জগত দেখানো ব্যবস্থা করবো। তারা এক পার্বত্য পথে তাকে একটি ঝিলের কিনারায় নিয়ে যায়। কূল বেয়ে বেয়ে আরো অগ্রসর হলে সে নীলনদ দেখতে পায়। এই নীল নদেরই পানি

পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে ঝিলের সৃষ্টি হয়েছে। এক স্থানে এক পাহাড়ের আড়ালে একটি নৌকা বাঁধা আছে। তাতে বৈঠা ও দু'টি দাঁড় আছে। জায়গাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম। যোহরা মেয়েদের সঙ্গে সেখানে হাসি-তামাশা করতে থাকে।

'এখানে ফেরাউনদের রাজকন্যারা খেলা করতো।' এক মেয়ে বললো।

'আর তোমরা দু'জন তাদের প্রেতাত্মা।' যোহরা রসিকতা করে।

'তোমার তুলনায় আমরা প্রেতাত্মা-ই।' অপর মেয়ে বললো।

'শোনো যোহরা!'— এক মেয়ে বললো— 'তুমি কি বুঝতে পেরেছো, তোমার এই বৃদ্ধ স্বামী এখানে কেনো লুকিয়ে বসে আছে এবং তোমাকে কেনো ডেকে এনেছে?'

'সে তো প্রথম দিনই আমাকে বলে দিয়েছেন'— যোহরা বললো— 'আমি কাজটা করে দেবো। কিন্তু তিনি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বলছেন।'

'আর তুমি কি জানো, আমরা স্বাধীন মিসরের রাজকন্যা হবো?'

'আমাকে যদি এই স্বামী থেকে মুক্ত করিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাদেরকে রাজকন্যা মনে করবো।' যোহরা বললো।

'সে পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে'— এক মেয়ে বললো— 'কিন্তু তোমার স্বামী বিষয়টা জানে না। এ ক্ষেত্রে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তুমি কি তার জন্য প্রস্তুত আছো?'

'সময় আসলেই দেখবে'— যোহরা বললো— 'আমার যদি এ কাজটা করতে না হতো, তাহলে স্বামীকে এখানেই খুন করে ফেলতাম। ভালোই সুযোগ ছিলো।'

যোহরা পরদিনও মেয়েদের সঙ্গে নদীর কূলে চলে যায়। মেয়েরা তাকে যে পথে নদী পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, একা গেলে এ পর্যন্ত যোহরা পথ খুঁজে পেতো না। পথটা প্রাকৃতিক এবং গোপন। যোহরা আবদার জানায়, চলো আমরা নৌকায় চড়ে নদীতে বেড়িয়ে আসি। কিন্তু মেয়েরা তাতে অসম্মতি জানায়।

হাবীবুল কুদ্দুসের উপরও এখন আগের মতো পাবন্দি নেই। তিনি নিশ্চিত করেছেন, তিনি স্বাধীন মিসরের সমর্থক এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মসনদ না উল্টিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। এখন তিনি আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন। এক অভাবিতপূর্ব বিপ্লব এসে গেছে তার মধ্যে।

এক-দু'দিন পর ভগ্ন প্রাসাদে আরো দু'জন লোক আসে। একজন সুদানী, অপরজন মিসরী। তাদেরকে হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হলো। তিনি তাদেরকে চেনেন না। তাদের সঙ্গে সুদান, মিসর ও আরবের মানচিত্র আছে। আছে কিছু কাগজপত্রও।

তারা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করে। হাবীবুল কুদ্দুস শুধু আন্তরিকতাই প্রকাশ করেননি– বরং তাদেরকে এমন সব পরামর্শ প্রদান করেন, যা ইতিপূর্বে তাদের মাথায় আসেনি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসকে আরো কয়েক ব্যক্তির নাম জানায়, যারা মিসরের ফৌজ ও প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং গোপনে গোপনে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি করছে। লোক দু'জন আরো জানায়, মিসরের সীমান্ত এলাকায় মিসরী ফৌজের যে বাহিনীটি কর্তব্য পালন করছে, তাদেরকে ভুল নির্দেশ দিয়ে সীমান্ত প্রতিরক্ষায় এমন একটা ফাঁটল ধরাতে হবে, যার সুযোগে সুদানের কিছু সৈন্য ভেতরে অনুপ্রবেশ করে বিদ্রোহে সহযোগিতা দিতে পারে।

'বিদ্রোহ সফল হলে মিসরের আমীর কে হবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, স্বাধীন সেনাপতি আপনি হবেন। সেই সুবাদে আমীরও হবেন আপনিই।' মিসরী বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবী আক্রমণ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই এবং যুদ্ধ দীর্ঘরূপ লাভ করতে পারে। সে কারণে স্বাধীন মিসরের প্রথম আমীর প্রধান সেনাপতিই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসামরিক লোককে ক্ষমতার গদিতে বসানো ঠিক হবে না। আর আপনার মধ্যে যে গুণাবলী আছে, অন্য কোন সালারের মধ্যে তা নেই।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। বুকটা ফুলে যায়। ঘাড়টা মোটা হয়ে যায়। মিসরের আমীর হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

'প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা খৃস্টানদের থেকেও সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আশা করি, এতে আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না।' সুদানী বললো।

'তাদেরকে বিনিময়টা কীভাবে দেবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করেন।

'তাদের জন্য বিনিময় এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো এবং মিসরকে তার থেকে মুক্ত করবো'–

মিসরী বললো– 'তারা মিসর চায় না। তারা ফিলিস্তীনকে আইউবীর হাত থেকে রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত। মিসর হাতছাড়া হয়ে গেলে আইউবী মিসরের সেনাবাহিনী, এখানকার রসদ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। তিনি মিসরের উপর আক্রমণ চালালে তার সঙ্গে যেসব মিসরী সৈন্য আছে, তারা তাদের মিসরী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। খৃস্টানদের জন্য এ এক বিরাট পাওয়া।'

হাবীবুল কুদ্দুস তাদেরকে চমৎকার চমৎকার সব বুদ্ধি শিখিয়ে দেন এবং তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমার অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে, তারা আমার এক ইঙ্গিতে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য রাজি করানোর পন্থা কী হবে।

'এক হতে পারে, আমি ফেরত চলে যাবো'-- হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'এটিই উত্তম পন্থা। তবে আমার ফেরত না যাওয়াই উচিত। কারণ, গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় ছিলাম। যোহরা আমাকে বলেছে, আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস বলছেন, আমি আপন মর্জিতে শত্রুর নিকট চলে এসেছি। ফিরে গেলে এই সন্দেহের ভিত্তিতে তারা আমাকে হেফাজতে নিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হওয়ার আগেই আমাদের খেল খতম হয়ে যাবে। আমি আসলে স্ত্রীকে এখানে ডেকে এনে ভুল করেছি। যদি তাকেও ফেরত পাঠিয়ে দেই, তার সঙ্গেও অসদাচরণ করা হবে। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনারা আমাকে ভাববার সুযোগ দিন, আমি কোন্ কোন্ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

হাবীবুল কুদ্দুসের অফাদারিতে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না।

❖ ❖ ❖

'হাল্‌বের অবরোধ তামাশা হবে না'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ফোরাতের তীরে বসে তাঁর সালারদের বলছেন– 'তোমাদের প্রত্যেকের স্মরণ থাকবে, পূর্বেও একবার আমরা এই নগরীটা অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু হাল্‌বের মানুষ এমন প্রাণপণ লড়াই করে যে, আমরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে ছিলো হাল্‌ববাসীদের বীরত্ব, যা আমাদেরকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছিলো। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তথাপি আমাদেরকে প্রতিটি আশঙ্কার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি

নিয়ে রাখতে হবে। এখান থেকে ফৌজে যে ভর্তি নেয়া হয়েছে, তাদের উপর এখনো ভরসা করা যাবে না। মিসর থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে। আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের বাহিনীটাকে নিয়ে আসবো।' বলেই সুলতান নীরব হয়ে যান। তার চেহারার রং বদলে যায়। তিনি চাপা চাপা কণ্ঠে বললেন– 'আমি মানতে পারছি না, হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। লোকটা গেলো কোথায়? আমি যখন মিসর থেকে রওনা হই, তখন সে আমাকে বলেছিলো, আপনি মিস্ররের চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিন। ক্রুসেডার কিংবা সুদানীদের যদি আপনার অনুপস্থিতিতে মিসরের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে আমার তিন হাজার পদাতিক আর দুই হাজার অশ্বারোহী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে দেবে। আর যদি মিসরের ভেতর থেকে কেউ মাথা জাগায়, তাহলে তার মাথা ধড়ের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আমরা আল্লাহর সৈনিক। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস তো আল্লাহর সিংহ ছিলো।'

'মনে হয় তার এসব গুণাবলী দেখেই দুশমন তাকে গুম করে ফেলেছে'– এক সালার বললেন– 'আমাদের অর্ধেক ফৌজের উপর তার গভীর প্রভাব রয়েছে। এদিক থেকে তিনি স্বয়ং একটি শক্তি। দুশমন আমাদেরকে সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলো।'

'তাকে যদি খুঁজে না-ই পাওয়া গেলো, তাহলে তার বাহিনীকে এখানে নিয়ে আসবো'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে এতো তাড়াতাড়ি ডাকবো না। মিসরের প্রতিরক্ষা বেশি জরুরি। আশঙ্কার ব্যপার হচ্ছে, মিসরের বাইরে থেকে অতোটুকু সমস্যা নেই, যতোটুকু ভেতর থেকে আছে। ঈমান বিক্রেতারা আমাদের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা ফিলিস্তীনকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পরম বিশ্বস্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নায়েব সালার কায়রো থেকে দূরে পাহাড়বেষ্টিত এক ভীতিকর জীর্ণ প্রাসাদে বসে মিসরে বিদ্রোহ করার সকল আয়োজন-পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এখন রাত। জীর্ণ প্রাসাদে উৎসব চলছে। বাইরে থেকে কোনো লোক এখানে এলে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এই গোটাকতক পুরুষ আর রূপসী মেয়েদের দেখলে জিন-পরী মনে করতো।

এরা আট-দশজন পুরুষ। হাবীবুল কুদ্দুস প্রথম দিন থেকে পরিচিত খৃস্টান লোকটা আর পরে আসা মিসরী ও সুদানী লোক দু'জনকে ছাড়া

আর কাউকে চেনেন না। অন্যদেরকে এই আজই প্রথমবার দেখলেন। তারা সকলে এই প্রাসাদে হাবীবুল কুদ্দুসের আগমনের পূর্ব থেকেই অবস্থান করছে। কিন্তু তারা পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। হাবীবুল কুদ্দুস পালাতে গিয়ে যে লোকটাকে হত্যা করেছিলেন, এরা তারই সহকর্মী। এখন আর পাহারার প্রয়োজন নেই। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন। তারা গোপনে গোপনে তাকে পরীক্ষাও করে দেখেছে।

আজ রাত পুরো দলটি উৎসবে উপস্থিত। কোনো রাজপ্রাসাদে যেরূপ নিমন্ত্রণের আয়োজন করা হয়, আজ এখানেও অনুরূপ আয়োজন করা হয়েছে। একের পর এক মদের সোরাহি শূন্য হচ্ছে। মেয়ে দুটো নাচ দেখিয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। কিন্তু তিনি মদপান করতে অস্বীকার করেন। তাকে বাধ্য করা হলো না। যোহরা অন্য মেয়েদের ন্যায় মদ পরিবেশন করে। কিন্তু নিজে পান করেনি। খৃস্টান লোকটি সুদানী ও মিসরীয়কে যোহরা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছে। অন্যথায় হাবীবুল কুদ্দুস বিগড়ে যেতে পারে। যোহরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উল্লাসে অংশগ্রহণ করলেও অন্য মেয়েদের ন্যায় অশ্লীলতা প্রদর্শন করেনি।

মধ্যরাত নাগাদ সকলে মদে মাতাল হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। মিসরী ও সুদানী লোকটি মেয়ে দুটোকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে চোখে ইশারা করে। হাবীবুল কুদ্দুস উঠে যান। মিসরী ও সুদানী মেয়ে দুটোকে নিয়ে যে কক্ষে গিয়েছিলো, যোহরা সেই কক্ষে উঁকি দিয়ে তাকায়। চারজনই বিবস্ত্র পড়ে আছে। একজনেরও সংজ্ঞা নেই। ওদের অস্ত্র কোথায় থাকে, যোহরার জানা আছে। সে একটা বর্শা, একটা তরবারী, দুটো ধনুক ও তীর ভর্তি দু'টিকে তূনীর তুলে নেয়। হাবীবুল কুদ্দুস তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। যোহরা এলে তিনি তার হাত থেকে তরবারীটা নিয়ে নেন। একটা ধনুক ও একটা তূনীর কাঁধে ঝুলিয়ে নেন। আরেকটা তূনীর ও বর্শা যোহরার কাছেই থেকে যায়।

'এদের সব ক'জনকেই হত্যা করবো?' যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে জিজ্ঞেস করে।

'আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আমাকে নদী পর্যন্ত নিয়ে চলো।'

যোহরা পথটা দেখে রেখেছে। আগে না দেখলে এ পথে বের হওয়ার সাধ্য তাদের ছিলো না। যোহরা আগে আগে হাঁটতে শুরু করে। তারা পা টিপে টিপে হাঁটছে। কান চারটা একদম খাড়া। যোহরা বর্শা আর হাবীবুল কুদ্দুস তরবারী তাক করে রেখেছে।

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে নৌকার কাছে নিয়ে যায়। এটি খৃস্টানদের লুকিয়ে রাখা নৌকা। দু'জনে বাঁধন খুলে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসে। হাবীবুল কুদ্দুস আস্তে আস্তে দাড় বাইতে শুরু করে, যাতে শব্দ না হয়। প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতি পদে ভয়, কোনো না কোনো দিক থেকে কেউ বেরিয়ে আসে কিনা কিংবা কোনো দিক থেকে তীর ছুটে আসে কিনা। কিন্তু কিছুই হলো না। নৌকা পর্বতমালার সরু পথে বেরিয়ে যায়। নদীর শোর কানে আসতে শুরু করে।

'আল্লাহর নাম নাও যোহরা!'– হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আর একটা দাড় তুমিও হাতে নাও। তুমি জিহাদে অংশ নেয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলে। আল্লাহ তোমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা এখনো বিপদ থেকে বের হইনি। নৌকাটা নদীর মাঝে নিয়ে চলো।'

দু'জনে দাড় বাইতে শুরু করে। নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। পর্বতমালার কালো দৈত্যগুলো পেছনে সরে যেতে এবং ধীরে ধীরে ছোট হতে শুরু করেছে।

পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ নীলনদ। সময়টা নদ-নদীর ভর যৌবনের। কূল ঘেঁষে ঘেঁষে স্রোতের গতিতে চলা নিরাপদ। মাঝে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা একটির উপর একটি আছড়ে পড়ছে। কাজেই, মাঝ নদী অনিরাপদ। কিন্তু কূল ঘেঁষে চলায় অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ। শত্রুর তীর এসে ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে দু'জনের। অগত্যা কূল ত্যাগ করে মাঝ পথেই যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন হাবীবুল কুদ্দুস।

নৌকার গতি ঘুরিয়ে দিলেন মাঝের দিকে। শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌছে হঠাৎ অনুভব করলেন, কোনো একটা শক্তি তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শক্তিমান ঢেউ মাথায় করে নৌকাটা উপরে তুলছে, আবার আছড়ে ফেলে দিচ্ছে। স্রোতের গতিতে নৌকা এগিয়ে চলছে তর তর করে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বললেন– 'ভয় পেও না। আমরা ডুববো না। আমি দিকটা একটু নির্ণয় করে নিই।'

'আপনি আমার চিন্তা করবেন না'– যোহরা বললো– 'ডুবে যদি যাই তো কী হবে? কাফেরদের কবল থেকে তো বেরিয়ে এসেছি।'

হাবীবুল কুদ্দুস চোখ তুলে পর্বতমালার দিকে তাকান। উঁচু উঁচু পর্বতগুলো এখন মাটির টিপির ন্যায় মনে হচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– 'আমি এ জায়গাটা চিনি। এই অঞ্চলেরই এক স্থানে আমি আমার বাহিনীকে পাহাড়ি যুদ্ধের মহড়া করিয়েছিলাম। এদিকে নদীর দিকটা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। আমরা সোজা কায়রোই যাচ্ছি। নীলনদ আমাদেরকে অতি দ্রুততার সাথে কায়রো নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর শোকর আদায় করো যোহরা। এটা আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ মানুষের নিয়ত বোঝেন। তবে আমাদেরকে কায়রোর আগে অন্য এক স্থানে থামতে হবে। কিছুদূর আগে নদীর বাঁক আছে। তারই সন্নিকটে আমাদের ফৌজের চৌকি। সামুদ্রিক টহলের জন্য তাদের কাছে অনেক নৌকা আছে। এ চৌকির সৈন্যদের দ্বারাই আমরা ওদের সকলকে পাকড়াও করাতে পারবো। কিন্তু তারা সজাগ হয়ে যাবে।'

'আমি আশা করি, কাল দুপুর পর্যন্ত তাদের একজনেরও ঘুম ভাঙবে না'– যোহরা বললো– 'তারা আমার হাতে মদ খানিকটা বেশিই পান করেছে। আমি ভরা সোরাহী থেকে তাদেরকে যে এক এক পেয়ালা করে পান করিয়েছিলাম, তাতে খাকি বর্ণের সামান্য পাউডার মিশিয়ে দিয়েছি।'

'ওটা কী জিনিস?'

'মেয়ে দুটোর হৃদয়ে আমি কী পরিমাণ আস্থা অর্জন করে নিয়েছিলাম, তাতো আমি প্রতি রাতে আপনাকে অবহিত করেছি'– যোহরা বললো– 'গতকালের ঘটনা। তারা আমাকে হাশিশ দেখিয়ে তার ব্যবহার প্রণালী বুঝিয়ে দিয়েছে। পড়ে একটি ডিবা খুলে আমাকে এই পাউডারগুলো দেখিয়ে বললো, কোনো কোনো লোককে অনেক সময় অজ্ঞান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এখান থেকে সামান্য পাউডার শরবত পানি কিংবা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে যেখানে খুশি তুলে নিয়ে যাও। আজ রাত যখন আমি মটকা থেকে সোরাহী ভরতে গেলাম, তখন ওখান থেকে অর্ধেক পাউডার তাতে মিশিয়ে নিয়েছিলাম। বস্তুটার ক্রিয়া যদি সেরূপই হয়, যেরূপ মেয়েরা বলেছে, তাহলে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সংজ্ঞা ফিরে আসবার কথা নয়।'

হাবীবুল কুদ্দুসের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। এ অশ্রু আনন্দের। এ অশ্রু আবেগের। এ অশ্রু যোহরার কৃতিত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসার। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলাম যোহরা। তোমাকে আমি যে জগতের রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, সে হচ্ছে পাপের, নোংরা অথচ অত্যন্ত সুদৃশ্য জগত। আমার জন্য তুমি অনেক কুরবানী দিয়েছো।'

'আপনার জন্য নয়– ইসলামের জন্য'– যোহরা বললো– 'আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনি আমাকে এই পবিত্র কর্তব্য পালনের সুযোগ দিয়েছেন। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আমি পাপের সেই চিত্তাকর্ষক জগতে গিয়েও নিজের আঁচলকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছি। ভালোই হলো যে, এখানে নিয়ে আসার পর তারা আমাকে আপনার সঙ্গে নির্জনে থাকতে দিয়েছে। অন্যথায় আপনি আমাকে জানাতে পারতেন না, তারা আপনাকে বিদ্রোহ করার জন্য অপহরণ করেছে। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে এ কাজের জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'না'– হাবীবুল কুদ্দুস উত্তর দেন– 'এ পন্থাটা তোমার আসার পরে আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি অন্য কিছু চিন্তা করেছিলাম। তোমাকে আমার মুক্তির জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিলো। ইচ্ছা ছিলো, তোমাকে বার্তাবাহক বানাবো। কিন্তু এখানে এসে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পর আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা আসে। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সাফল্যে এখন আমরা মুক্ত। আমরা বাড়াবাড়ি না করে লোকগুলোর প্রতি আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করি। আমি জানতাম, ওরা অস্বাভাবিক চালাক হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যদি ঈমান ও হুঁশ-জ্ঞান অটুট রাখি, তাহলে ওরা নির্বোধ। আমার সঙ্গে তুমি যে লোকটাকে দেখেছিলে, সে নিজেকে মিসরী মুসলমান দাবি করতো। আমি প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছি, লোকটা খৃস্টান এবং আমি খৃস্টানদের জালে এসে পড়েছি।'

❖ ❖ ❖

পাহাড়ি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন হাবীবুল কুদ্দুস ও যোহরা। মাঝ নদীটা এখন পূর্বের চেয়ে বেশি উত্তাল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকাটা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নীলের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। দাড়-বৈঠা কোনো কাজ করছে না। নদীর উতলার তীব্রতায় বোঝা যাচ্ছে, এ

স্থানটায় এসে নদী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই সেই বাঁক, যার সম্মুখে মিসরের সামরিক চৌকির অবস্থান। হঠাৎ নৌকা দাঁড়িয়ে গিয়ে চক্কর কেটে ঘুরে যায়। হাবীবুল কুদ্দুস বৈঠাটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। নদীর শোর আরো বেড়ে গেছে। নৌকা ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নৌকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হলেন না। দুই আরোহীসহ নৌকা নীলের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

'যোহরা'– হাবীবুল কুদ্দুস চীৎকার করে বললেন– 'আমার পিঠে চড়ে বসো।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের পিঠে সওয়ার হয়ে উভয় বাহু দ্বারা শক্তভাবে গলায় জড়িয়ে ধরে রাখে। হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আরো শক্ত করে ধরো। আমার থেকে আলাদা হয়ো না।' বলেই পাকের উপর সাঁতরাতে সাঁতরাতে নৌকা থেকে এমনভাবে লাফিয়ে পড়েন, যেনো ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে নিয়ে পানির ভেতর চলে যান এবং দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আবার ভেসে ওঠেন। তিনি ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু জায়গাটা বাঁক। উভয় দিকে চড়া। ফলে তরঙ্গ অত্যন্ত উঁচু এবং বিক্ষুব্ধ। যোহরা সাঁতার জানে না। সে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে শুরু করে। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে পিঠে বহন করে তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার ও যোহরার মুখ যাতে পানির বাইরে থাকে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ঢেউ বারংবার তাকে ডুবিয়ে উপর দিয়ে অতিক্রম করছে।

ঊর্মিমালা হাবীবুল কুদ্দুসকে নদীর বাঁক থেকে বের করে নিয়ে যায়। এবার নদীটা চওড়া হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুসের বাহু ও পা অবশ হয়ে গেছে। তিনি শক্তির শেষ বিন্দুটুকু একত্রিত করে এই স্রোত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জোর চেষ্টা চালাতে শুরু করেন। তিনি অনুভব করেন, যোহরার বন্ধন ঢিলা হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস বুঝে ফেলেন, যোহরার মুখ ও নাকের পথে পানি ঢুকে গেছে। তাকে রক্ষা করা ও নিজে সাঁতার কাটা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তিনি এক হাতে যোহরাকে ধরে সর্বশক্তি ব্যয় করে সাঁতার কেটে খরস্রোত থেকে বেরিয়ে যান। কূল এখনো অনেক দূরে। এখন সাঁতার কাটা সহজ হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে শুরু করেন।

হাবীবুল কুদ্দুসের দেহটা নিস্তেজ হয়ে আসে। যোহরাও তার হাত

থেকে ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় একটা নৌকা তার নিকটে এসে যায়। কানে শব্দ ভেসে আসে– 'কে?' হাবীবুল কুদ্দুস শেষবারের মতো অবশ হাতটা উপরে তোলে খপ করে নৌকার কিনারা ধরে ফেলে বলে ওঠেন– 'ওকে আমার পিঠ থেকে তুলে নাও।' নৌকার লোকেরা যোহরাকে টেনে উপড়ে তুলে নেয়। মেয়েটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। নৌকাটা তারই বাহিনীর। এখানেই তাদের চৌকি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসের ডাকে এদিকে এসেছে।

চৌকিতে পৌঁছে হাবীবুল কুদ্দুস জানান, আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস। চৌকির কমান্ডার তাকে চিনে ফেলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হন। যোহরা অচেতন পড়ে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠ ও পাজরে সজোরে চাপ দেন। তাতে মুখ ও নাকের পথে অনেক পানি বেরিয়ে আসে। তবে এখনো তার সংজ্ঞা ফিরে আসেনি। হাবীবুল কুদ্দুস কমান্ডারকে বললেন, দু'টি বড় নৌকায় দশ দশজন করে সৈনিক আরোহণ করাও এবং পার্বত্য অঞ্চলের দিকে রওনা হও। তিনি জানান, পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ আছে, তাতে দশ-বারোজন খৃস্টান সন্ত্রাসী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদেরকে তুলে আনতে হবে। আমার স্থল পথের রাস্তাটা জানা নেই।'

'আমি চিনি'– কমান্ডার বললো– 'স্থল পথেই যাওয়া সহজ হবে।'

বিশজন অশ্বারোহীর সম্মুখে হাবীবুল কুদ্দুস ও চৌকির কমান্ডার। ভোরের আলো এখনো ফোটেনি। আবছা অন্ধকার। তারা পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়েছে। নীরবতার খাতিরে ঘোড়াগুলো বাইরেই রেখে তারা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায়। নদী হাবীবুল কুদ্দুসের দৈহিক শক্তি চুষে নিয়েছিলো। তারপরও হাঁটছেন তিনি। স্ত্রীকে অচেতন অবস্থায় চৌকিতে রেখে এসেছেন। স্ত্রীকে সারিয়ে তোলার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার। পাহাড়-টিলার সরু অলি-গলি অতিক্রম করে এগিয়ে যায় তারা। কিছুক্ষণ পর প্রাসাদ চোখে পড়তে শুরু করে।

সবার আগে হাবীবুল কুদ্দুস খৃস্টানকে দেখতে পায়। তার পা দুটো টলমল করছে। মাথাটা এদিক-ওদিক দুলছে। তাকে পাকড়াও করা হলো। সে বিড় বিড় করে ওঠে। সাত-আটজন লোক রাতে যেখানে শুয়েছিলো, সেখানেই অচেতন পড়ে আছে। এক কক্ষে সুদানী, মিসরী এবং মেয়ে দুটো বিবস্ত্র ও বেহুঁশ পড়ে আছে। সৈনিকরা তাদের

প্রত্যেককে তুলে নেয়। তাদের মালামাল তুলে নেয়া হলো। সব ক'জনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে চৌকিতে নিয়ে আসা হলো। অতোক্ষণে যোহ্‌রার চৈতন্যও ফিরে এসেছে।

দুপুরের পর থেকে বন্দিদের হুঁশ ফিরে আসতে শুরু করেছে। এখন তারা কায়রোর পথে। লোকগুলো ঘোড়ার সঙ্গে বাধা। বিশজন সৈনিক তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। কাফেলা চলতে থাকে।

মধ্যরাতের পর আলী বিন সুফিয়ানের চাকর তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে বললো, গবর্নর আপনাকে ডেকেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গবর্নরের কক্ষে চলে যান। গিয়াস বিলবীসও সেখানে উপস্থিত। হাবীবুল কুদ্দুসকে উপবিষ্ট দেখে আলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। হাবীবুল কুদ্দুস সেই সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নাম বললেন, যাদের ব্যাপারে খৃস্টান সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে জেনে এসেছেন। এরা বিশ্বাসঘাতক। এদের বিদ্রোহ সফল করে তোলার কাজে অংশগ্রহণের কথা ছিলো। ভারপ্রাপ্ত গবর্নর তকিউদ্দীনের নির্দেশে লোকগুলো ঘরে ঘরে তৎক্ষণাৎ হানা দেয়া হলো এবং সব ক'জনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের ঘর থেকে যেসব হীরা-জহরত, সোনা-মাণিক্য উদ্ধার হয়েছে, তা-ই তাদের অপরাধ প্রমাণ করছিলো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হাল্‌ব অবরোধের লক্ষ্যে নগরীর সন্নিকটে আল-আখদার নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে নিজ বাহিনীর কিছু কিছু সৈন্য তলব করে এনেছেন। হাল্‌ব সম্পর্কে সালারদের বলে রেখেছেন, এই নগরীর সাধারণ মানুষ মরণপণ লড়াই করবে, যেমনটি প্রথমবারের অবরোধে করেছিলো। যদিও ভেতর থেকে তাঁর গোয়েন্দারা রিপোর্ট করেছিলো, কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধে হাল্‌বের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। সুলতান সতর্ক থাকার পক্ষপাতি। ওখানকার শাসক এখন ইমাদুদ্দীন, যিনি শাসক হিসেবে জনগণের প্রিয় নন। তারপরও সুলতান আইউবী আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে চাচ্ছেন না। তিনি এদিক-ওদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আল-আখদারে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের সর্বশেষ নির্দেশনা প্রদান করছেন।

তাদের জানান কায়রো থেকে দূত এসেছে। দূতের নিয়ে আসা পত্রখানা পাঠ করার পর সুলতানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি উচ্চস্বরে বলে ওঠেন– 'আমার মন বলছিলো হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দেবে না। আল্লাহ্ ইসলামের প্রতিজন কন্যাকে যোহরার জযবা ও ঈমান দান করুন।'

আলী বিন সুফিয়ান নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ফিরে আসার সমস্ত কাহিনী লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তার স্ত্রী যোহরার কথাও উল্লেখ করেছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর লেখান। তাতে গ্রেফতারকৃত গাদ্দারদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেন– 'তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া শহরে শহরে হাঁকাও। গাদ্দারদের গায়ের গোশত হাড্ডি থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া যেনো না থামে।'
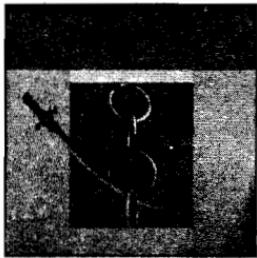
দু'দিন পর সুলতান আইউবী হাল্‌বের উপর চড়াও হন। অবরোধ নয়– আক্রমণ অভিযান। বড় মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর ফটকের উপর পাথর ও তরল দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করা হয়। নগরীর পাঁচিলের উপর এবং ভেতরেও পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতীরের বৃষ্টিবর্ষণ করা হয়। দেয়াল ভাঙার জন্য নিয়োজিত সেনারা দেয়াল ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু নগরবাসী ও ফৌজের পক্ষ থেকে তেমন শক্ত প্রতিরোধ এলো না। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনের আমীর-উজীরগণ তাঁর সহযোগিদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি খৃস্টানদের থেকে সামরিক সাহায্য ছাড়াও বহু সোনা-জহরত গ্রহণ করেছিলেন। তার আমীর-উজীরদের লোভাতুর দৃষ্টি সেই সম্পদের উপর নিবদ্ধ। ভাগ দাও তো যুদ্ধ করবো। অন্যথায় নয়। তারা এমন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বসে যে, সুলতান আইউবীর আক্রমণের ভয়ে পূর্ব থেকেই তটস্থ ইমাদুদ্দীন আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন।

ইমাদুদ্দীন হাল্‌বের দুর্গপতি হুসামুদ্দীনকে এই আবেদন নিয়ে আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন যে, আপনি আমাকে মসুলের সামান্য একটু অঞ্চল দান করুন। সুলতান আইউবী তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন। এ সংবাদ নগরীতে ছড়িয়ে পড়লে জনতা ইমাদুদ্দীনের বাসভবনের সম্মুখে এসে জড়ো হয়। ইমাদুদ্দীন ঘোষণা করে দেন, হ্যাঁ, আমি হাল্‌বের ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। তোমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করে আইউবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও।

নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইয্‌যুদ্দীন জুরদুক এবং যাইনুদ্দীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সুলতান আইউবীর নিকট প্রেরণ করেন। তারা ১১৮৩ সালের ১১ জুন মোতাবেক ৫৭৯ হিজরীর ১৭ সফর সুলতান আইউবীর নিকট গিয়ে পৌঁছেন। তারা হাল্‌বের সকল সৈন্যকে নগরীর বাইরে ডেকে এনে সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দেন। ফৌজের সঙ্গে হাল্‌বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমীর-উজীরগণও বেরিয়ে আসেন। সুলতান আইউবী তাদের প্রত্যেককে মূল্যবান পোশাক উপহার দেন।

আক্রমণের ষষ্ঠ দিন। সুলতান আইউবী জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সময় সংবাদ আসে, স্বীয় ভাই তাজুল মুল্‌ক– যিনি এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন– শাহাদাতবরণ করেছেন। সুলতানের আনন্দ বেদনায় পরিণত হয়ে যায়। তাজুল মুল্‌কের জানাযায় ইমাদুদ্দীনও অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি হাল্‌ব থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবী হাল্‌বের শাসন ক্ষমতা বুঝে নেন।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষ্যমতে, যেসব সৈন্য দীর্ঘদিন যাবত লাগাতার যুদ্ধ করে আসছিলো, সুলতান তাদেরকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। নিজে হাল্‌বের প্রশাসনিক কার্যক্রম গোছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গন্তব্য তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস।

হিত্তীন

৫৩৮ হিজরীর মহররম মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। আজ তাঁর চেহারাটা উজ্জ্বল। চোখে আনন্দের ঝিলিক বিরাজ করছে। তাঁর চেহারার এই ঔজ্জ্বল্য আর চোখের এই ঝিলিক তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও ঘনিষ্ঠজনরা ভালোভাবে জানেন। তিনি যখন কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে এই ভাবটা ফুটে ওঠে। যেসব মুসলিম আমীর, শাসক ও দুর্গপতি ক্রুসেডারদের বন্ধু হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সুলতান তাদের প্রত্যেককে নিজের অনুগত ও পক্ষভুক্ত করে নিয়ে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হলেন হাল্‌ব ও মসুলের গবর্নর ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন। তারা কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সুলতান আইউবীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। তাদের বাহিনী এখন আইউবীর যৌথ বাহিনীর অধীন।

সুলতান আইউবী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ফিলিস্তীন অভিমুখে যাত্রা করার আগে তিনি ঈমান বিক্রেতা মুসলিম আমীর-শাসকদের পদানত করবেন, যাতে তারা তাঁর ও প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধক হতে না পারে। এই প্রতিজ্ঞা পালন করে এখন তিনি দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। তিনি তরবারীর জোরে গাদ্দারদের সোজা পথে এনে বলেননি আমি বিজয়ী। বরং তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, ইসলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি খুবই লজ্জাজনক বিবেচিত হবে, যাতে বর্ণনা করা হবে সালাহুদ্দীনের শাসনামল কালো যুগ ছিলো। সে যুগে ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিলো আর মুসলমানরা আপসে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। অবশ্য সুলতান বলতেন, গাদ্দারদেরকে পক্ষভুক্ত করে আমি ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছি।

আজ যখন তিনি দামেশ্‌কে তাঁর হাইকমান্ডের সালার-উপদেষ্টা এবং

অসামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে তলব করেন, তখন সকলে তাঁর চেহারায় বিশেষ এক দীপ্তি ও চোখে সেই ঝিলিক দেখতে পান, যা মাঝে-মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সকলে বুঝে ফেলে, সুলতান তাঁর গন্তব্য অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। আর সকলের জানা, সুলতানের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস। এখন তাদেরকে তাঁর মুখ থেকে শুনতে হবে, কবে কোন্ সময় যাত্রা শুরু হবে, বিন্যাস কীরূপ হবে এবং পথ কোন্‌টা হবে।'

'আমার বন্ধুগণ!'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভাষণ শুরু করেন– 'আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই এ কথা বলে আমাকে সমর্থন যোগাবেন যে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা করতে প্রস্তুত আছি। আজ আমি আপনাদের উদ্দেশে যে বক্তব্য দান করবো, সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে আপনারা আমাকে যেসব প্রশ্ন করবেন, আপত্তি উত্থাপন করবেন, সব আমাদের ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমাদের শব্দ-ভাষা, আমাদের অঙ্গীকার ইতিহাসের লিপিতে পরিণত হবে। এই লিপি আমাদের সর্বশেষ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আমরা জগতে এই ইতিহাসের লেখা রেখে যাবো আর মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমল নিয়ে উপস্থিত হবো। আমরা আমাদের অনাগত প্রজন্ম এবং মহান আল্লাহর সমীপে লজ্জিত হবো, নাকি সম্মানিত সে সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে। বিজয়ের গ্যারান্টি আমরা কেউ দিতে পারবো না। তবে আমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা লড়াই করবো, জীবন দেবো– ফিরে আসবো না।'

সুলতান আইউবী সকলের প্রতি তাকান। তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠেছে। তিনি বললেন– 'আমি আপনাদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করবো না। আপনাদের কারো কারো মনে ভয় থাকতে পারে, আমাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রুসেডারদের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া আমরা নিজ ভূমি থেকে বহু দূরে যুদ্ধে যাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সব সময় অল্প কম নয়– অনেক কম সৈন্য দ্বারা কয়েকগুণ বেশি দুশমনের সঙ্গে লড়াই করেছি ও বিজয় অর্জন করেছি। যুদ্ধ সংখ্যা দ্বারা নয়– চেতনা ও বুদ্ধি দ্বারা লড়া হয়। ঈমান শক্ত হলে বাহু, তরবারী এবং মনও শক্ত হয়ে যায়। আমাদের কাছে ঈমানের কমতি নেই। বুদ্ধির অভাব নেই। আপনারা ঈমান অটুট রাখুন। শক্তিকে ব্যবহার করুন।'

'আমাদের একজনও নিজেদের ও দুশমনের সামরিক শক্তির তুলনা করছি না'– কমান্ডো বাহিনীর সালার সারেম মিসরী দাঁড়িয়ে বললেন। তিনি

সঙ্গীদের উপর দৃষ্টি বুলান। এক এক করে সকলের প্রতি তাকান। প্রত্যেকে তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বললেন– 'তবে দেখা আবশ্যক, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত কোন্ দিক থেকে এবং কোন্ ধারায় পৌঁছবো। সাবধানতা অবশ্বম্ভাবী। আত্মান্তরিকতা পরিহার করে আমাদেরকে বাস্তবতাকে স্বীকার করে কাজ করতে হবে।'

'আমি আপনাদেরকে এ কথাটাই বলার জন্য তলব করেছি'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অগ্রযাত্রা ও যুদ্ধের পরিকল্পনা আপনাদের পরামর্শেই প্রস্তুত করেছি। আর আমি কয়েক রাত ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমাদের প্রথম মনজিল হবে হিত্তিন। আপনারা সকলে হিত্তিনের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। সেখানে সেই ভূখণ্ড পেয়ে যাবো, যেই ভূখণ্ডে আমি ক্রুসেডারদের লড়াই চাই। যুদ্ধে আপনাদের উত্তম বন্ধু সেই ভূখণ্ড, আপনারা যেখানে দুশমনকে টেনে এনে যুদ্ধ করিয়ে থাকেন। এ কথা আমি আপনাদের আগেও বহুবার বলেছি। কথাটা আপনারা হৃদয়ে অংকন করে নিন। যুদ্ধের জন্য এমন অঙ্গন বেছে নিন, যা আপনাদেরকে উপকার দেবে এবং শত্রুর ক্ষতি করবে। এ অঙ্গন আমরা হিত্তিনের অঞ্চলে পেয়ে যাবো। শর্ত হলো, আমাদেরকে গোপনীয়তা বজায় রেখে দ্রুত গতিতে আগে-ভাগে সেখানে পৌঁছে যেতে হবে এবং দুমশনকে সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে ফেলতে হবে।'

'হিত্তিনের অঞ্চলে উঁচু ভূমি আছে, পানিও আছে। আপনারা যদি উঁচু পাহাড় এবং পানির উৎসগুলো দখল করে নিতে পারেন, তাহলে ভাবতে পারেন আপনারা অর্ধেক যুদ্ধ জিতে গেছেন। তবে দুশমনকে সেখানে টেনে নেয়া সহজ হবে না। আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশও যদি অবাস্তবায়িত থাকে, তাহলে গোটা পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং ধ্বংস আমাদেরকে যে পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা অসম্ভব হবে। আমার ইচ্ছা, এ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা দামেশ্‌ক থেকে রওনা হবো। আমি হাল্‌ব ও মিসরে দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা দ্রুততার সঙ্গে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে পৌঁছে ফৌজ প্রেরণ করবে, যাদের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা মিলবে। আমাদের সকল সৈন্যকে একস্থানে সমবেত করতে হবে। বাইরে থেকে আসা এবং এখানকার সৈন্যদের একত্রিত করে এবং তাদের সালারদেরকে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা

বুঝিয়ে দিয়ে বণ্টন করতে হবে। আমাদের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন অংশের অগ্রযাত্রা হবে। প্রতিটি অংশের পথ আলাদা হবে।'

'আমি যথারীতি গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনাদের ব্যতীত অন্য কারো কোনো কমান্ডার বা সৈনিকের জানবার প্রয়োজন নেই, আমরা কোথায় যাচ্ছি। দুশমনের অঞ্চলে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে। তারা দুশমনের খুঁটিনাটি সকল গতিবিধি ও সিদ্ধান্তের সংবাদ আমাদের পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এখন আবশ্যক হলো, আমাদের অঞ্চলে শত্রুর যেসব গোয়েন্দা আছে, তাদেরকে অন্ধ, বধির ও বিভ্রান্ত বানিয়ে ফেলতে হবে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তারও ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি আপনাদেরকে আরো একটি বিষয় বলে দিতে চাই। তা হচ্ছে, ফৌজের একটি অংশ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাদের কার্ক নিয়ে যাবো।'

সুলতান আইউবী হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যান। তার মাথাটা নুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মাথাটা ঝটকা দিয়ে উপরে তুলে বললেন– 'চার বছর কেটে গেছে আমি একটি কসম খেয়েছিলাম, আমাকে সেই কসম পূরণ করতে হবে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সেই কসম ছিলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি কনফারেন্সে চার বছর আগের সেই ঘটনাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনারা পড়ে এসেছেন, খৃস্টান শাসকগণ এমনই চরিত্রহীন মানুষ ছিলেন যে, তারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতেন। তারা কাজটা সৈন্যদের দ্বারা করাতেন। হজ্ব যাত্রীদের কাফেলা হেজাজ যাওয়া এবং আসার সময় তারা পথে পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকতো। এক খৃস্টান সম্রাট প্রিন্স অর্নাত– যিনি সে সময় কার্কের শাসক ছিলেন– নিজ আদেশে এবং নিজের বিশেষ বাহিনী দ্বারা এ কাজ করাতেন। এই অপকর্মের জন্য তিনি গর্বও করে বেড়াতেন। কোন হজ্ব কাফেলা লুণ্ঠন করাতে পারলে তিনি এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করতেন, যেনো বড় ধরনের বিজয় করে ফেলেছেন। শুধু মুসলমান ঐতিহাসিকগণই নন– ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকগণও তার এই দস্যুবৃত্তির কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

১১৮৩ অথবা ১১৮৪ সালের ঘটনা। অর্নাতের বাহিনী হেজাজ থেকে মিসরগামী একটি হজ্ব কাফেলার উপর আক্রমণ চালায় এবং কাফেলা লুণ্ঠন

করে। মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর এক কন্যাও উক্ত কাফেলায় ছিলো। তবে আর কোন ঐতিহাসিক উক্ত কাফেলার সুলতান আইউবীর কন্যা থাকার কথা উল্লেখ করেননি। একজন ঐতিহাসিক শুধু এটুকু লিখেছেন যে, সুলতান আইউবী যখন অর্নাতের বাহিনীর হজ্ব কাফেলা লুণ্ঠনের এবং কয়েকটি মেয়ের অপহরনের সংবাদ পান, তখন তিনি গর্জে ওঠে বলেছিলেন– 'ওরা আমার কন্যা। আমি এর প্রতিশোধ নেবো।'

কাফেলায় কয়েকটি যুবতী মেয়ে ছিলো। খৃস্টানরা তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। তখনই সুলতান আইউবী কসম খেয়েছিলেন– 'অর্নাতকে আজ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করছি। আমি কসম খাচ্ছি, তার থেকে আমি নিজ হাতে এর প্রতিশোধ নেবো।'

সকলে জানেন, তাদের সুলতান এই ধারায় এবং এই ভঙ্গিতে কখনো কথা বলেননি। তিনি উত্তেজিত হয়ে কথা বলা এবং আবেগ পছন্দ করেন না। তাঁর প্রতিটি উক্তি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। আজ যখন তিনি প্রতিশোধের কসম খেলেন, সকলে বুঝে ফেললেন, এটা সুলতানের প্রত্যয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এমনিতে প্রত্যেক খৃস্টান সম্রাটই ইসলামের দুশমন। কিন্তু অর্নাতের অতিরিক্ত একটি অপরাধ হলো, তিনি ইসলাম ও রাসূলে পাক (সা.) সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করে থাকেন। মুসলিম বন্দিদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাসূলে আকরামকে (সা.) গালাগাল করেন এবং বলেন– 'ডাকো তোদের কাবার প্রভূকে, এসে তোদের সাহায্য করুক। পাঠ করো তোদের রাসূলের কালেমা, তোমরা মুক্ত হয়ে যাও।' তারপর তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তার এই চরিত্র সম্পর্কে সুলতান আইউবী অবহিত ছিলেন। তাই যখনই তিনি অর্নাতের নামোচ্চারণ করতেন, তার প্রতি মন ভরে ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

আজ চার বছর পর সুলতান আইউবী যখন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সেনাভিযানের জন্য সালারদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন, তখন তাদের উক্ত ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন– 'ঐ হতভাগ্য কাফেরটা থেকে আমাকে নিজ হাতে প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহ আমাকে আমার রাসূলের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার সাহস ও সুযোগ দান করুন।' তিনি সালারদেরকে আরো দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বললেন– 'আমি আশা করছি, আমরা তিন মাস পর সেই মওসুমে হিত্তিনের অঞ্চলে গিয়ে উপনীত

হবো, যখন সূর্যের কিরণ পানির ফোটাকে বালিকণায় পরিণত করে দেয় এবং যখন বালির সেই জ্বলন্ত কণাগুলো মানুষকে সিদ্ধ করে ফেলে এবং বালুকাময় প্রান্তরে মরিচিকা আর আকাশে উড়ন্ত বালুকণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আমি ক্রুসেডারদেরকে সেই সময় যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো, যখন সূর্যটা মাথার উপর থাকবে। ক্রুসেডাররা লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণে ঝলসে যাবে। তারা আমাদের তীর-তরবারী-বর্শার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে লোহার পোশাকটা পরিধান করে থাকে, তা প্রত্যেক ক্রুসেডারের জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়ে যাবে।'

যুদ্ধের জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী জুন-জুলাই মাসকে নির্বাচন করেছেন। ইতিহাসবিদ এবং ইউরোপীয় যুদ্ধ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকগণ সুলতান আইউবীর এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। এই সময়টায় মরুভূমি চুল্লি থেকে বের করা লোহার ন্যায় গরম থাকে। ক্রুসেডার সৈন্যরা লোহার পোশাকের নীচে সংরক্ষিত থাকে। তাদের নাইটরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত থাকে। তীর-তরবারী তাদের উপর কোন ক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু সুলতান আইউবী তাদের এই নিরাপত্তা পোশাকটাকে তাদের বিরাট এক দুর্বলতায় পরিণত করে দেন। একে তো তিনি গেরিলা ধরনের যুদ্ধ করতেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের পার্শ্বের উপর বিদ্যুদ্গতিতে আক্রমণ চালাতেন। তারা কাজ সেরে চোখের পলকে উধাও হয়ে যেতো। তার এই কৌশলের কারণে দুশমনকে ছড়িয়ে যেতে হতো এবং চলার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে হতো। কিন্তু এ বর্ম-শিরস্ত্রাণের কারণে তারা প্রয়োজন অনুপাতে দ্রুত দৌড়াতে পারতো না। বিপরীতে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের এ সমস্যাটা ছিলো না।

সুলতান আইউবী আরেকটি কৌশল এই অবলম্বন করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ তখন শুরু করবেন, যখন সূর্য মাথার উপর থাকবে এবং মরুভূমি স্ফুলিঙ্গে পরিণত হবে। এ সময়টায় বর্ম চুলার ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে যায়। পিপাসায় দেহ শুকিয়ে যায়। অথচ পানি থাকবে সুলতান আইউবীর দখলে। মরুভূমির ঝলসানো উত্তাপ ইসলামী বাহিনীর জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করতো। কিন্তু তাদের পোশাক হতো হাল্কা-পাতলা। তাছাড়া সুলতান আইউবীর প্রশিক্ষণ ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তিনি উট-ঘোড়া এবং সমস্ত বাহিনকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মরুভূমিতে রেখে দিতেন এবং নিজেও তাদের সঙ্গে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর ফৌজকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকারও

প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন। তিনি রমযান মাসে প্রশিক্ষণ ও মহড়া বেশি করাতেন এবং বলতেন– এই পবিত্র মাসে মহান আল্লাহ আপন হাতে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

দৈহিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও তিনি সৈনিকদের মানসিক বরং আত্মিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সৈনিকদেরকে বুঝ প্রদান করতেন, তোমরা আল্লাহর সৈনিক এবং ইসলামের সংরক্ষক। তোমরা কোনো রাজা কিংবা সুলতানের কর্মচারি নও। তিনি গনীমতের সম্পদ সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কিন্তু বুঝ দিতেন, যুদ্ধ গনীমতের জন্য লড়া হয় না এবং গনীমত জিহাদের পুরস্কারও নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা ছিলো আত্মমর্যাদাবোধ, যা তিনি সমগ্র বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। যেসব মুসলিম মেয়েকে খৃস্টানরা তুলে নিয়ে যেতো, সুলতান আইউবী তাদের কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেন এবং সেই মুসলিম নারীদেরও, যারা খৃস্টান অধিকৃত অঞ্চলে তাদের হিংস্রতার শিকার হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলো।

'যে জাতি জাতির শহীদ ও মজলুম কন্যাদেরকে ভুলে যায়, সে জাতির ভাগ্যে কাফেরদের গোলামি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়'– কথাটা সুলতান আইউবী সব সময় মুখে আওড়াতেন। তিনি সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করতেন, তাদের গল্প-গুজব ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন। তাদেরকে বলতেন– 'প্রতিশোধ সৈন্যরাই নিয়ে থাকে। ফৌজ যদি দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে তাদের জন্য এ জগতেও অপমান, পরজগতেও অপমান।'

বড় ক্রুশটা সম্মুখে রাখা। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ক্রুশের মোহাফেজ, যিনি আক্রার পাদ্রী। খৃস্টানদের বিশ্বাস মোতাবেক এটি সেই আসল ক্রুশ, যার উপর হযরত ঈসাকে (আ.) শূলি দেয়া হয়েছিলো। তারা মনে করে, এ ক্রুশটার গায়ে এখনো হযরত ঈসা (আ.)-এর রক্তের দাগ বিদ্যমান। একে 'বড় ক্রুশ' বলা হয়। এ কারণেই আক্রার পাদ্রীকে 'বড় ক্রুশের মোহাফেজ' বলা হয়ে থাকে এবং তার আদেশ-নিষেধ সম্রাটদের আদেশ-নিষেধ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। খৃস্টান সম্রাটগণও তার আদেশ-নিষেধ মান্য করে থাকেন। খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েদেরকে তারই অনুমতিক্রমে মুসলমানদের অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি, চরিত্র হনন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রেরণ করা হতো। যে মেয়ে এ কাজের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দায়িত্ব পালনে রওনা

হতো, তাকে ক্রুশের মহান মোহাফেজ দু'আ দিয়ে বিদায় জানাতেন। সেই মেয়েদের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রাখিয়ে অফাদারি এবং ক্রুশকে ধোঁকা না দেয়ার প্রতিজ্ঞা নেয়া হতো। এরূপ প্রতিজ্ঞা খৃস্টান ফৌজের প্রতিজন অফিসার ও সৈনিকের থেকেও নেয়া হতো। শেষে এমনি ছোট্ট একটি ক্রুশ তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

নাসেরা নামক এক স্থানে খৃস্টান সম্রাটগণ সমবেত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গাই অফ লুজিনান, রেমন্ড অফ ত্রিপোলী, গ্র্যান্ড মাস্টার জেরাড, মাউন্ট ফেরাত, হামফ্রে অফ তুরান, এমাল্‌রিক এবং প্রিন্স অর্নাত অফ কার্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কনফারেন্সে আক্রার পাদ্রী 'বড় ক্রুশের মোহাফেজ'ও উপস্থিত আছেন। হলঘরটা কাপড়ের তৈরি একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদের ন্যায় তার কক্ষ, বারান্দা, গলি। রং-বেরঙের বাতির আলো বিদ্যমান। সব মিলে হলটা মর্মর নির্মিত প্রাসাদের চেয়েও বেশি সুদৃশ্য ও মনোরম। তারই আশপাশে মেহমানদের থাকার জায়গা, নাইট ও সৈন্যদের তাঁবু। মদের মটকার সঙ্গে আছে সেসব রূপসী মেয়ে, যাদের যাদুকরী রূপ ভাইকে ভাইয়ের এবং পিতাকে পুত্রের শত্রুতে পরিণত করে থাকে।

পাকা প্রাসাদের কক্ষের ন্যায় এক শামিয়ানার নীচে বড় ক্রুশটা রাখা আছে। তার সামনে তার সম্রাটগণ, তাদের সেনাপতি ও নির্বাচিত নাইটগণ উপবিষ্ট। সকলেই জানেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ এবং ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'সালাহুদ্দীন আইউবীকে চিরতরে খতম করে দাও'।

'ক্রুশের মোহাফেজগণ!'– আক্রার পাদ্রী বললেন– 'এ হচ্ছে সেই ক্রুশ, যার গায়ে হাত রেখে তোমরা সকলে শপথ নিয়েছিলে। আজ এই ক্রুশ তোমাদের সম্মুখে এ কারণে আক্রা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে তার সঙ্গে তোমরা যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা যেনো তাজা হয়ে যায়। আজ তোমাদেরকে এক রক্তক্ষয়ী ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই যুদ্ধ তোমাদেরকে লড়তেই হবে। তোমরা সকলে যোদ্ধা, সেনাপতি। তোমাদের জীবন যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই ময়দানের লোক নই। আমি তোমাদের ধর্মের নেতা। আমি তোমাদেরকে বলতে এসেছি, সালাহুদ্দীন আইউবীকে পরাজিত করে আরব বিশ্বে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জেরুজালেম আমাদের আছে এবং থাকবে।

আমাদেরকে মক্কা-মদীনাও দখল করতে হবে এবং এই পবিত্র ক্রুশকে মুসলমানদের কা'বা ঘরে স্থাপন করতে হবে। তাকে ঈসা মসীহর উপাসনালয় বানাতে হবে।'

'মনে রেখো, তোমরা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিলে। কিন্তু মুসলমানরা তোমাদেরকে আর এগুতে দেয়নি। মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমির সুরক্ষার জন্য যে উন্মাদনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো, তোমাদেরকেও সেই উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টি জেরুজালেমের উপর নিবন্ধ হয়ে আছে। সে বলছে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাস। এটা নাকি তাদের প্রথম কেবলা। তোমরা যদি তার থেকে জেরুজালেমকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে মক্কার উপর দৃষ্টি রাখো। মনে এ কথাটা জাগরুক রাখো, আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে নয়– এটা ক্রুশ ও ইসলামের লড়াই। এটা দু'টি ধর্মের, দু'টি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা যদি জয়ী হতে না পারি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম লড়াই করবে। তারাও যদি ইসলামের বিনাশ ঘটাতে না পারে, তাহলে তাদের পরের প্রজন্ম যুদ্ধ করবে। দু'টি ধর্মের একটির পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। তবে পতন ইসলামেরই হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'আমরা মুসলমানদের পরাজয় ঘটানোর জন্য অন্য পন্থাও অবলম্বন করে রেখেছি। কিন্তু সেটি এখনো সফল হয়নি। তোমাদের সকলেরই জানা থাকবে, সেই অভিযানে আমরা কী পরিমাণ মেয়ে নষ্ট করেছি। বিপুল সম্পদ এবং অস্ত্রও হারিয়েছি। এসব সম্পদ ও অস্ত্র আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে মুসলিম আমীরদের পেছনে ব্যয় করেছি। সেসব মেয়ে ও হীরা-জহরতের বিনিময়ে আমরা এটুকু অর্জন করেছি যে, মুসলমানদের মাঝে মদ ও বিলাসিতার স্বভাব গড়ে ওঠেছে। তারই বদৌলতে আমরা তাদেরকে ছয়-সাত বছর যাবত আপসে যুদ্ধ করিয়ে চলছি। তাদের গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এটুকু লাভবান অবশ্যই হয়েছি যে, মুসলমানদের সামরিক শক্তি বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আইউবীর বহু অভিজ্ঞ ও ভালো ভালো সৈনিক ও কমান্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এ স্বার্থও উদ্ধার করেছি যে, সাত-আট বছর যাবত আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে নিজ অঞ্চল থেকে বের হতে দেইনি। এই সময়টায় আমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এবং জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা এতো শক্ত করে তুলেছি যে, সালাহুদ্দীন

আইউবীর পক্ষে জেরুজালেমের পথে পা রাখাই অসম্ভব হয়ে গেছে।'

'কিন্তু গৃহযুদ্ধের আগে আইউবীর যে অবস্থাটা ছিলো, এখন সেই অবস্থা পুনরায় অর্জন করে নিয়েছে। সে হাল্ব এবং মসুলের সৈন্যদেরও পেয়ে গেছে। সকল মুসলিম আমীর তার সমর্থক হয়ে গেছে। মুজাফফর উদ্দীন ও কাকবুরীর ন্যায় সালার– যারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো এবং আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো– তার নিকট চলে গেছে। সে গাদ্দারদেরকে এমন দুর্বল ও অসহায় করে তুলেছে যে, এখন আর তারা আমাদের কোন কাজে আসছে না, এখন এমন কোন মুসলিম শাসক অবশিষ্ট নেই, যে সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর পেছন থেকে হামলা করবে। আমরা হাশিশিদেরকেও পরীক্ষা করে দেখেছি। চার-পাঁচটি সংহারী আক্রমণেও তারা আইউবীকে হত্যা করতে পারেনি। এখন আমাদের এ ছাড়া আর কোন গতি আর কোনো পথ নেই যে, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আইউবীর উপর আক্রমণ চালাবো। কিন্তু আমাদের সেনাপতিরা পরামর্শ দিয়েছে, আক্রমণটা তাকে যেনো আগে করতে দেই। তারা আমাকে এর দু'টি কারণ বলেছে। এক হচ্ছে, তার বাহিনীকে এতো দূরে নিয়ে যাওয়া দরকার, যেখানে রসদের পদ রুদ্ধ এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় কারণ, সালাহুদ্দীন আইউবী যে ধারায় যুদ্ধ করে, তাতে আমরা আমাদের সৈন্যদেরকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়ে পড়ি। এখন যেহেতু দুশমনের অঞ্চলে আমাদের কোনো সহযোগি রইলো না, তখন আক্রমণের ঝুঁকি আমাদেরকে বুঝে-শুনে নিতে হবে।'

'আমাদেরকে বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক সালাহুদ্দীন আইউবী জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। এখন তোমাদেরকে দেখতে হবে, সে কোন্ পথে আসে। সোজা জেরুজালেমের দিকে আসে, না কী করে। আমাদেরকে এই বাস্তবতা স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা একাকি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পেরে ওঠবো না। এখন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছো। বড় ক্রুশকে এখানে টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা সকলে একসঙ্গে ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ নাও, তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং ইসলামের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।'

সকলে উঠে দাঁড়ায়। ক্রুশের গায়ে হাত রাখে। আক্রার পাদ্রীর উচ্চারিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করে শপথ গ্রহণ করে।

❖ ❖ ❖

পরদিন সম্রাটগণ বেশ বেলা হলে জাগ্রত হন। রাতে পাদ্রী ছুটি দেয়ার পর তারা মদ-নাচে মগ্ন হয়ে পড়েন। প্রত্যেকে আপন আপন পছন্দের মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তাদের রূপ, অর্ধনগ্ন দেহ, বিক্ষিপ্ত রেশমি চুল, হৃদয়কাড়া নাচ আর মদ এই ভূখণ্ডটাকে ভূস্বর্গে পরিণত করে ফেলেছে। পরদিন সূর্যোদয় হয়ে গেছে। কিন্তু নিদ্রা খৃস্টানদের এই রাজকীয় ক্যাম্পে কবরের নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

প্রিন্স অর্নাতের তাঁবু থেকে এক তরুণী বের হয়। অতিশয় রূপসী ও দীর্ঘকায় মেয়ে। আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ। টানা টানা কাজলকালো চোখ দুটোয় যেনো যাদুর ক্রিয়া। এই রং আর এই চোখ খৃস্টান কিংবা ইহুদী মেয়েদের নয়। সুদান, মিসর কিংবা দামেশ্‌কের মেয়ে বলে মনে হলো। মেয়েটা অবর্ণনীয় রূপসী হওয়ার পক্ষে এ প্রমাণটাই যথেষ্ট যে, প্রিন্স অর্নাত তাকে পছন্দ করে সঙ্গে এনেছেন।

মেয়েটাকে দেখে এক বৃদ্ধা চাকরানি দৌড়ে তার নিকট চলে আসে। এখানে সম্রাটদের চাকর-চাকরানিদের সংখ্যা এখানকার সেনাসংখ্যা অপেক্ষা বেশি। অর্নাত মেয়েটাকে প্রিন্সেস লিলি বলে ডাকেন। আকারে-গঠনে-উচ্চতায়-অবয়বে মেয়েটাকে রাজকন্যাই মনে হলো। সে চাকরানিকে বললো– 'স্রেফ আমার জন্য তাড়াতাড়ি নাস্তা নিয়ে আসো আর গাড়ি প্রস্তুত করো। আমি ভ্রমণে বের হবো।'

অর্নাত গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আছেন। জাগ্রত হতে তার কোন তাড়া নেই। শুধু পাদ্রী সকাল সকাল জাগ্রত হয়ে উপাসনা করে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। লিলির এখন কোনো কাজ নেই। নাস্তা আসতে আসতে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। নাস্তা সারতে না সারতে গাড়িও এসে হাজির। দুই ঘোড়ার সুদৃশ্য গাড়ি। কার্ক থেকে অর্নাতের সঙ্গে সে এ গাড়িতে করেই এসেছিলো।

গাড়িতে চড়ে বসার আগে মেয়েটি গাড়োয়ানকে বললো– 'এই এলাকাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম লাগছে। আমি ভ্রমণে যেতে চাই। তুমি কি অঞ্চলটা চেনো?'

'ভালোভাবেই চিনি প্রিন্সেস'– গাড়োয়ান উত্তর দেয়– 'আপনি যদি ভ্রমণে যেতে চান, তাহলে তীর-ধনুক-তূনীরও নিয়ে নিই। শিকারও খেলতে পারবেন। এ অঞ্চলে হরিণ বেশি নেই বটে; তবে কোথাও কোথাও দেখাও যায়। অনেক খরগোশ আছে। পাখিও আছে।'

লিলি মুচকি হেসে বললো– 'তুমি কি আমাকে তীরন্দাজ মনে করছো? আচ্ছা যাও। নিয়ে আসো।'

'কোন সমস্যা নেই'– গাড়োয়ান বললো– 'আপনি যুদ্ধে তো আর যাচ্ছেন না। শিকারের গায়ে তীর ছোঁড়ার পর যদি ব্যর্থ যায়, তাহলে সমস্যার তো কিছু নেই।'

গাড়োয়ান ছুটে গিয়ে তীর-ধনুক-তূনীর নিয়ে আসে।

গাড়ি তাঁবু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। গাছ-গাছালিও আছে বেশ। আছে উঁচু উঁচু টিলা-টিপি। সময়টা মার্চ-এপ্রিল। বসন্ত কাল। তাতে এলাকাটা অধিকতর সুদৃশ্য হয়ে ওঠেছে। গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। লিলির কথায় একটি ঝাড়ের নীচে গাড়ি থেমে যায়। লিলি নেমে পড়ে। গাড়োয়ানের নাম সায়বাল। ধর্মে খৃস্টান এবং উক্ত অঞ্চলেরই অধিবাসী। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। সুদর্শন ও দীর্ঘকায় যুবক। এসব দেখেই অর্নাত তাকে নিজের গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবে নির্বাচন করেছেন। লিলিরও লোকটা বেশ পছন্দ। প্রাণোচ্ছল ও অনুগত লোক। লিলির অর্নাতের নিকট আসার এক বছর পর সায়বাল তাদের কাছে এসেছিলো।

'আচ্ছা, মুসলমানদের সীমান্ত কোথা থেকে শুরু হয়েছে?' লিলি গাড়ি থেকে নেমে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে।

'কোন ফৌজ যে স্থানে পৌঁছে ছাউনি ফেলে বসে, সেটাই তাদের সীমানা হয়ে যায়'– গাড়োয়ান উত্তর দেয়– 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারবো, এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে সমুদ্রের দিকে বিস্তীর্ণ একটি ঝিল আছে। তার নাম গ্যালিলি। তারই কূলে তাবরিয়া নামক একটা পল্লী আছে। তার থেকে খানিক এদিকে হিত্তিন নামে বিখ্যাত একটি গ্রাম আছে। ঐ ঝিলটা অতিক্রম করে গেলেই মুসলমানদের অঞ্চল শুরু হয়ে যায়।'

'তার মানে মুসলমানদের অঞ্চল এখান থেকে বেশি দূরে নয়'– লিলি বললো– 'আমরা কি গাড়িতে করে ঝিল পর্যন্ত যেতে পারবো?'

'আমরা কার্ক থেকে ঘোড়াগাড়িতে করে এসেছি'– সায়বাল বললো– 'ঝিল অনেক কাছের এলাকা। এই ঘোড়া দুটো ক্লান্তি ছাড়াই সে পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।'

লিলি শিশুদের ন্যায় পথ-ঘাট জিজ্ঞেস করতে শুরু করে। গাড়োয়ান মাটিতে রেখা টেনে নকশা এঁকে তাকে রাস্তা বোঝাতে শুরু করে।

‘এখান থেকে দামেশ্‌ক যাওয়ারও তো পথ আছে, না?’ লিলি জিজ্ঞেস করে।

‘হ্যাঁ আছে’ বলে গাড়োয়ান তাকে দামেশ্‌কের পথটাও বুঝিয়ে দেয়।

❖ ❖ ❖

লিলি তূনীর থেকে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করে গাছে পাখি দেখতে শুরু করে। ঐ এক গাছে কি একটা পাখি যেনো বসে আছে। লিলি তীর ছোঁড়ে। কিন্তু তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লিলি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। গাড়োয়ান এগিয়ে এসে নিশানা ঠিক করার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়। লিলি এদিক-ওদিক কয়েকটা তীর ছোঁড়ে।

‘আরো সামনে চলো’– লিলি গাড়িতে চড়ে বসতে বসতে বললো– ‘কোথায় হরিণ আছে, সেখানে চলো। হরিণ তো মারতে পারবো।’

সায়বাল লিলিকে দেড়-দু’মাইল দূরে নিয়ে যায়। এক স্থানে গড়ি থামিয়ে বললো, একটু অপেক্ষা করুন, হরিণ কিংবা খরগোশ পেয়ে যাবেন। বলেই সায়বাল একদিকে চলে যায়। পা বিশেক দূরে একটা গাছ আছে। সায়বাল তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সে প্রিন্সেস লিলির জন্য হরিণ-খরগোশ খুঁজতে শুরু করে। তার পিঠটা লিলির দিকে। লিলি ধনুকে তীর সংযোজন করে। সায়বালের পিঠটাকে নিশানা বানায়। কেউ দেখলে এটাই ভাবতো, সে ঠাট্টা করছে। সে ধনুক টেনে ধরে। তার হাতে ধনুকটা কাঁপছে। একটা চোখ বন্ধ করে সায়বালের পিঠটা নিশানা বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লিলি ধনুকটা আরো টেনে ধরে তীরটা ছুড়ে দেয়। তীর সায়বালের কাঁধ ঘেঁষে গাছটার ডালে গিয়ে গেঁথে যায়। সায়বাল হটাৎ ঘাবড়ে ওঠে মোড় ঘুরিয়ে তাকায়। প্রথমে গাছের ডালে গেঁথে যাওয়া তীরটার প্রতি এবং পরে লিলির দিকে তাকায়। লিলি হাসছে না। তার চেহারায় গাম্ভীর্য। যেমনটি সায়বাল ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। তবু সে হেসে বললো– ‘আপনি বুঝি আমার উপর তীর অনুশীলন করছেন?’ বলেই সে লিলির দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

লিলি ঝটপট তূনীর থেকে আরো একটি তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করে বলে ওঠে– ‘থামো, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। এদিক-ওদিক হবে না।’

সায়বাল দাঁড়িয়ে যায়। লিলি ধনুকটা সামনে নিয়ে টেনে ধরে। সায়বাল চীৎকার করে বলে ওঠে– ‘প্রিন্সেস! আপনি একী করছেন!’

লিলির ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। সায়বালের দৃষ্টি তার উপর

নিবদ্ধ। সে বসে পড়ে। তীরটা শা-শব্দ তুলে তার পার্শ্ব ঘেঁষে অতিক্রম করে যায়। সায়বাল লিলির মর্যাদা ও নিজের অবস্থানের কথা ভুলে যায়। লিলি তূনীর থেকে আরো একটি তীর বের করতে উদ্যত হয়। সায়বাল অতি দ্রুততার সাথে তার দিকে ছুটে যায়। অতো তাড়াতাড়ি তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করার অভিজ্ঞতা লিলির নেই। সায়বাল তার দিকে এগিয়ে এলে সে দৌড়ে আড়ালে চলে যায়। কিন্তু সায়বাল তো পুরুষ এবং তাগড়া যুবক। পৌঁছে গিয়ে সে লিলিকে ধরে ফেলে। লিলির হাত থেকে ধনুকটা কেড়ে নেয়। কাঁধ থেকে তূনীরটাও ছিনিয়ে নেয়।

'আমি সেই দাস শ্রেণীর মানুষ নই, যাদের উপর তাদের মনিবরা সব রকম জুলুম করে থাকে'– সায়বাল বলে এবং ধনুকে একটা তীর সংযোজন করে লিলির প্রতি তাক করে ধরে। বললো– 'আপনি কি আমার উপর তীর অনুশীলন করতে চাচ্ছেন? নাকি এটা আমার আন্তরিক সেবা ও আনুগত্যের প্রতিদান?'

লিলির মুখে কোন উত্তর নেই। মেয়েটির ওষ্ঠাধর কাঁপছে। তার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। সায়বাল ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধীর পায়ে লিলির দিকে এগিয়ে যায়।

'আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি আমার উপর কেনো তীর চালালেন এবং কেনোই বা আপনার চোখে অশ্রু নেমে এলো?' সায়বাল জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো?' লিলি এমন এক কণ্ঠে বললো, যেটি কোন রাজকন্যার কণ্ঠ নয়। এটি একটি ভয়পাওয়া সাধারণ মেয়ের কণ্ঠ।

'আপনার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি'– সায়বাল বললো– 'বলুন আপনার কীরূপ সাহায্যের প্রয়োজন?'

'পুরস্কার দিয়ে লাল করে দেবো'– লিলি বললো– 'পুরস্কার হিসেবে আমাকে দাবি করবে, তো তাও মেনে নেবো। তুমি আমাকে গ্যালিলি ঝিলের ওপারে মুসলমানদের অঞ্চলে গিয়ে চলো। আমাকে দামেশ্‌ক দিয়ে আসো। তারপর এই গাড়ি আর ঘোড়া দুটো তোমার হবে। পুরস্কার আলাদা পাবে।'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনার মাথায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে'– সায়বাল বললো– 'চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

'যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে ফিরে গিয়ে প্রিন্স অর্নাতকে বলবো, এখানে তুমি আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছো।' লিলি সায়বালের কানে কানে বললো।

'ভালোই হলো, কথাটা বলে ফেলেছেন'– সায়বাল বললো– 'এখন না আপনি ফিরে যেতে পারবেন, না আমি ফিরে যাবো। হাত-পা বেঁধে আমি আপনাকে গাড়িতে করে কোন এক নগরীতে নিয়ে কোনো ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে ফেলবো। আচ্ছা, বলুন তো, মুসলমানদের অঞ্চলে যেতে চাচ্ছেন কেনো?'

এবার লিলি টের পেয়েছে, সে জালে আটকা পড়েছে। মেয়েটি বসে পড়ে এবং মাথাটা উভয় হাঁটুর মধ্যখানে গুজিয়ে কোঁকাতে শুরু করে। সায়বাল তার প্রতি তাকিয়ে আছে। লিলি তার অপরিচিত মেয়ে নয়। কিন্তু এখন তাকে গভীর চোখে দেখতে শুরু করেছে, যেনে নতুন কাউকে দেখছে। মেয়েটার মাথার চুল, গায়ের রং, চলন-বলন কোনটিই খৃস্টান মেয়েদের মতো নয়। তার জানা আছে, খৃস্টানদের কাছে অনেক অপহৃতা মুসলিম মেয়েও আছে। এই মেয়েটিও তেমনি অপহৃতা হতে পারে। কিন্তু– কিন্তু একে তো সে আজ তিন-চার বছর যাবত হাসি-খুশিই দেখতে পাচ্ছে। সায়বাল লিলির পাশে বসে পড়ে।

'যদি মুসলমান হয়ে থাকো, তো বলো'– সায়বাল বললো–'সম্ভবত তোমাকে অপহরণ করা হয়েছিলো।'

'আর তুমি প্রিন্স অর্নাতকে বলে দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবে'– লিলি বললো– 'আর তাকে বলে দেবে, আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম।'

লিলি দেখতে পায়, সায়বালের গলায় একটা ফিতা ঝুলছে। সে ফিতাটা ধরে টান দিলে ক্ষুদ্র একটি ক্রুশ বেরিয়ে আসে। লিলি বললো– 'এটা হাতে নিয়ে কসম খাও, আমাকে ধোঁকা দেবে না। অর্নাতকে বলবে না আমি তোমার গায়ে তীর ছুঁড়েছিলাম।'

সায়বাল মেয়েটির আসল পরিচয় জেনে ফেলে। বললো– 'ক্রুশ হাতে খাওয়া কসম মিথ্যা হবে। সে ফিতাটা গলা থেকে খুলে ফেলে এবং ক্রুশটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে– 'মুসলমান ক্রুশ হাতে কসম খায় না।'

লিলি চমকে ওঠে সায়বালের দিকে তাকায়, যেনো লোকটার কথায় তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে দূরে মাটিতে পড়ে থাকা ক্রুশটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কোনো খৃস্টান সে যতোই পাপিষ্ঠ হোক না কেনো,

ক্রুশের অবমাননা করে না। সায়বাল নিশ্চিত হয়ে গেছে, লিলি কোনো মুসলমান পিতার কন্যা।

'আমি তোমার কাছে আমার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছি'– সায়বাল বললো– 'তুমি বলো, তোমাকে কখন এবং কোথা থেকে অপহরণ করা হয়েছিলো?'

'আমি হজ্ব করে পিতা-মাতার সঙ্গে মিসর ফিরে যাচ্ছিলাম'– লিলি ভয় পাওয়া শিশুটির ন্যায় বললো– 'অনেক বড় কাফেলা ছিলো। তখন আমার বয়স ছিলো ষোল-সতের বছর। চার-সাড়ে বছর কেটে গেছে। কার্কের সন্নিকটে এই কাফেররা কাফেলার উপর আক্রমণ চালায় এবং মালপত্র লুটে নেয়। তারা অনেক রক্ত ঝরায়। আমি জানি না, আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন, নাকি জীবিত আছেন। কাফেররা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্যই ছিলো, আমি এতো রূপসী ছিলাম যে, কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত আমাকে পছন্দ করেন এবং নিজের কাছে রেখে দেন।'

'প্রিন্স অর্নাতের সামনে আমি অনেক কান্নাকাটি করি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তিনি বললেন, আমি রাজত্ব ত্যাগ করবো তবু তোমাকে ছাড়বো না। তারপর তিনি আমাকে বিবাহ করেননি এবং নিজের ধর্মও গ্রহণ করে নিতে বলেননি। আমি তার ভোগের উপকরণ হয়ে থাকি। তার নিকট আরো কয়েকটি রূপসী মেয়ে ছিলো। তারা আমার শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু অর্নাত শুধু আমাকেই সঙ্গে রাখেন এবং আমি যা বলি শোনেন। আমি এই অবস্থাটা মেনে নিই। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। নারীর ভাগ্যই এমন যে, যখন যার কব্জায় এসে পড়ে, তখন তার মালিকানা ও গোলাম হয়ে যায়।'

লিলি বলতে বলতে নীরব হয়ে যায়। সায়বালকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললো– 'তুমি কি আমার সমস্ত কথা প্রিন্স অর্নাতকে বলে দেবে? শুনে তিনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'আমি যদি সত্যি সত্যি সায়বাল হতাম, তাহলে তা-ই করতাম, তুমি যার ভয় করছো'– গাড়োয়ান বললো– 'আমি সিরীয় মুসলমান। আমার নাম বকর ইবনে মুহম্মদ।'

'তুমি সেই গোয়েন্দাদের একজন তো নও, যাদের সম্পর্কে অর্নাত বলে থাকেন, আমাদের দেশে মুসলমান গোয়েন্দা লুকিয়ে আছে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে এবং বলে– 'আমার নাম ছিলো কুলসুম।'

'আমি যা কিছু হই না কেনো'– বকর উত্তর দেয়– 'আমি মুসলমান। আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না। এটা কোনো নতুন বিষয় নয় যে, একটি অপহৃতা মুসলিম মেয়ের এমন এক মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, যে কিনা খৃস্টান বেশে খৃস্টানদের কর্মচারি হয়ে কাজ করছে। এরূপ ঘটনা আগেও বহু ঘটেছে। এমনও হয়েছে ভাই গোয়েন্দা হয়ে খৃস্টানদের শহরে ঢুকে পড়েছে তো সেখানে তার সেই বোনের সাক্ষাৎ পেয়ে গেছে, যে বহু বছর আগে অপহৃতা হয়েছিলো। বিস্মিত হয়ো না কুলসুম। তুমি হজ্ব সম্পাদন করে ফিরে যাচ্ছিলে। আল্লাহ্ তোমার হজ্ব কবুল করে নিয়েছেন। আমি আলিম নই যে, তোমাকে বলবো, আল্লাহ্ তোমাকে এই শাস্তিটা কেনো দিলেন? তবে এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমার দ্বারা বড় কোনো মহৎ কাজ করাবার জন্যই এ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। তা তুমি কি শুধুই পালাতে চাও, নাকি পালাবার পেছনেও কোনো উদ্দেশ্য আছে?'

'অনেক বড় উদ্দেশ্য'– কুলসুম বললো– 'তুমি বোধ হয় জানো না, আক্রার পাদ্রী এই খৃস্টান সম্রাটদেরকে এখানে কেনো তলব করেছেন। রাতে অর্নাত যখন তার তাঁবুতে আসে, তখন তিনি নেশায় ঢুলু ঢুলু করছিলেন। তিনি আমাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি অনেক বড় একটা রাজ্যের রাণী হতে যাচ্ছো। সালাহুদ্দীন আইউবী দিন কয়েকের মেহমান মাত্র। তিনি আমাদের জালে এগিয়ে আসছেন। খুব দ্রুত আসছেন। আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের পরিকল্পনা কী? তিনি বিস্তারিত বলে শেষে বললেন, এখানে যে ক'জন খৃস্টান সম্রাট এসেছেন, তারা ক্রুশের গায়ে হাত রেখে ঐক্য এবং পরস্পর অফাদারির শপথ নিয়েছেন।'

'তারা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর কোনো অঞ্চলের উপর আক্রমণ করবেন?' বকর জিজ্ঞেস করে।

'আমার পলাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি সুলতান আইউবীর নিকট সংবাদ পৌঁছাবো, ক্রুসেডারদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কী, তারা কী পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদেরকে কোথায় কোথায় বণ্টন করে ছড়িয়ে রেখেছে। অর্নাত আমাকে বলেছেন, তারা আক্রমণ করতে যাবেন না। বরং সালাহুদ্দীন আইউবীকে আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তিনি নিজ অবস্থান থেকে দূরে সরে যান এবং তার রসদের পথ দীর্ঘ হয়ে যায়। তাদের আরো পরিকল্পনা, আইউবী যদি সহসা আক্রমণ না করেন, তাহলে

তারা তিন দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবে।'

'হঠাৎ তোমার চিন্তাটা আসলো কোনো, সংবাদটা সুলতান আইউবীকে পৌঁছানো দরকার?' বকর ইবনে মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করে এবং বলে– 'কুলসুম! আমি এই ময়দানের মুজাহিদ। আমি যদি বলি, তুমি অর্নাতের কথায় ভুল তথ্য পৌঁছিয়ে সুলতান আইউবীকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছো, তাহলে কী উত্তর দেবে?'

'বলবো, তুমি স্বল্প বুদ্ধির মানুষ'– কুলসুম উত্তর দেয়– 'তুমি যদি সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা হয়ে থাকো, তাহলে তুমি নির্বোধ গোয়েন্দা। তুমি নিজ বাহিনীকে ক্রুসেডারদের হাতে খুন করিয়ে ফেলবে। অর্নাত যদি সুলতান আইউবীকে বিভ্রান্ত করতে চাইতেন, তাহলে কি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন না? যদি কাজটা আমাকে দিয়েই করাতে চাইতেন, তাহলে রাতে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে মুসলমানদের অঞ্চলের নিকটে রেখে আসতে পারতেন না? শোনো বকর! মনোযোগ সহকারে শোনো! আমি তোমার গায়ে প্রথম যে তীরটি ছুঁড়েছিলাম, সে চিন্তাটা বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ করেই আমার মাথায় এসেছিলো। আমি আসলেই শুধু ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলাম। তীর-ধনুক এনেছো তুমি।'

'এখানে এসে আমি মুসলমানদের সীমান্ত এখান থেকে কতো দূর জানবার জন্য তোমাকে সীমান্ত ও দামেশ্‌কের পথের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি যখন বললে অঞ্চলটা এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তখন মনে ভাবনা জাগে, কোনো প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে নিয়েই যাবো কিনা। কিন্তু আবার ভাবি, তুমি তো খৃস্টান, আমাকে সাহায্য করবে কিনা কীভাবে বিশ্বাস করি। পরে এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, বললে হিতে বিপরীত হবে এবং তুমি আমাকে মুসলমানদের গুপ্তচর সাব্যস্ত করে অর্নাতের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করবে আর আমি ফেঁসে যাবো। আমার সামনে কোনো পথ ছিলো না। তুমি খানিক দূরে গাছের সঙ্গে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে আমি গাছের উপর একটা পাখির গায়ে ছোঁড়ার জন্য ধনুকে তীর সংযোজন করি। তখন আমার দৃষ্টি তোমার পিঠের উপর নিবদ্ধ ছিলো।'

'তখনই মাথায় ভাবনা আসে, একটা কাজ করি না কেনো! লোকটা যখন এতো কাছাকাছি পজিশন মতো দাঁড়িয়ে আছে, তো তীরটা তাকেই বিদ্ধ করি না কেনো। একটার বেশি দুটো ছুঁড়তে হবে না। তুমি মরে

যাবে। আমি গাড়িতে চড়ে তোমার দেখানো পথে পালিয়ে যাবো। অন্য কোনো সমস্যার কথা আমি চিন্তাই করিনি। বোধ হয় আমার মধ্যে বিবেক কম আর আবেগ বেশি ছিলো। আর আবেগের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহাই অধিক ছিলো। আমি কম্পিত হাতে তীর চালিয়ে দেই। পরে আমার মাথায় এই বুদ্ধিটুকুও আসলো না যে, বলবো, তীর ভুলবশত বেরিয়ে গেছে। বললে তো তুমি অজুহাতটা মেনে নিতে। কারণ, তোমার জানা আছে, আমি কোনোদিন ধনুক হাতে নেইনি। মোটকথা, তোমাকে হত্যা করে মুসলমানের এলাকায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার মুক্তির আর কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু আমি সফল হইনি।'

'এর আগে, কখনো পালাবার চিন্তা মাথায় এসেছিলো কি?' বকর জিজ্ঞেস করে।

'প্রথম প্রথম অনেক চিন্তা করেছি'– লিলি উত্তর দেয়– 'কিন্তু পরে বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হই যে, পালাতে পারবো না। অর্নাত আমাকে সত্যিকার অর্থেই রাজকন্যা বানিয়ে রেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বলতেন, তোমার প্রতি আমার যতোটুকু ভালোবাসা জন্মে গেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনো মেয়েকে আমি ততোটুকু ভালোবাসিনি। আমি তার সঙ্গে মদও পান করতে থাকি। না করে উপায় ছিলো না। দৈহিকরূপে আমি তার জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। এমন রাজকীয় জীবন তো আমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু একাকি হলেই আমি মুসলমান হয়ে যেতাম এবং আমার মনে হতো, এই মাত্র আমি হজ্ব করে এসেছি। মাঝে-মধ্যে আমি আল্লাহকে গালাগালিও করে ফেলতাম। অনেক সময় মনে হতো, আমি আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছি।'

'এমনি সময়ে সুলতান আইউবী কার্ক অবরোধ করলেন এবং অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীর বিপুল অংশ ধ্বংস করে দিলেন। আমি প্রস্তুত হয়ে যাই, আমাদের বাহিনী শহরে ঢুকে পড়বে আর আমি অর্নাতকে নিজ হাতে হত্যা করে ফেলবো। কিন্তু এক মাস পর সুলতান অবরোধ তুলে নিলেন এবং ফেরত চলে গেলেন। অর্নাত অট্টহাসি হাসতে হাসতে আমার নিকট বললো, আমি লোকটাকে আবারো বোকা ঠাওরে দিলাম। আমি তার সঙ্গে চুক্তি করেছি, আগামীতে হাজীদের কাফেলার প্রতি হাত বাড়াবো না। আমি তার সঙ্গে আর যুদ্ধ না করারও চুক্তি করেছি।'

'আমি খুব ব্যথা পেলাম। সুলতান আইউবীর ফেরত না যাওয়া দরকার

ছিলো। আমাকে মুক্ত না করে তার অবরোধ তুলে নেয়া ঠিক হয়নি।'

'সুলতান আইউবীর সামনে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে'– বকর বললো– 'তাঁকে বরং আমাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে, যা কিনা আমাদের প্রথম কেবলা। আমাদেরকে ফিলিস্তিনীনের মাটি দখলমুক্ত করতে হবে, যেটি আমাদের নবী-রাসূলগণের জন্মভূমি। সুলতান আইউবী যদি এক একটি মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়েন, তাহলে তিনি স্বীয় পবিত্র লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবেন এবং লড়াই করতে করতেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। জাতি আপন পবিত্র লক্ষ্যের খাতিরে আপন সন্তানদের কুরবান করে থাকে।'

'অর্নাতের একটি মন্দ স্বভাব আমাকে ভুলতে দেয়নি যে, আমি মুসলমান'– কুলসুম বললো– 'তিনি আমাদের রাসূলে খোদার শানে গোস্তাখি করে থাকেন। আরো বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবী তার প্রথম কেবলা দখল করার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে আর আমরা তার খানায়ে কাবাকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আমাদের উপাসনালয় গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি।'

ক্রুসেডারদের এই প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনার উল্লেখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন। একবার তারা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছেও গিয়েছিলো। সুলতান আইউবীর কার্ক অবরোধ করে এক মাস পরে তুলে নেয়াও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্নাত যুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন না করার চুক্তি করেছিলেন বলে সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করেছিলেন, তা নয়। সুলতানের তো জানাই ছিলো, খৃস্টানরা চুক্তি করেই ভঙ্গ করার জন্য। অবরোধ তুলে নেয়ার আসল কারণ ছিলো, সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্নাত এই চুক্তির দু'বছর পর আরেকটি হজ্ব কাফেলার উপর আক্রমণ করেছিলেন। চুক্তির মেয়াদ ছিলো ১১৮৮ সাল পর্যন্ত। সুলতান আইউবী ১১৮৭ সালে হিত্তীন অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেন এবং অর্নাতকে নিজ হাতে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দামেশ্‌ক থেকে বের হয়েছিলেন।

কুলসুম বকর ইবনে মুহাম্মদকে নিজের ইতিবৃত্ত শোনাতে থাকে–

'অর্নাতের সঙ্গে আমি হাসি-খুশিও থাকি এবং আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুনও জ্বলতে থাকে। তিনি আমাকে মাঝে-মধ্যে বলতেন, সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দারা বেশ-ভূষা বদল করে আমাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে

এখানকার তথ্য নিয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন, অতিশয় রূপসী খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েরা মুসলমানদের অঞ্চলে মুসলমান নাম-পরিচয় ধারণ করে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে ফাঁদে ফেলে তাদেরকে ক্রুশের স্বার্থে ব্যবহার করছে। অর্নাত আমাকে ঐ মেয়েদের কাহিনী শোনাতেন। শুনে কয়েকবার আমার মাথায় চিন্তা আসে, এই মেয়েরা আপন ধর্মের জন্য নিজেদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে! সম্ভ্রম তো সেই সম্পদ, যার সুরক্ষার জন্য নারীরা জীবনের ঝুঁকি বরণ করে থাকে। অথচ এই মেয়েরা কিনা ধর্মের জন্য সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে। এ কেমন ধর্ম! এরা কেমন নারী!'

'আমার সম্ভ্রম সুরক্ষিত নেই– লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি মনে মনে সংকল্প করি, আমিও আমার ধর্মের জন্য কুরবানী দেবো। কিন্তু তার জন্য সুযোগের তো প্রয়োজন। আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এখন এখানে এসে অর্নাত আমাকে এমন সব মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন যে, সেই সম্পদ নিয়ে আমাকে সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছুতেই হবে। বোধ হয় আল্লাহ এই পুণ্যের জন্যই আমাকে এই জাহান্নামে প্রেরণ করেছিলেন। তুমি কি বলতো পারবে, এই সংবাদে সুলতানের কোনো উপকার হবে কিনা?'

'অনেক'– বকর বললো– 'কিন্তু এ সংবাদ নিয়ে তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি যাবে না। তুমি কিংবা আমরা দু'জনই নিখোঁজ হয়ে গেলে প্রিন্স অর্নাত অমনি ধরে নেবেন, আমরা গোয়েন্দা ছিলাম। ফলে তারা তাদের পরিকল্পনায় রদবদল করে ফেলবে আর আমরা সুলতান আইউবীর নিকট যে সংবাদ পৌঁছাবো, তা তাঁর পরাজয়ের সূত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'তার মানে, এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সুলতানের নিকট পৌঁছুবে না!' কুলসুম বললো।

'পৌঁছুবে এবং অবশ্যই পৌঁছে যাবে'– বকর বললো– 'কিন্তু ব্যবস্থাটা কার্কে গিয়ে করবো।'

'তুমি যাবে?'– কুলসুম জিজ্ঞেস করে– 'আমি তো এখান থেকে পালাতেও চাই।'

'আমি যাবো না'– বকর বললো– 'তুমিও যাবে না। কার্কে আমাদের সহকর্মীরা আছে। তথ্য পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদের। আমার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। এখন এ কাজ তুমিও করবে। তোমার কাজ শেষ হয়নি। সবে শুরু হয়েছে মাত্র। সুলতানের জন্য কী ধরনের তথ্যের প্রয়োজন, আমি তোমাকে বলে দেবো। সেসব তথ্য তুমি আমাকে দেবে আর আমি দামেশ্‌ক পৌঁছাবো।'

'তো এই নরকে আমাকে থাকতেই হচ্ছে, না?' কুলসুম ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ'– বকর উত্তর দেয়– 'তোমাকে এই নরকে আর আমাকে মৃত্যুর মুখে পড়ে থাকতে হবে– এ ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে কুলসুম। সুলতান আমাদেরকে বলে থাকেন, একজন গোয়েন্দা কিংবা একজন কমান্ডো তার গোটা বাহিনীর জয় কিংবা পরাজয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু একজন গুপ্তচর সবসময় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। গুপ্তচর দুশমনের হাতে পড়ে গেলে তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করে ফেলা হয় না, তাকে নির্যাতন করা হয়, কষ্ট দেয়া হয়। আপন ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য কাউকে না কাউকে জীবন্ত চামড়া খসানোর মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়। একটি জাতির নাম-চিহ্ন তখন মুছে যেতে শুরু করে, যখন তাদের মধ্যে কুরবানীর জযবা নিঃশেষ হয়ে যায়। তুমি এখানে চারটি বছর কাটিয়ে দিয়েছো। আর চারটা মাস কাটাও। এখন আর অর্নাতকে মনিব মনে করো না। তার সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি ভালোবাসা দেখাও। মনে মনে বুঝ রাখো, তুমি এমন একটা বিষাক্ত নাগকে কব্জা করে রেখেছো, যে তোমার হাত থেকে ছুটে গেলে ইসলামী দুনিয়াকে দংশন করবে।'

'বলে যাও বকর, বলে যাও'– কুলসুম বললো– 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো, আমি মহান আল্লাহর দরবারে কীভাবে মুখ দেখাতে পারবো।'

বকর বলতে শুরু করে। লিলিকে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে বললো– 'তোমার এবং আমার মাঝে অন্য কোনো সম্পর্ক আছে বিষয়টা কাউকে বুঝতে দেবে না। এখানে আমাদের গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করার জন্য নানা বেশে খৃস্টান গোয়েন্দারাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-ও স্মরণ রাখবে, এখানে আমরা দু'জনই গোয়েন্দা নই। আমাদের আরো অনেক সহকর্মী আছে। খৃস্টান সম্রাট ও সেনাপতিগণ যে নগরীতে অবস্থান করছেন, তারা সেখানে দায়িত্ব পালন করছে। তাদের একজন অপরজন থেকে অধিক সাহসী ও বুদ্ধিমান। অন্তরে প্রবঞ্চনা রাখবে না যে, আমরা দু'জনে মিলে বিরাট কাজ করে ফেলেছি। ভাবো না আমরা আল্লাহর বিরাট উপকার করে ফেলেছি। এসব আমাদের কর্তব্য, যা আমাদেরকে পালন করতে হবে। তার জন্য যতো কষ্টই করতে হয়, আমরা বরণ করে নেবো।'

ফিরে এসে কুলসুম যখন তাঁবু এলাকায় নিজ তাঁবুর সামনে গাড়ি থেকে অবতরণ করে, তখন সে প্রিন্সেস লিলি আর বকর ইবনে মুহাম্মদ সায়বাল। কুলসুম যখন গাড়ি থেকে অবতরণ করছিলো, তখন সায়বাল

গাড়ির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গোলামের ন্যায় মাথানত করে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি যখন তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করে, তখন প্রিন্স অর্নাত একটি মানচিত্রের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। ঢুকেই কুলসুম বলে ওঠে– 'ভ্রমণে গিয়েছিলাম, শিকারও খেলেছি।'

'কী মেরেছো?' অর্নাত মানচিত্র থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জিজ্ঞেস করেন।

'কিছুই না'– কুলসুম উত্তর দেয়– 'সব ক'টা তীরই ব্যর্থ গেছে। তবে সত্বর শিকার মারার যোগ্যতা এসে যাবে।' বলে সেও মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে– 'অগ্রযাত্রার চিত্র, নাকি প্রতিরক্ষার?'

'অগ্রযাত্রা সালাহুদ্দীন আইউবী করবেন'– অর্নাত অন্যমনস্কের ন্যায় বললেন– 'আর প্রতিরক্ষাও তাকেই করতে হবে। আমরা তাকে জালে টেনে আনছি। তার নিঃশ্বাস নাকের ডগায় এনেই তবে আমরা অগ্রযাত্রা করবো। তখন আমাদেরকে ঠেকাবার মতো কেউ থাকবে না। তুমি নিজ তাঁবুতে চলে যাও লিলি। আমাকে বহু কিছু ভাবতে হবে। আজ রাত আমাদের কনফারেন্স বসবে। তাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে। আমাকে সম্পূর্ণ ঠিক ঠিক পরামর্শ দিতে হবে। আমি এই অভিযানের হিরো হতে চাই।'

'তার নাম কুলসুম। বকর ইবনে মুহম্মদ তার সহকর্মী।' সুলতান আইউবীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপ-প্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতানকে কার্কের গুপ্তচরদের প্রেরিত রিপোর্ট শোনান।

সুলতানের চোখ লাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন– 'কে বলতে পারবে, আমাদের কতো কন্যা ঐ কাফেরদের কব্জায় আটক আছে এবং তাদের বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হয়ে আছে। অর্নাতকে আমি ক্ষমা করবো না। মনে রাখবে হাসান! এই মেয়েটাকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তবে এখনই নয়।'

'কার্কে আমাদের যে লোক আছে, তারাই উপযুক্ত সময়ে তাকে উদ্ধার করে আনবে।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন।

আক্রার পাদ্রী এবং খৃস্টান সম্রাটগণ তিন দিন নাসেরায় অবস্থান করেন। তারা যুদ্ধের পরিকল্পনা নকশা প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কুলসুম অর্নাত থেকে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে বকরকে অবহিত করেছে। ক্রুসেডাররাও সুলতান আইউবীর কিছু কিছু তথ্য জেনে ফেলেছে। মসুল, হাল্‌ব ও দামেশ্‌ক,

কায়রো সব অঞ্চলে তাদের গোয়েন্দা আছে। তারা ক্রুসেডারদেরকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করছে। ক্রুসেডাররা এ-ও জেনে গেছে যে, মিসর থেকেও ফৌজ আসছে। সুলতান আইউবী খুব তাড়াতাড়ি অগ্রযাত্রা করবেন, তা-ও তারা জেনে ফেলেছে। ফলে তারা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ে পরে আইউবীকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা ঠিক করেছে। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। তবে তারা এখনো জানতে পারেনি, সুলতান আইউবী কোন্ দিক থেকে আসবেন এবং যুদ্ধের অঙ্গন কোন্‌টা হবে। তারা অনুমানের ভিত্তিতে আইউবীর সেনাসংখ্যা, কতোজন আরোহী, কতোজন পদাতিক হতে পারে, ঠিক করে নিয়েছে।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ কার্ক থেকে আগত তাঁর লোকদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন। তারাই তাকে কুলসুম ও বকর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। হাসান সেই রিপোর্ট সুলতানকে অবহিত করেছেন।

'এ সংবাদ সেই সকল সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করেছে, যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলের গোয়েন্দারা আমাদের প্রেরণ করেছে'– সুলতান আইউবীর বললেন– 'এ তো আমি আগেই বলেছি, ক্রুসেডাররা আমাদের অপেক্ষা করছে। এবার কার্কের রিপোর্ট তার সত্যায়ন করলো। এই রিপোর্টে নতুন তথ্যটি হচ্ছে ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির পরিমাণ। তাদের সঙ্গে দু'হাজার নাইট থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে বিরাট শক্তি। নাইট মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত এবং সুরক্ষিত থাকে। তাদের ঘোড়া সাধারণ জঙ্গী ঘোড়ার তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও কর্মচঞ্চল হয়ে থাকে। রৌদ্রতাপের ব্যারোমিটার যখন উচ্চাঙ্গে থাকবে, আমি তাদেরকে তখন যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো।'

'আর সেই বর্ম পরিহিত নাইটদের সঙ্গে আট হাজার অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশি জানানো হয়েছে।'

'আমার জন্য একটি নতুন সুসংবাদ হচ্ছে, আর্মেনিয়ার সম্রাটের বাহিনীও ক্রুসেডারদের সঙ্গে আসছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এরা ক্রুসেডারদের ত্রিশ-বত্রিশ হাজার সৈনিকের অতিরিক্ত। এদেরসহ দুশমনের সেনাসংখ্যা চল্লিশ হাজার হয়ে যাবে। কার্কের রিপোর্ট এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, ক্রুসেডাররা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়বে এবং আমাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। সে মোতাবেক আমার

এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমি হিত্তীনের উপকণ্ঠে লড়াই করবো। আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

'বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেসব পালনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় এসে গেছে'– সুলতান আইউবী দামেশ্কে নিজ কক্ষে সালার ও নায়েব সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'আমাদেরকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করার এবং ক্ষমতার জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তারপরও আমরা আপসে অনেক ঘুনাখুনি করেছি। সেই সুযোগে দুশমন ফিলিস্তীনের মাটিতে জেঁকে বসেছে। জাতি আমাদের হাতে তরবারী তুলে দিয়েছিলো এবং এই ভরসায় সঙ্গ দিয়েছিলো যে, আমরা ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করবো এবং আরবের পবিত্র ভূখণ্ডকে কাফেরদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করবো।'

'আপনারা কয়েক বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু আসল যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। মস্তিষ্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য তাজা করে নিন। সিদ্ধান্ত নিন, আমাদেরকে একটি স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জীবিত থাকতে হবে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান ধর্মকে কুফরের অশুভ ছায়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তারিক ইবনে যিয়াদ সালতানাতে ইসলামিয়াকে যে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদেরকেও ইসলামী সাম্রাজ্যকে সে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তাদের পরে আগত বংশধরদের কর্তব্য ছিলো, আল্লাহ্র পয়গামকে সেখান থেকেও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার পরিবর্তে আমাদের ধর্মের শত্রুরা আমাদের ঘরে এসে জেঁকে বসেছে এবং তারা খানায়ে কাবা ও রওজায়ে মুবারককে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। কেনো, এমনটা কীভাবে সম্ভব হলো? যেখানে মস্তিষ্কে রাজত্বের উন্মাদনা চেপে বসে, সেখানে সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং আমীর-শাসকরা ক্ষমতার খাতিরে আপন ধর্ম ও আত্মমর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেন।'

'আমাদের পতনের কারণ ক্ষমতার গদির নেশা এবং সম্পদের মোহ। তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এখন পৃথিবী আমাদের উপর রাজত্ব করছে। আমরা আখেরাতকে ভুলে বসেছি। আমরা শত্রু-বন্ধুর পরিচয় জানি না। আমাদের সামরিক চেতনার উপর ধ্বংসশীল জগতের স্বপ্নের যাদু প্রভাব বিস্তার করে বসেছে। মনে রাখুন আমার বন্ধুগণ! আমি

আপনাদেরকে বহুবার বলেছি, জাতির ভাগ্য তরবারীর আগা দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সেনাপতি যখন সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরিধান করে, তখন তাঁর হাতে কোষ থেকে তরবারীটা বের করার শক্তি তাঁকে না। তাদের হৃদয়ে আপন বোধ-বিশ্বাস ও স্বজাতির মর্যাদা সুরক্ষার চেতনা থাকে না। শেষে ধর্মটা প্রতারণার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আর কোনো কাজের থাকে না।'

'আজ আমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে শুধু এ জন্য আপন ঘর-পরিজন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে এবং দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছি যে, আমরা ক্ষমতার পূজারীদের খতম করে দিয়েছি। আমরা আস্তিনের সাপগুলোর মস্তক পিষে ফেলেছি। তারপরও আমরা যদি হেরে যাই, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের নিয়ত ঠিক ছিলো না।'

সুলতান আইউবী এরূপ আবেগময় এবং দীর্ঘ ভাষণদানে অভ্যস্ত নন। কিন্তু যে লক্ষ্যে তিনি বের হচ্ছেন, তার জন্য সকলকে মানসিক ও আত্মিকরূপে প্রস্তুত করা জরুরি। এরা তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত সালার-নায়েব সালার। তাদের মধ্যে মুজাফফর উদ্দীনের ন্যায় সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালারও উপস্থিত আছেন, যিনি এক সময় সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন। তকিউদ্দীন, আফজালুদ্দীন, ফররুখ শাহ এবং আল-মালিকুল আদিলের ন্যায় সালারগণও তার সঙ্গে আছেন, যারা তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। সালার কাকবুরী তাঁর ডান হাত। সামরিক যোগ্যতা এবং চেতনার দিক থেকে তারা একজনও কম নন। কিন্তু সুলতান আইউবী এই প্রথমবার ফিলিস্তীনের মাটিতে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং তার গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস।

অভিযানটা সহজ নয়। ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তি যেমন পরিমাণে বেশি, তেমনি মানে উন্নত। তাদের জন্য সুবিধাটা হচ্ছে, তারা প্রতিরক্ষার জন্য নিজ ভূমিতে লড়াই করবে, যেখানে তাদের রসদের কোনো সমস্যা নেই এবং তারা নিজ অবস্থানের নিকটে। সুলতান আইউবী নিজ অবস্থান থেকে বহু দূরে অভিযানে যাচ্ছেন, যেখানে পর্যন্ত তার রসদ পৌঁছার পথ ঝুঁকিপূর্ণ এবং দূরে। যুদ্ধবিদ্যার হিসাব মোতাবেক আক্রমণকারী পক্ষই বেশি সমস্যা-অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সে কারণে আক্রমণকারী পক্ষের সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনগুণ না হোক দ্বিগুণ তো বেশি

হতেই হয়। কিন্তু সুলতান আইউবী আক্রমণকারী হওয়া সত্ত্বেও তার সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় কম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করবে এবং ঘরে ফিরে আসা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সালারদেরকে তারিক ইবনে যিয়াদের সেই অভিযানের কথা স্মরণ রাখতে বলে দিলেন, যাতে তিনি রোম উপসাগর অতিক্রম করে নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে যায়।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান আইউবীর উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিলো' শিরোনামে লিখেছেন–

'সুলতানের বিশ্বাস ছিলো, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেছেন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর প্রথম কর্তব্য। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। অধিক থেকে অধিকতর রাজ্যকে আল্লাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর অনুগত বানানো তাঁর প্রধান ব্রত। তিনি যেখানে তাঁর যতো বাহিনী ছিলো, সকলকে এশতরা নামক স্থানে সমবেত হওয়ার আদেশ জারি করেন। আদেশনামায় আল্লাহ পাকের নির্দেশের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতের ঘন আঁধারের উপর উঁকি মারছে। তিনি হিত্তীনের অঞ্চলকে যুদ্ধের অঙ্গন বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হিত্তীন ফিলিস্তীনের একটি অখ্যাত গাঁ। কিন্তু সুলতান আইউবী গ্রামটাকে এতোই মর্যাদা দান করেন যে, খৃস্টজগতের সমর বিশ্লেষকগণ আজো পর্যালোচনা করে চলেছেন, ক্রুসেড যুদ্ধের এই হিরো কীরূপ কৌশল-স্ট্রাটেজি প্রয়োগ করে এমন শক্তিমান ও উন্নত অস্ত্রসজ্জিত শত্রুপক্ষকে এমন লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখে নিপতিত করলেন, খৃস্টানদের একজন ব্যতীত বাকি সব ক'জন সম্রাট যুদ্ধবন্দি হয়ে গেলেন!

যুদ্ধবিদ্যার খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী বোঝেন এমন সব সামরিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর অন্যান্য গুণাবলী ছাড়াও তাঁর ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও কমান্ডো অপারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বকর ইবনে মুহাম্মদের ন্যায় গোয়েন্দাদের আপন জীবনকে মৃত্যুর মুখে রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব তথ্য সুলতানের নিকট পৌঁছানো সে আরেক বাস্তবতা। কুলসুমের ন্যায়

নির্যাতিতা মেয়েরা রাজকীয় বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে নিজ নিজ উদ্যোগে ইসলামী বাহিনীর সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিহাস এই অখ্যাত গাজী ও শহীদদের নাম জানাতে অপারগ, যারা পর্দার আড়ালে এবং মাটির নীচে যুদ্ধ করে হিত্তীনকে ইসলামের মর্যাদার সুমহান প্রতীকে পরিণত করেছিলো।

সুলতান আইউবী সবসময় যুদ্ধের জন্য জুমার দিন রওনা হতেন। কারণ, এটি পুণ্যময় ও বরকতময় দিন। এই মুবারক দিনে প্রত্যেক মুসলমান মহান আল্লাহর সমীপে সেজদাবনত হয়ে থাকে। আর সৈনিক যখন আপন জাতিকে ইবাদতে নিমগ্ন রেখে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সমগ্র জাতির দু'আ তাদের সঙ্গ নেয়। হিত্তীন অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যও সুলতান এই জুমার দিনটিকে নির্বাচন করেন। ১১৮৭ সালের ১৫ মার্চ। সুলতান আইউবী ফৌজের মাত্র একটি অংশকে সঙ্গে নিয়ে কার্কের সন্নিকটে এক স্থানে গিয়ে ছাউনি ফেলেন।

খৃস্টান গুপ্তচররা তৎক্ষণাৎ তাদের জোট বাহিনীকে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়, সুলতান আইউবী কার্কের সন্নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তা থেকে বুঝে নেয়া হয়, সুলতান কার্ক অবরোধ করবেন। কিন্তু আসলে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসর ও সিরিয়ার হজ্ব কাফেলা। হাজীরা হজ্ব সম্পাদন করে ফিরে আসছে। তাদের উপর কার্কের অদূরেই আক্রমণ হয়ে থাকে। কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত এ কাজে বেশ পারঙ্গম। কাফেলাগুলোকে নিরাপদে এলাকাটা পার করিয়ে দেয়ার জন্যই সুলতান আইউবী এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি ক্রুসেডারদের ধোঁকা দিতে চান, যেনো তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। তিনি তাঁর সালারদেরকে সকল পরিকল্পনা অবহিত করে রেখেছেন।

কার্কের রাজপ্রাসাদে যেনো কম্পন শুরু হয়েছে। প্রিন্স অর্নাতকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলা হলো, বিশাল এক বাহিনী নগরীর অনতিদূরে ছাউনি ফেলছে। অর্নাত ধড়মড় করে উঠে বসেন। সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কে হতে পারে! কুলসুমও অর্নাতের শয্যায় শায়িত ছিলো। কথার শব্দে জাগ্রত হয়ে সেও অর্নাতের সঙ্গে দৌড়ে নগরীর প্রধান ফটকের উপর দিককার প্রাচীরের উপর উঠে যায়। ওখানে হাজার হাজার

প্রদীপ জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অর্নাত তার বাহিনীকে অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। ফটকের উপর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা হয়। অর্নাত ছুটে বেড়াচ্ছেন। কুলসুমের কোনো খেয়াল নেই তার। কুলসুম ফিরে গিয়ে দেখতে পায়, অর্নাতের রক্ষী বাহিনী জাগ্রত হয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এক স্থানে সেই ঘোটকযানটি দণ্ডায়মান, যেটিতে করে কুলসুম নাসেরা গিয়েছিলো এবং ভ্রমণে বের হয়েছিলো। তার পার্শ্বে বকর ইবনে মুহম্মদ প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার প্রতিজন মানুষ যার যার ডিউটিতে চলে গেছে।

কুলসুম আদেশের সুরে বকরকে বললো– 'সায়বাল! গাড়িটা এদিকে নিয়ে আসো।'

বকর গাড়ি নিয়ে এলে কুলসুম তাতে চড়ে বসে এবং তাকে একদিকে নিয়ে যায়। অর্নাতের হেরমের নারীরাও জাগ্রত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারা তাদের ভাষায় প্রিন্সেস লিলিকে গাড়োয়ানকে আদেশ দিতে এবং গাড়িতে চেপে বসে যেতে দেখেছে। একজন দাঁত কড়মড় করে বললো– 'এই হতভাগী মুসলমানের বাচ্চাটা নিজেকে রাণী ভাবতে শুরু করেছে! ওকে নিশানা বানাতেই হবে।'

'সময় এসে গেছে'– আরেকজন বললো– 'সালাহুদ্দীন আইউবীর অবরোধ খুব ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। তিনি আগুন নিক্ষেপ করবেন, মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়বেন। ভেতরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবেন। এরূপ অস্থিতিশীল মুহূর্তের কোনো এক সুযোগে আমরা ডাইনিটাকে ঠিকানা লাগিয়ে দেবো।'

'তোমার প্রেমিক প্রবর সেনাপতিটাও তো কিছু করতে পারলো না।' তৃতীয়জন বললো।

'কিছু করবার লোক আরো বহু আছে'– সে উত্তর দেয়– 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের অবস্থা দেখো। তারপরে প্রিন্স অর্নাত অন্য কোনো প্রিন্সেসকে খুঁজে বেড়াতে বাধ্য হবেন।'

কুলসুম গাড়িটা এক অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখে। বকর গাড়ির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। কুলসুম তাকে জিজ্ঞেস করে– 'আমাদের লোকেরা কি ভেতর থেকে ফটক খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না?'

'চেষ্টা করা হবে'– বকর বললো– 'এই ফৌজ যদি আমাদের হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিস্ময় লাগছে, আমাদেরকে আগে অবহিত করা হলো না কেনো! সুলতান আইউবী তো এমন ভুল করেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছে। সকালে জানতে পারবো, এ কার ফৌজ।'

'আমরা কি এখান থেকে পালাতে পারবো?' কুলসুম জিজ্ঞেস করে।

'পরিস্থিতি বলবে।' বকর উত্তর দেয়।

'এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আমি অর্নাতকে হত্যা করতে পারি।' কুলসুম বললো।

'এমন যেনো না করো'– বকর ইবনে মুহম্মদ বললো– 'ফৌজ নগরীতে ঢুকে পড়লে আমরা চোখ রাখবো, যেনো তিনি পালাতে না পারেন। নতুন কোনো খবর?'

'অর্নাত নজর রাখছিলেন, সুলতান আইউবী কোন্ দিকে অগ্রযাত্রা করেন'– কুলসুম বললো– 'এখন পরিস্থিতি অন্য কিছু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বলতেন, আইউবী ফৌজ নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দিকে যাচ্ছেন।'

'বেশিক্ষণ থাকা যাবে না'– বকর বললো– 'চলো, ফিরে যাই।'

❖ ❖ ❖

পরদিন ভোর বেলা। কার্কের পাঁচিলের উপর দূরপাল্লার ধনুক হাতে তীরন্দাজগণ দণ্ডায়মান। পাথর ও অগ্নিগোলার পাতিল নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে। ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্স অর্নাত পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবীর বাহিনীর প্রতি তাকিয়ে আছেন। এতোক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীরই বাহিনী। তবে সুলতান নিজে সঙ্গে আছেন কিনা জানা যায়নি। কিন্তু বাহিনীর মধ্যে অবরোধ জাতীয় কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁবু স্থাপন করা আছে। সৈনিকরা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্মে রত।

এ দিনটি কেটে গেছে। তারপর অতিবাহিত হয়ে গেছে আরো ছয় দিন। অর্নাতের অপেক্ষার পালা যতো দীর্ঘ হচ্ছে, অস্থিরতা ততো বাড়ছে। তিনি যে বিষয়টি জানতে পারেননি, তা হচ্ছে, রাতে সুলতান আইউবী তার অশ্বারোহী কমান্ডো বাহিনীটিকে সে পথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে পথে হাজীদের কাফেলার আসবার কথা। দিন কয়েক পর প্রথম কাফেলাটি আসতে দেখা গেলো। এটি মিসরের কাফেলা। সুলতান আইউবীর অশ্বারোহী বাহিনীটি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাফেলা

সুলতানের তাঁবু অঞ্চলের সন্নিকটে পৌঁছুলে তিনি ছুটে এগিয়ে গিয়ে হাজীদের সঙ্গে মুসাফাহা করেন। পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সকলের হাতে চুমো খান এবং বিশ্রাম ও আহারের জন্য তাঁবুতে নিমন্ত্রণ জানান। আইউবীর কমান্ডোরা বহুদূর পর্যন্ত কাফেলার সঙ্গে গমন করে। একদিন পরই সিরীয় হাজীদের কাফেলাও এসে পড়ে। সুলতান তাদেরও স্বাগত জানান, আপ্যায়ন করেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদায় জানান।

এ সময়ে কার্কের অভ্যন্তরে খৃস্টান বাহিনী প্রস্তুত অবস্থায় অবস্থান করে। জনমনে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ব্যস্ত থাকে। এক সকালে অর্নাত সংবাদ পান, সুলতান আইউবীর ফৌজ চলে যাচ্ছে। অর্নাত শুধু এটুকু দেখলেন যে, হাজীদের দু'টি কাফেলা সুলতান আইউবীর বাহিনীর হেফাজতে অতিক্রম করে গেছে। শুধু সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারাই জানে, আসল কাহিনী কী ছিলো। সুলতান রওনা দেয়ার আগে গোয়েন্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা অন্যত্র যাচ্ছি। গোয়েন্দারা সুলতানকে অর্নাতের গতিবিধির খোঁজ-খবর জ্ঞাত করতে থাকে।

১১৮৭ সালের ২৭ মে। সুলতান আইউবী এশতরা নামক স্থানে ছাউনি স্থাপন করেন। সেখানে মিসর ও সিরিয়ার ফৌজ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মালিকুল আফজাল– যার বয়স ষোল বছর– প্রখ্যাত সেনাপতি মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। এভাবে তাঁর সমস্ত বাহিনী একত্রিত হয়ে যায়। তিনি সকল সালার ও নায়েব সালারদের সর্বশেষ দিক-নির্দেশনার জন্য একত্রিত করেন। সুলতান বললেন–

'আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। অন্তর থেকে আপন-পরিজন ও বাড়ি-ঘরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন। হৃদয়ে প্রথম কেবলার ভাবনা ঠাঁই করে নিন এবং যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমানের প্রথম কেবলাকে ক্রুসেডারদের অপবিত্র দখল থেকে মুক্ত করার এবং কাফেরদের হাতে সম্ভ্রম হারানো বোন-কন্যাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেয়ার তাওফীক দান করেছেন, তাকে স্মরণ রাখুন।'

'আজ আমরা বাস্তব কথা বলবো। আমাদের সংখ্যা শত্রুর মোকাবেলায় কম। আমাদের মোকাবেলা সাতজন খৃস্টান সম্রাটের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে থাকবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মাবৃত দু'হাজার দু'শত নাইট। বাদ বাকি সৈন্যরাও আধা-বর্মাচ্ছাদিত। তদুপরি এই বাহিনীর জন্য সুবিধাটা হচ্ছে,

তাদের ঠিকানা নিকটে এবং এই সমগ্র অঞ্চল নিজেদের, যেখানে তাদের রসদের সমস্যায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের দু'টি যুদ্ধ লড়তে হবে। সরাসরি শত্রুর মোকাবেলায় এবং আমাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার মোকাবেলায়। এই সংকট-সমস্যা আমাদেরকে শত্রুর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

নকশাটা সামনে মেলে ধরে সুলতান আইউবী যুদ্ধক্ষেত্র কোন্‌টা হবে তরবারীর আগা দ্বারা সকলকে দেখিয়ে দেন। যেসব সালার অঞ্চলটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তারা চমকে ওঠে সুলতান আইউবীর দিকে তাকান। তাদের চোখে বিস্ময়। সুলতান তাদের বিস্ময়ভাব বুঝে ফেলে মুচকি হাসলেন।

'এটা হিত্তীনের উপকণ্ঠীয় ময়দান'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনারা ভাবছেন, এ অঞ্চল তো শুকিয়ে যাওয়া গাছের বাকলের ন্যায় শুষ্ক, উঁচু-নিচু এবং ঋতুর নির্মমতায় চৌচির। আরো ভাবছেন, এই এলাকার মাটি এতোই পিপাসু যে, মানুষ-ঘোড়া যাকেই পাবে, রক্ত চুষে খাবে। আপনারা দেখেছেন, তার এখানে-সেখানে উঁচু-নিচু পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, জায়গাটা ঠিকই ঘাস-পাতা, তরুণতাহীনই এবং পিপাসাকাতরও। রোদের সময় লোহার ন্যায় উত্তপ্ত থাকে। আপনাদের জিজ্ঞাসু চোখে যে প্রশ্নটি উঁকি-ঝুঁকি মারছে, আমি তা বুঝি। আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, সে কোন্ বাহিনী, যারা নরকময় এই অঞ্চলে যুদ্ধ করতে পারবে? হ্যাঁ, সে আমাদের বাহিনী। আপনাদের হাল্কা-পাতলা আরোহী সৈন্যরা এই অঞ্চলে প্রজাপতির ন্যায় উড়ে বেড়াবে আর লোহার ভারি পোশাকে আবৃত নাইট আর অধ-বর্মপরিহিত খৃস্টান সৈন্যদের নাচাতে থাকবে। দুশমনের এই আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা লোহার উত্তাপে অল্প সময়ে পিপাসায় বেহাল হয়ে যাবে এবং লোহার ভার তাদেরকে অতোটুকু ছুটে বেড়াতে দেবে না, যতোটুকু ছুটে বেড়াবে আমাদের সৈন্যরা।'

'আপনারা জানেন, আমি প্রতিটি অভিযান পবিত্র জুমা দিবসে শুরু করে থাকি। আমি সেই সময়ে রওনা হবো, যখন মসজিদগুলোতে মুসলমানরা খুতবা শ্রবণ করবে। এটা দু'আ কবুল হওয়ার সময়। আমি প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় নির্দেশনা প্রেরণ করেছি, জুমার দিবসের দু'আয় যেনো মুসল্লিরা সেই মুজাহিদদের কথা স্মরণ রাখে, যারা জুমার নামায থেকে বঞ্চিত হয়ে

যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং জুমা না পড়তে পারার কাফফারা রক্তের নজরানা দ্বারা আদায় করে। আর এ সময়টা ঠিক সেই সময়, যখন সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে এবং লোহাকে কামানের চুল্লির ন্যায় উত্তপ্ত করে তুলবে।'

'আর এই দেখুন, এটা গ্যালিলির ঝিল আর এটা হচ্ছে নদী'– তরবারীটাকে লাঠির ন্যায় নকশার উপর মেরে মেরে সুলতান আইউবী বললেন– 'আর এটা হলো অত্র অঞ্চলের একমাত্র পুকুর, যাতে পানি আছে। বাদ বাকি সব পুকুর-কূপ শুকিয়ে গেছে। এই সেই মাস, যাকে ক্রুশের পূজারীরা জুন বলে থাকে। আমাদেরকে পানি আর দুশমনের মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমি মুখের ভাষায় দুশমনকে পানি থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। বাস্তবে তাদেরকে পিপাসায় মারা আপনাদের কাজ। দুশমন হিত্তীনের এই অঞ্চলে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তাদেরকে এখানেই যুদ্ধ করাবো। আমি ফৌজকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মুজাফফর উদ্দীন এবং আমার পুত্র আল-আফজাল আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। তারা বাহিনীর একটি অংশকে নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দক্ষিণ দিয়ে জর্ডান নদী পার হয়ে গেছে। এই বাহিনীটি তুর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বোধ হয় পৌঁছে গেছেও। এটা একটা ধোঁকা, যা আমি দুশমনকে প্রদান করছি।'

সুলতান আইউবী ফৌজের অবশিষ্ট তিন অংশের বিস্তারিত এবং তাদের মিশন বর্ণনা করেন। তার একটি অংশ সুলতান নিজের সঙ্গে রাখেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বাহিনীকে রিজার্ভ এবং টাস্কফোর্স হিসেবে ব্যবহার করার কথা ছিলো। শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত অপারেশনে অংশ নেয়া এদের দায়িত্ব ছিলো। সবগুলো অংশকে বিভিন্ন স্থান দিয়ে নদী পার করিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রুসেডাররা তাদের গুপ্তচর ও সোর্সদের মাধ্যমে এই গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিলো। কিন্তু বুঝে ওঠতে পারছিলো না, আইউবীর পরিকল্পনাটা কী। সুলতান আইউবী নিজে গ্যালিলি ঝিলের পশ্চিম তীর হয়ে তাবরিয়া নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে ছাউনি ফেলেন।

❖ ❖ ❖

ক্রুসেডাররা আরো একটি প্রতারণার শিকার হয়। সুলতান আইউবী সাধারণত কমান্ডো ধরনের যুদ্ধ লড়তেন, গেরিলা আক্রমণ চালাতেন। স্বল্প থেকে স্বল্পতর সংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর 'আঘাত

করো, পালিয়ে যাও' নীতি অনুযায়ী হামলা করতেন এবং দুশমনকে ছড়িয়ে দিতেন। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবীর এ ধারার যুদ্ধেরই মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতো। তাঁর বাহিনীর যে অংশটি মুজাফফর উদ্দীন ও আল-আফজালের কমান্ডে নদী পার হয়ে গিয়েছিলো, সেটি ক্রুসেডারদের সেনা চৌকিগুলোর উপর গেরিলা হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। এতে ক্রুসেডাররা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, সুলতান আইউবী তার বিশেষ ধারায়ই যুদ্ধ করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পরিকল্পনা ভিন্ন। কমান্ডো সেনাদের তিনি যথারীতি সেই মিশনই বুঝিয়ে দেন, যা প্রতিটি যুদ্ধে দিয়ে থাকেন।

খৃস্টান ফৌজ দুর্গের ভেতরেও আছে, বাইরেও আছে। সুলতান আইউবী দ্রুতগতিতে তাঁর বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে ফেলেন যে, গ্যালিলি ঝিলের এবং উক্ত অঞ্চলের একমাত্র পানির পুকুরটি তাঁর দখলে এসে যায়। খৃস্টান বাহিনীর একটি অংশ সাইফুরিয়া নামক স্থানে সমবেত হয়। কিন্তু সুলতান আইউবী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তাবরিয়ায় বসে থাকেন। তিনি দুশমনকে হিত্তীনের নিকটে নিয়ে আসতে চাইছেন। যখন দেখলেন, ক্রুসেডাররা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তিনি পদাতিক বাহিনীকে খানিক সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে তাবরিয়ার উপর আক্রমণ করে বসেন এবং আদেশ জারি করেন, তাবরিয়াকে ধ্বংস করে নগরীতে আগুন লাগিয়ে দাও। তাঁর আদেশ পালিত হয়।

তাবরিয়ার দুর্গ নগরী থেকে সামান্য দূরে। ফৌজ দুর্গে ছিলো। নগরীকে রক্ষা করার জন্য ফৌজ দুর্গ থেকে বেরিয়ে নগরীর উদ্দেশে রওনা হয়। সুলতান আইউবী তাদের পথরোধ করে ফেলেন। তিনি বাহিনীর অপর অংশকে বিভিন্ন দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রুসেডারদের যে বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার কমান্ডার হলেন সম্রাট রেমন্ড। তাবরিয়ার পাথুরে অঞ্চলে তার ও সুলতান আইউবীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ সেই যুদ্ধের চোখে দেখা চিত্র এভাবে অংকন করেছেন–

'উভয় বাহিনীর আরোহী সেনারা প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে সম্মুখের অংশটি তীর চালাতে চালাতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়। পরে পদাতিক বাহিনীকেও মাঠে নামানো হয়। ক্রুসেডাররা চোখে মৃত্যু দেখতে শুরু করে। মুসলমানদের পেছনে নদী এবং সামনে শত্রু। পেছনে সরে যাওয়ার জন্য তাদের কোনো জায়গা নেই। সে কারণে উভয়

বাহিনী এমন উম্মাদের ন্যায় লড়াই করে, যার বিবরণ বলে বুঝানো সম্ভব নয়।'

সারাটা দিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। রাতে মুসলমান কমান্ডোরা দুশমনকে অস্থির করে রাখে। দুশমনের ফৌজ ও ঘোড়া পিপাসার্ত। পানি মুসলমানদের দখলে। গেরিলারা দুশমনকে পানির সন্ধানে যেতে দিচ্ছে না। পরদিন ক্রুসেডাররা টিলায় চড়ে যুদ্ধ করে। মুসলমানরা এগিয়ে এসে এসে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু উপরে থাকায় ক্রুসেডাররা আজ বেশি সুবিধা ভোগ করছে। মুসলমানরা টিলা ঘেরাও করে উপরে উঠতে শুরু করে। পদাতিক তীরন্দাজরা উপর থেকে তাদের উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এমন সময়ে ক্রুসেডাররা দেখে, তাদের কমান্ডারের ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে না। তখনই জানা গেলো, কমান্ডার রেমন্ড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছেন। অথচ, তিনি বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে জোটের শরীকদের অনুগত থাকার এবং রনাঙ্গনে পিঠ না দেখানোর শপথ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিত্তীনের এই যুদ্ধে বড় ক্রুশটা নিয়ে আসা হয়েছিলো।

ক্রুসেডারদের পলায়নের পথ বন্ধ। এখন তারা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। উঁচু স্থানগুলো তাদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ঐদিনটিও কেটে গেছে। মুসলিম সৈন্যরা বিপুল পরিমাণ শুষ্ক ঘাস ও কাঠ সংগ্রহ করে ক্রুসেডারদের চারপার্শ্বে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাতে আইউবীর সৈন্য ঘাস-লাকড়ি সংগ্রহ করে আগুনের তেজ বৃদ্ধি করতে থাকে। সারাদিনের পিপাসাকাতর ও ক্লান্ত খৃস্টান সৈন্যরা টিলার উপর ঝলসে যেতে থাকে। তাদের একটি ইউনিট পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের একজনকেও জীবন নিয়ে যেতে দেয়নি। পরদিন ক্রুসেডাররা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সেনাপতিগণসহ সকলে সুলতান আইউবীর হাতে বন্দি হয়ে যায়।

সুলতান আইউবীর বাহিনীর অপর তিন অংশ বিভিন্ন স্থানে কখনো ক্রুসেডারদের পার্শ্বের উপর আক্রমণ করছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনো পেছনের উপর হামলা চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। এক-দু'টি প্লাটুন এমন ধারায় দুশমনের সম্মুখে অবস্থান নিয়ে আছে যে, তারা এই সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, তো এই পিছিয়ে আসছে। এভাবে দুশমন হিত্তীনের ময়দানে এসে পড়ে। কিন্তু ততোক্ষণে তারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় আধমরা হয়ে গেছে।

১১৮৭ সালের ৩ জুলাই। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী হিত্তীনের জন্য

যে পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এদিনে সে অনুপাতে অভিযান শুরু করেন। এ দিনটিও ছিলো পবিত্র জুমার বরকতময় দিন। ইতিপূর্বে গোয়েন্দারা– যাদের মধ্যে কুলসুম ও বকর উল্লেখযোগ্য– রিপোর্ট করেছিলো, সাত খৃস্টান জোট বেঁধেছেন। মোকাবেলায় সুলতান আইউবীর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করার তো সুযোগ ছিলো না। কিন্তু তিনি যুদ্ধকৌশল, বাহিনীর বণ্টন, বিন্যাস, কমান্ডো গেরিলাদের ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, রণাঙ্গনে দ্রুত চলাচলের ধরণ ইত্যাদিতে রদবদল করে নিয়েছেন এবং নতুন করে কিছু কার্যকর কৌশল ঠিক করে রেখেছেন। তিনি দুশমনকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হিত্তীনে নিয়ে এসেছেন। আশপাশের দুর্গ এবং বসতিগুলোও দখল করে নিয়েছেন। পানির উৎস তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ঋতুর রুদ্ররোষও তাঁর পক্ষে।

শত্রু বাহিনী যখন হিত্তীন এসে উপনীত হয়, তখন তারা জানতো না, তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিপুণভাবে পাতা জালে এসে অনুপ্রবেশ করেছে। আইউবীর গেরিলা বাহিনী দুশমনের পাহারা চৌকি, টহল সেনা, আউটপোস্ট এবং রসদের জন্য প্রলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। রাতে তারা না শত্রুসেনাদের আরাম করতে দিচ্ছে, না সেনাপতিদের ভাবনা-চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাই সুলতান আইউবীর বাহিনীর মধ্যম অংশ মুখোমুখি আক্রমণ করে বসে। টিলা-টিপির কারণে যুদ্ধের অঙ্গনটা সংকীর্ণ। ক্রুসেডাররা এদিক-ওদিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মুসলিম সেনারা তৎপর হয়ে ওঠছে। তীরন্দাজগণ উঁচুতে অবস্থান গ্রহণ করে ক্রুসেডারদের উপর তীর ছুঁড়ছে। সুলতান আইউবী একবার উপরে উঠছেন, আবার নীচে অবতরণ করছেন। তাঁর দূত সংবাদ-বার্তা আদান-প্রদান করছে। লোহার বর্ম খৃস্টান নাইটদের পুড়ে মারছে। তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় কাতর। সম্মুখে পানি দেখা যাচ্ছে, যা তাদের পিপাসাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু পানির দখল আইউবীর হাতে।

ক্রুসেডাররা হেডকোয়ার্টারে সাহায্যের আবেদন পাঠায়। অল্প সময়ে সাহায্য তথা নতুন সৈন্য এসে পড়ে। শেষবারের মতো তারা একটা জবাবি আক্রমণ চালায়।

তারা মুসলিম বাহিনীর যে অংশটির উপর আক্রমণ চালায়, তার সেনাপতি তকিউদ্দীন। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি তার বাহিনীকে

অর্ধ বৃত্তাকারে বিন্যস্ত করে দেন। দুশমন সোজা ধেয়ে আসে। তকিউদ্দীন বৃত্তের মুখ বন্ধ করে দেন। ক্রুসেডাররা তার বেষ্টনীতে আটকা পড়ে যায়। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের কেটে-পিষে ফেলে।

এখন যুদ্ধের অবস্থাটা হলো, ক্রুসেডাররা হিত্তীনের ময়দানে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। হিত্তীন থেকে দূরে কোথাও তাদের যদিও কোনো ইউনিট থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে মুসলমানরা তাদের সেখানেই বেকার করে দিয়েছে। এই প্রথম ও শেষবারের মতো আক্রার পাদ্রী 'বড় ক্রুশ'সহ রণাঙ্গনে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন। খৃস্টান সম্রাটগণ এই ক্রুশেই হাত রেখে আমৃত্যু অটল থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সম্রাটগণ তার আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে পিঠ দেখাতে শুরু করেছেন। গাই অফ লুজিনান দু'জন সঙ্গীসহ পালাতে শুরু করলে মুসলিম সৈনিকরা দেখে ফেলে এবং তাকে জীবিত ধরে ফেলে।

আক্রার পাদ্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। 'বড় ক্রুশ' মুসলমানদের হাতে এসে পড়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এই ক্রুশ সম্পর্কে কিছু লিখেননি। সে কালের লিপি থেকে প্রমাণিত হয়, বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী ওখানকার খৃস্টানদের সম্মানার্থে ক্রুশটা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হিত্তীন যুদ্ধ চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ছিলো না। অসংখ্য-অগণিত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। অবশিষ্টরা অস্ত্র সমর্পণ করে আইউবীর হাতে বন্দি হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষে সুলতান আইউবীর সম্মুখে যেসব বন্দিকে হাজির করা হলো, তাদের মধ্যে রেমন্ড ব্যতীত জোট বাহিনীর ছয় সম্রাটই আছেন। আছেন প্রিন্স অর্নাতও, সুলতান যাকে নিজ হাতে হত্যা করার কসম খেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছে এবং কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবী খৃস্টান সম্রাট জেফ্রেকে শরবত পান করতে দিয়েছিলেন। জেফ্রে অর্ধেক পান করে গ্লাসটা অর্নাতকে দিয়ে দেন।

অর্নাত শরবত পান করতে শুরু করেন। সুলতান আইউবী দোভাষীর মাধ্যমে গর্জে ওঠে বললেন– 'ওকে (অর্নাতকে) বলো, ওকে আমি নই– তার সম্রাট শরবত দিয়েছে। আরবী মেজবান শুধু সেই শত্রুকে শরবত পান করতে দেয়, যার জীবন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি অর্নাতকে শরবত দেইনি।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সে সময় সুলতান আইউবীর চোখ থেকে যেনো স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো।

সুলতান চাকরদের বললেন, এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। সকলে তাঁবুতে বসে আহার করেন। সুলতান পুনরায় জেফ্রে এবং অর্নাতকে নিজ তাঁবুতে ডেকে পাঠান। অর্নাতকে বললেন– 'তুমি সবসময় আমার রাসূলকে অবমাননা করতে। এখন ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তোমার মুক্তির আর কোন পথ নেই।'

অর্নাত অস্বীকৃতি জানান।

সুলতান আইউবীর এটাই কামনা ছিলো। তিনি ঝট করে তরবারীটা বের করে এক আঘাতে অর্নাতের একটা বাহু দেহ থেকে আলাদা করে ফেলেন এবং চীৎকার করে বলে ওঠেন– 'শয়তান! আমার প্রিয় রাসূলের অবমাননা করেছিস্! গালিগুলো যদি আমাকে দিতে, তবু জীবনটা রক্ষা পেতো।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর তাঁবুতে তাঁর যে দু'তিনজন সালার ছিলেন, তারা তরবারীর আঘাতে অর্নাতকে খতম করে দেন। সুলতান শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললেন– 'এই নাপাক মরদেহটাকে বাইরে ফেলে দাও।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী অর্নাতের দেহটা তাঁবুর বাইরে এবং তার আত্মাটা জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন।'

সহকর্মীর এই পরিণতি দর্শনে সম্রাট জেফ্রের মুখ শুকিয়ে যায়। তিনি বুঝে নেন, এবার আমার পালা। সুলতান আইউবী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন– 'রাজা রাজাকে হত্যা করে না। কিন্তু লোকটার অপরাধ এমন ছিলো যে, আমাকে এক সময় তাকে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করতে হয়েছিলো। আপনি ভয় পাবেন না।'

বন্দি সম্রাটদেরকে বন্দিদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

এখন রাত। কার্কের রাজপ্রাসাদ নীরব-নিস্তব্ধ। প্রিন্স অর্নাত সেখানে নেই। নেই তার সেনাপতি-দরবারিগণও। আছে কেবল হেরেমের নারীরা। কুলসুমও আছে। তার চাকর-চাকরানিরাও আছে। দুর্গে অল্প ক'জন সৈন্য আছে। এখনো সেখানে অর্নাতের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেনি। রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এতোক্ষণে কুলসুমের শুয়ে পড়ার কথা।

এক মহিলা পা টিপে টিপে কুলসুমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। তার হাতে খঞ্জর। সে কুলসুমের পালঙ্কের নিকটে পৌঁছে যায়। কক্ষে আলো নেই। কিছু দেখা যাচ্ছে না। মহিলা খঞ্জরধারী হাতটা উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানে। কিন্তু কেউ চীৎকার করেনি। খঞ্জর পালঙ্কে গেঁথে যায়। সে বিছানা হাতড়ায়। কুলসুম নেই। মেয়েটি কোথাও গেছে মনে করে মহিলা পালঙ্কের পাশ ঘেঁষে লুকিয়ে বসে থাকে।

খানিক পর চাপা পায়ে কে একজন কক্ষে প্রবেশ করেছে শোনা যায়। শব্দটা পালঙ্কের নিকটে চলে আসে। মহিলা উঠে তার উপর খঞ্জরের আঘাত হানে। পরক্ষণেই উল্টো তার পেটে খঞ্জর গেঁথে যায়। তারপর কিছুক্ষণ দু'খঞ্জরের সংঘর্ষ চলে। আঘাত-পাল্টা আঘাত চলে। তারপর দু'জনই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। হেরেমের অন্যান্য মেয়েরা ছুটে আসে।-দেখে। আঘাতপ্রাপ্ত দু'জন মারা গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কুলসুম নেই। এরা দু'জনই হেরেমের নারী– দু'জনই কুলসুমকে হত্যা করতে গিয়েছিলো। সেদিনই তারা কুলসুমকে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছিলো। কিন্তু খুনটা কে গিয়ে করবে, তাতে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে যায়। ফলে অন্ধকার কক্ষে তারাই কুলসুম মনে করে একে অপরকে হত্যা করে ফেলে।

ততোক্ষণে কুলসুম প্রাসাদ থেকেই নয় শুধু– কার্ক থেকেও বেরিয়ে গেছে। সেদিনই বকর তার গোয়েন্দা সঙ্গীদের মারফত জানতে পারে, হিত্তীনে ক্রুসেডারদের অত্যন্ত শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। কার্কের গোয়েন্দারাই তাকে পরামর্শ দিয়েছে, তুমি কুলসুমকে নিয়ে পালিয়ে যাও। রাতে দুর্গের ফটক খোলানো কুলসুমের পক্ষে ব্যাপার নয়। সকলেই জানে, এই মেয়েটি প্রিন্স অর্নাতের প্রেপাস্পদ। বকর ইবনে মুহম্মদ সায়বাল সেজে তাকে ঘোটকযানে করে নিয়ে যাচ্ছে। হেরেমের কোনো নারী কুলসুমকে যেতে দেখেনি।

শহর থেকে দূরে এক স্থানে পৌঁছে তারা দু'টি ঘোড়া পেয়ে যায়। এগুলো তাদেরই গোয়েন্দাদের ব্যবস্থাপনায় সেখানে অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা সেখানেই ছেড়ে দেয়া হলো। কুলসুম ও বকর ঘোড়া দুটোতে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন পথে নিজ বাহিনীর এক দূত তাদের জানায়, ক্রুসেডাররা পরাজয়বরণ করেছে। অর্নাত মৃত্যুবরণ করেছে। সুলতান আইউবী এখনো হিত্তীন ও নাসেরার অঞ্চলে অবস্থান করছেন। কুলসুম সুলতান আইউবীর নিকট যেতে চাচ্ছে।
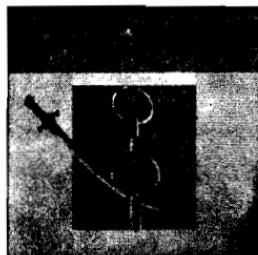
তারা গ্যালিলি ঝিলে পৌঁছে গেছে। কুলসুমকে যখন সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তখন মেয়েটি সুলতানের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে।

'আমার কন্যা'– সুলতান আইউবী মেয়েটিকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে স্বস্নেহে বললেন– 'আমার এই বিজয়ে না জানি তোমার মতো আরো কতো মেয়ের হাত রয়েছে।'

'আমি অর্নাতের লাশটা দেখতে চাই'– কুলসুম বললো।

'সব ক'টার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'অর্নাতকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছি। আগামীকাল তোমাকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে। আমাকে এখনো বহুদূর যেতে হবে। যেখানে থাকবে, আমার জন্য দু'আ করবে, যেনো আমি কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি। দু'আ করবে সূর্য যেখানে অস্ত যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

হিত্তীনের জয় ছিলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের মাধ্যমে সুলতান আইউবী ফিলিস্তীনের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাতে ঢুকে পড়েছিলেন। এতো বিশাল একটা অঞ্চল জয় করার ফলে সুলতানের জন্য ফিলিস্তীন জয় সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি এই অঞ্চলটাকে আস্তানা বানিয়ে নেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি ও অস্ত্র-রসদ ইত্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।

আল-ফারেস

হিত্তীনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে বিজয় অর্জন করেছেন, তা কোনো সাধারণ বিজয় ছিলো না। সাত সাতজন খৃস্টান সম্রাট ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তিকে চিরতরে খতম করতে এবং তারপরে পবিত্র মক্কা-মদীনা দখল করতে এসেছিলেন। কিন্তু ফল ফলেছে উল্টো। মরুর টিলা যেমন ঝড়ের কবলে পড়ে বালিকণার ন্যায় মরুভূমিতে মিশে যায়, তেমনি তাদের নিজেদের সামরিক শক্তিই বরং নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারজন বিখ্যাত ও শক্তিমান সম্রাট আইউবীর হাতে বন্দি হয়েছেন, যাদের মধ্যে জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাস) শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনান অন্যতম। খৃস্টান বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে এবং আইউবী বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তবে গেরিলা অপারেশন এখনো চলছে। আইউবীর গেরিলারা পলায়নপর খৃস্টান সৈন্যদের পাকড়াও করছে। ক্রুসেডারদের মনোবল এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষায়– 'এক ব্যক্তি– যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে, লোকটা সত্য বলে– আমাকে বলেছে, সে নিজ চোখে দেখেছে, মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক ত্রিশজন খৃস্টান সৈন্যকে এক রশিতে বেঁধে নিয়ে আসছিলো।' এমন তো একাধিক দৃশ্য দেখা গিয়েছিলো, এক একজন মুসলিম সৈনিক কয়েকজন করে খৃস্টান সৈন্যকে নিরস্ত্র করে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। কোনো কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ক্রুসেডারদের পরাজয়ের এরূপ একাধিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সামরিক যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন।

হিত্তীন এবং তার আশপাশে এবং আরো দূরে যেখানে যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে ক্রুসেডারদের লাশ পড়ে আছে। গুরুতর আহতরা ছটফট করে করে প্রাণ হারিয়েছে।

সাধারণ আহতরাও মারা গেছে। তার কারণ জখম নয়– পিপাসা। লোহা পরিহিত নাইটদের নিরাপত্তা বর্মগুলো উত্তপ্ত চুলায় পরিণত হয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কালের এক ঐতিহাসিক এ্যান্থনি ওয়েস্ট সেকালের ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন, হিত্তীনের রণাঙ্গনে লাশের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারেরও অধিক। লাশগুলো তুলে আনার কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। তাদের যেসসব সহকর্মী জীবিত ছিলো, তারা হয়তো বন্দি হয়ে গিয়েছিলো, নতুবা ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। অ্যান্থনি ওয়েস্ট লিখেছেন, তাদের লাশগুলো চিল-শকুন ও শিয়াল-কুকুররা খেয়ে ফেলেছিলো। দিন কয়েকের মধ্যেই লাশগুলো হাড়ের কংকালে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। যারা উপর থেকে দৃষ্টিপাত করেছেন, তারা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ভূখণ্ডটাকে হাড়ের কারণে সাদা দেখেছেন। সেই কংকালগুলোর মাঝে হাজার হাজার ছোট ছোট ক্রুশ ছড়িয়ে পড়েছিলো, যেনো পাকা ফসল থেকে ফলগুলো ছিড়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে।

সুলতান আইউবী লাশগুলো সরিয়ে অঞ্চলটাকে পরিষ্কার করার গরজ বোধ করেননি। কারণ, তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। তাঁর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস। কিন্তু তিনি আলোচনা করছেন আক্রার। আক্রার বড় ক্রুশটা সুলতানের তাঁবুর বাইরে পড়ে আছে। তার মহান মোহাফেজ পাদ্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার এটিও একটি কারণ।

'আমাদেরকে এখন সোজা আক্রায় আক্রমণ চালাতে হবে'– সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও নায়েবদের উদ্দেশে বললেন– 'আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, আমার রিজার্ভ বাহিনীটা গোটাই অক্ষত রয়ে গেছে– ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি।' তিনি সকলের উপর চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'মনে করো না আমার নিজের ও বন্ধুদের ক্লান্তির অনুভূতি নেই। তোমাদেরকে এর বিনিময় আল্লাহ দান করবেন। তোমাদের বিশ্রাম হবে মসজিদে আকসায়। আমরা যদি এখানে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ি, তাহলে ক্রুসেডাররা জড়ো হয়ে সতেজ ও প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে জখম পরিষ্কার করারও সুযোগ দিতে চাই না।'

সালারগণ খানিকটা বিস্মিত হন। তাদের আশা ছিলো, এবার সুলতান

আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রার আদেশ দেবেন। অথচ, তিনি কিনা আক্রা আক্রমণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। খৃস্টানদের বড় ক্রুশটা তাঁর পেছনে রাখা আছে। তিনি ক্রুশটার প্রতি তাকান এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। উপস্থিত লোকজন চুপচাপ বসে আছে। হঠাৎ তিনি দ্রুত সালারদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠেন– 'আমার বন্ধুগণ! এটা দু'টি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এটা হক ও বাতিলের সংঘাত। এই ক্রুশটার উপর জমাট হয়ে থাকা রক্ত দেখো। এই রক্ত হযরত ঈসার নয়। এই রক্ত সেই পাদ্রীরও নয়, যাকে খৃস্টান জগত এই ক্রুশের মোহাফেজ বলে বিশ্বাস করে। এই রক্ত সেই পাদ্রীদেরও নয়, যারা এতো বড় ক্রুশটাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে রেখেছিলো। এরা সকলে আল্লাহর সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু এই রক্ত তাদের একজনেরও নয়। এই রক্ত অসত্যের রক্ত। এই রক্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও মানুষের গড়া চিন্তা-চেতনার রক্ত।'

সুলতান আইউবীর কণ্ঠে আবেগের জোশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বললেন– 'আমি প্রতিটি যুদ্ধাভিযান জুমার দিন শুরু করে থাকি। অগ্রযাত্রা জুমার দিন করি। জুমা বরকতময় দিবস। আমি প্রতিটি অভিযান জুমার খুতবার সময় শুরু করি। কারণ, এই সময়টা দু'আ কবুলের সময়। তোমরা যখন দুশমনের সঙ্গে লড়াইরত থাকো, তোমাদের উপর তীরবৃষ্টি হতে থাকে, দুশমনের মিনজানিকগুলো তোমাদের উপর আগুন ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে, সে সময় জাতির প্রতিজন মানুষের হাত মহান আল্লাহর দরবারে তোমাদের নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য উত্তোলিত থাকে। তোমরা কি দেখোনি, আমি এই যুদ্ধের জন্যও রওনা জুমার দিন করেছিলাম এবং জুমার দিন যুদ্ধ শুরু করেছিলাম? এখন তোমরা বিজয়ী। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। এটা আমাদের সুমহান বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার জয়। এই যুদ্ধ ছিলো চাঁদ-তারা বনাম ক্রুশের যুদ্ধ। চাঁদ-তারা জয়লাভ করেছে। আমি তোমাদেরকে কথাগুলো কেনো বলছি? এই জন্য বলছি যে, তোমাদের কারো মধ্যে যদি বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো শোবা-সন্দেহ থাকে, তাহলে দূর হয়ে যাবে। তোমরা আল্লাহর রশিকে আরো শক্তভাবে ধারণ করো।'

'তোমাদের বোধ হয় অবাক লাগছে, আমি আক্রা আক্রমণের সিদ্ধান্ত কেনো নিয়েছি। আবেগের কথা বলতে হলে তার কারণ, ক্রুসেডাররা একবার আমাদের পবিত্র মক্কা ও মদীনা অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেছিলো।

প্রিন্স অর্নাত মক্কা থেকে মাত্র দু'ক্রোশ দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। আমি অর্নাত থেকে পবিত্র মক্কার প্রতি কু'নজরে তাকাবার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছি। এবার অন্যান্য সম্রাট ও নাইটদের থেকে প্রতিশোধ নেবো। আক্রা তাদের মক্কা। আমি নগরীটা পদানত করবো। মসজিদের আকসার যে অবমাননা চলছে, তার প্রতিশোধ নেবো। আর সামরিক বিচারে বাইতুল মুকাদ্দাসের আগে আক্রা জয় করা এ কারণেও জরুরি যে, তাতে ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাবে।'

সুলতান আইউবী বিশাল একটা নকশা- যেটি তিনি নিজ হাতে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন- খুলে সকলের সামনে মেলে ধরেন এবং হিত্তীনের উপর আঙুল রেখে বললেন- 'এখন তোমরা এখানে'। তিনি আঙুলটা এমনভাবে দ্রুত আক্রার দিকে নিয়ে যান, যেনো কিছু কর্তন করার জন্য খঞ্জরের আগা চালালেন। বললেন- 'ক্রুসেডারদের শাসনক্ষমতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আমি তার মধ্যখানে এসে পড়বো। আক্রায় দখল প্রতিষ্ঠিত করে টায়ের, বৈরুত, হীফা, আসকালান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল উপকূলীয় নগর ও পল্লীকে ধ্বংস করে দেবো। সামরিক-বেসামরিক কোনো খৃস্টানকে সেসব অঞ্চলে থাকতে দেবো না। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর দখল এ কারণেও জরুরি যে, ইউরোপের আরো কতিপয় সম্রাট তাদের খৃস্টান ভাইদের সাহায্যার্থে সৈন্য, অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ করবে। উপকূল তোমাদের দখলে থাকলে দুশমনের কোনো রণতরী কূলে ভিড়তে পারবে না। এখান থেকে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হবো। আমাদেরকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে।'

ফিলিস্তীন ও লেবাননের মানচিত্র দেখলে আপনি গ্যালিলি ঝিলের পাড়ে হিত্তীন এবং তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের কূলে আক্রা দেখতে পাবেন। দক্ষিণে বাইতুল মুকাদ্দাস। হিত্তীন থেকে আক্রার দূরত্ব পঁচিশ মাইল আর বাইতুল মুকাদ্দাস সত্তর মাইল। আজকের লেবানন ও ফিলিস্তীনের উপর সেদিন খৃস্টানদের দখল ছিলো। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন, তিনি হিত্তীন থেকে আক্রা পর্যন্ত এমনভাবে অগ্রযাত্রা করবেন যে, পথে পড়া প্রতিটি অঞ্চল দখল করতে থাকবেন এবং সেসব অঞ্চল থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করে শুধু মুসলমানদের থাকতে দেবেন। সামরিক বিশেষজ্ঞগণ একে অতিশয় উত্তম এক পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেছেন। সুলতান আইউবী এই পরিকল্পনা

ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করেছিলেন। ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় তাঁর বাহিনী ক্রুসেডারদের এতো বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কম ছিলো। কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-কৌশলগুলো ক্রুসেডারদের অপেক্ষা উন্নত এবং চলাচলের গতি অত্যন্ত তীব্র ছিলো।

❖ ❖ ❖

'আক্রার প্রতিরক্ষা অনেক শক্ত'– সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, ওখানে শক্ত-সামর্থ যুবক মুসলমানরা কারাগারে আটক রয়েছে। নারী-শিশুরাও বন্দি অবস্থায় রয়েছে। ওখানকার খৃস্টান নাগরিকরা নগরীর প্রতিরক্ষায় জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করবে। মুসলিম যুবকরা যেহেতু বন্দি, তাই ভেতর থেকে তারা আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। আমি দীর্ঘ অবরোধ করতে চাই না। তোমাদের আক্রমণ ঝড়গতির হওয়া চাই। আক্রা পর্যন্ত আমাদের অগ্রযাত্রার নিরাপত্তা বিধান করবে আমাদের কমান্ডোরা। অগ্রযাত্রা হবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পথে কোন লোকালয় অক্ষত থাকবে না। তবে সৈনিকগণ গনীমত কুড়ানোর জন্য থামবে না। এ কাজের জন্য আলাদা বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে।'

আক্রায় মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে, দু'-চারজন বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছাড়া সবাই মানবতের ও আতঙ্কের জীবন-যাপন করছে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কারাগারে আটক মুসলমানদের সংখ্যা চার হাজারের অধিক লিখেছেন। সে যুদ্ধের অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মধ্যে লিখেছেন। মোটকথা, আক্রা মুসলমানদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়েছিলো। কোনো মুসলমানের বোন-কন্যা নিরাপদ ছিলো না। ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিলো, মুসলমানরা চলমান লাশে পরিণত হয়ে যাক এবং তাদের শিশুদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তার অনুভূতিই জাগ্রত না হোক। সেখানকার মসজিদগুলো বিরান হয়ে গিয়েছিলো।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর ক্রুসেডাররা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। এতোদিন যেসব মুসলমান নিজ ঘরে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিলো, তাদেরও ধরে ধরে উন্মুক্ত কারাগারে নিক্ষেপ্ত করা হলো। সে ছিলো এক ধরনের বেগার ক্যাম্প। ওখানে মুসলমানদের দ্বারা পশুর ন্যায় কাজ করানো হতো। ১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর আর তাদের বের হতে দেয়া হয়নি। তাদের কঠোর

পাহারা বসিয়ে দেয়া হলো। তা থেকেই হতভাগ্যরা অনুমান করে নিয়েছিলো, খৃস্টানদের কোথাও পরাজয় ঘটেছে কিংবা ইসলামী ফৌজ তাদের নগরী অবরোধ করেছে। মহিলারা আল্লাহর দরবারে মিনতি করতে শুরু করলো। কারাগারের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন মাত্রায় বেদনার ছায়া নেমে হলো। মায়েরা দু'আর জন্য অবুঝ সন্তানদের হাত উঁচে তুলে ধরে বলতে শুরু করে– 'বেটা! বলো, হে আল্লাহ! আপনি ইসলামকে বিজয় দান করুন। বলো, হে আমার আল্লাহ! আপনি বাইরের মুসলমানদেরকে হিম্মত দান করুন, যেনো তারা আমাদেরকে জালেমদের এই লোকালয় থেকে বের করে নিতে পারেন।'

হাজার হাজার শিশু হাজার হাজার নারী আল্লাহর সমীপে হাত তুলে দু'আ করছে, আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছে। শিশুরা তাদের মায়েদের কান্না দেখে তারাও কাঁদতে শুরু করে। তবে অবলা নারী আর অবুঝ শিশুদের এই ক্রন্দনরোলের সঙ্গে হান্টারের শব্দও ভেসে আসছে। তারা তাকিয়ে দেখে, বিপুলসংখ্যক নতুন কয়েদি নিয়ে আসা হচ্ছে। এরা নগরীর সেইসব মুসলিম বাসিন্দা, যারা এতোদিন আপন আপন বাড়িঘরে বসবাস করছিলো। তাদের নারী এবং শিশুদেরকেও নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরই উপর হান্টারের আঘাত হানা হচ্ছে।

ছয় কি সাত জুলাই মধ্যরাতের পর হঠাৎ নগরীতে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান থেকে অগ্নিশিখা উত্থিত হতে শুরু করে। শা শা করে তীর এসে এই মুক্ত কারাগার পর্যন্ত আঘাত হানতে শুরু করে। এই কারাগারের চারদিকে শুষ্ক কাঁটা এবং রশির জালের বেড়া দেয়া। রাতে চারদিকে স্থানে স্থানে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বন্দিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক বন্দি বাইরে থেকে আসা একটি তীর তুলে হাতে নিয়ে বাতির আলোতে নিরিক্ষা করে দেখেই চীৎকার দিয়ে ওঠে– 'আমি এই তীর চিনি! এটি ইসলামী ফৌজের তীর।'

এমন সময় বেড়ার জালের ফাঁক গলিয়ে শা করে অপর একটি তীর ধেয়ে এসে লোকটার বুকে গেঁথে যায়। কোন এক খৃস্টান সান্ত্রী বন্দিকে চুপ করানোর জন্য তীরটা ছুঁড়েছে। শহর জেগে ওঠেছে। নগরী ও দুর্গের পাঁচিলের উপর দৌড়-ঝাপ, হট্টগোল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনুক থেকে তীর বের হওয়ার শব্দও বেড়ে চলেছে। বাইরে আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। একটু পরপর ধ্রাম ধ্রাম শব্দ কানে

ভেসে আসছে। এগুলো বড় বড় পাথর পতনের শব্দ, যা কিনা সুলতান আইউবীর সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে পাঁচিলের উপর নিক্ষেপ করছে।

❖ ❖ ❖

এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অবরোধ। তবে অবরোধের চেয়ে আক্রমণটাই বেশি। শহরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপক মিনজানিক ছাড়াও ফটক ও পাঁচিলের উপর ভারি পাথর নিক্ষেপকারী বড় মিনজানিকও ব্যবহার করা হচ্ছে। উঁচু উঁচু মাচান সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। এক একটি মাচানের দশ থেকে বিশজন করে সৈনিক দাঁড়াতে পারে। সেগুলোর নীচে চাকা লাগানো। উট এবং ঘোড়া এগুলো টেনে এনেছে। এই চলমান মাচানগুলো দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু খৃস্টানরা নগরীর প্রতিরক্ষায় প্রাণান্ত যুদ্ধ লড়ছে। সাধারণ জনগণও সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। তারা সুলতান আইউবীর চলন্ত মাচানগুলোর উপর বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুসলিম সৈনিকদের খতম করে চলেছে। যে মাচানগুলো পাঁচিলের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে, খৃস্টান সৈনিকরা সেগুলোর উপর জ্বলন্ত প্রদীপ এবং তরল দাহ্য পদার্থের পাতিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের ভস্ম করে দিচ্ছে।

ভেতরে বন্দিশালায় হাজার হাজার কয়েদি সমকণ্ঠে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করছে। মহিলারা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে আকুতি করছে। হঠাৎ একজন অতি উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে– 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব'। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটে। সঙ্গে সকল নারী, শিশু ও পুরুষের কণ্ঠ এক কণ্ঠে পরিণত হয়ে যায়, যা যুদ্ধের হট্টগোল থেকে অধিক উচ্চ হয়ে দেখা দেয় এবং বিকট শব্দের রূপ ধারণ করে শহরময় ছড়িয়ে পড়ে।

দু'-তিনজন সান্ত্রী ভেতরে প্রবেশ করে বন্দিদের চুপ করানোর চেষ্টা করতে শুরু করে। তিন-চারজন উত্তেজিত কয়েদি উঠে সান্ত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফটক খোলা ছিলো। অবশিষ্ট কয়েদিরা কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তীর বৃষ্টি সামনের লোকগুলোকে মাটিতে ফেলে দেয়। পরক্ষণে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসে। আরোহীদের হাতে বর্শা ছিলো। পলায়নপর কয়েদিরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। যারা পেছনে রয়ে যায়, তারা আরোহীদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে যায়। বন্দিদের পলায়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নারী ও শিশুরা আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারপর সমস্বরে কালেমা তায়্যেবার জিকির করতে শুরু করে।

রাতভর সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈন্যরা পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার এবং পাঁচিলে ছিদ্র করার কিংবা সুড়ঙ্গ খনন করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে আর উপর থেকে খৃস্টানরা তাদের উপর তীর, পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করতে থাকে। সুলতান আইউবী অনুপম কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। নগরীর পাঁচিলের এক স্থানে বড় মিনজানিকের সাহায্যে ভারি ভারি পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। রাত পোহাবার পর দেখা গেলো, পাঁচিলের উপর সবখানে সবদিকে আক্রার সাধারণ মানুষ ও সৈনিকরা মাছির ন্যায় ছেয়ে আছে। তারা তীর বর্ষণ করছে। আরো দেখা গেলো, প্রাচীরের এক স্থানে ফাটল ধরেছে। সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামান্য পেছনে একস্থানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করছেন। তিনি আদেশ করেন, যেখান থেকে দেয়াল ফাটছে, তার উপর ও ডান-বাম থেকে দুশমনের উপর তীর বর্ষণ করো। তিনি অপর দিককার তীরন্দাজদেরও তলব করে উক্ত স্থানে নিয়োজিত করেন। সুড়ঙ্গ খননকারী বাহিনীকে বললেন, তোমরা দৌড়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে যাও।

জানবাজরা পৌঁছে গেছে। প্রাচীরের উপর এতো অধিক ও এতো তীব্র গতিতে তীর বর্ষিত হচ্ছে যে, উপরের লোকদের পক্ষে মাথা তোলাও কঠিন হয়ে পড়েছে। জানবাজরা প্রাচীরে এতোটুকু ছিদ্র করে ফেলেছে যে, সেই ছিদ্র পথে দু'জন লোক এক সঙ্গে অতিক্রম করতে পারবে। মুসলিম সৈনিকরা এতো আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছে যে, তারা কোনো আদেশ ছাড়াই ছুটে একজন একজন করে ভেতরে ঢুকে যেতে শুরু করেছে। খৃস্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে নীচে নেমে আসতে এতোটুকু সময় ব্যয় করে ফেলে যে, ইতিমধ্যে বহু মুসলমান সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খৃস্টানরা প্রাণপণ মোকাবেলা করে। কিন্তু আক্রার নির্যাতিত মুসলিম নারী-শিশুদের ফরিয়াদ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুলতান আইউবীর শক্তি মূলত এটিই ছিলো।

❖ ❖ ❖

নগরীর ভেতরে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে। খৃস্টানদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের কব্জায় চলে গেছে এবং তার প্রধান মোহাফেজ মারা গেছেন এ সংবাদ সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়ছিলো। হিত্তীনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া খৃস্টান সৈন্যও এই নগরীতে এসে পৌঁছেছে। কিছু জখমীও এসেছে। তারা নিজেদের পরাজয় এবং পিছুহটার ঘটনাকে যৌক্তিক প্রমাণিত করার জন্য অত্যন্ত ভীতিকর গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে। সুলতান আইউবীর

জানবাজরা যখন নগরীর প্রাচীর ভেঙে ফেলে এবং অপ্রতিরোধ্য বানের ন্যায় ভেতরে ঢুকতে শুরু করে, তখন সেই গুজবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সৈন্যরা মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে বটে; কিন্তু জনসাধারণের মাঝে হুলস্থূল শুরু হয়ে গেছে। তারা নগরী ছেড়ে পালানোর জন্য ফটকগুলোর উপর আছড়ে পড়ে এবং সৈনিকদের বাধা সত্ত্বেও দু'-তিনটি দরজা খুলে ফেলে।

মুসলিম আরোহী সেনারা কমান্ডারদের আদেশে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। দলে দলে ফটক অতিক্রমকারী জনসাধারণকে পিষে পিষে ঘোড়াগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে। এবার মুজাহিদদের স্রোত কেউ ঠেকাতে পারলো না। নগরীর প্রতিটি দ্বার খুলে গেছে। ক্রুসেডাররা অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করেছে। এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। আক্রার শাসনকর্তা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি খৃস্টান বাহিনীর সেনাপতি-কমান্ডারদের এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই জায়গাটিতে চলে যান, যেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমান বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। প্রহরীরা পালিয়ে গেছে। বন্দিরা ফটক ও দড়ির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবী তাদের থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে যান। ওগুলো মানুষ তো নয়– মানুষের লাশ। নারী ও শিশুদের দেখে তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

'যাও, রশিগুলো কেটে দাও। ওদেরকে মুক্ত করে দাও'– সুলতান আইউবী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আর তাদেরকে বলো না, আমি শহরে আছি। আমি তাদেরকে মুখ দেখাতে পারবো না।'

সুলতানের আদেশ পেয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। তারা কারাগারের কাঠের বেড়া ভেঙে ফেলে। কয়েক স্থানে রশির জাল কেটে পেছনের ঝোপ-কাঁটা সরিয়ে দেয়। কয়েদিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ওটা যেনো এক মুহূর্তও থাকার জায়গা নয়। আরোহীরা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য চীৎকার করে করে বলছে– 'ধীরে সুস্থে বের হও। এখন আর তোমাদেরকে কেউ ধরতে আসবে না। ঐ দেখো, দুর্গের উপর তোমাদের পতাকা উড়ছে।'

'তারা আমাদেরই পাপের শাস্তি ভোগ করছে'– সুলতান আইউবীর কাছে দণ্ডায়মান এক সালারকে বললেন– 'এ ছিলো বিশ্বাসঘাতকদের পাপ,

যার শাস্তি এই নিরপরাধ মানুষগুলো ভোগ করলো। যারা আপন দীনের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে বরণ করলো, তারা একটুও ভাবলো না, তাদের জনগণের পরিণতি কী হবে। ক্ষমতালোভী গাদ্দাররা যদি আমার পথ আগলে না দাঁড়াতো, তাহলে আমাদের এই হাজার হাজার শিশু ও কন্যার এমনি দশা ঘটতো না। হযরত ঈসা (আ.) প্রেম-ভালোবাসা ও শান্তির পাঠ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রুশের পূজারীদের হৃদয়-মন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতো ঘৃণায় পরিপূর্ণ যে, তারা আপন পয়গম্বরের নীতি-আদর্শেরও পরোয়া করছে না। পৃথিবীতে দু'টি মাত্র ধর্ম টিকে থাকবে। ইসলাম ও খৃস্টবাদ। আমরা যদি হৃদয় থেকে ক্ষমতার লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার মোহ দূর করতে না পারি, এই দুর্বলতার সুযোগে খৃস্টবাদ ইসলামের পতন ঘটিয়ে ছাড়বে।'

খৃস্টান সেনাপতি ও কমান্ডারদের যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সুলতান আইউবী সেখানে যান। তিনি বললেন— 'এদের সকলকে নদী তীরে নিয়ে যাও এবং প্রত্যেককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দাও। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদের বাছাই করো। যাদেরকে জীবিত রাখা আবশ্যক মনে হবে, তাদের দামেশ্ক পাঠিয়ে দাও আর বাকিদের খতম করে দাও। কোনো নিরস্ত্র নাগরিকের গায়ে হাত তুলবে না। তাদের যারা নগরী ত্যাগ করে চলে যেতে চায়, তাদের যেতে দাও। যারা এখানে থাকতে চাইবে তাদেরকে সসম্মানে থাকতে দাও।'

১১৮৭ সালের ৮ জুলাই আক্রার দখল সম্পন্ন হয়ে যায়।

রাতে যখন সুলতান আইউবী আহার থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাকে সংবাদ দেয়া হলো, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একজন কয়েদিকে আপনার সামনে হাজির করা হচ্ছে।

'সে কে?'— সুলতান আইউবী খানিক বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

'হারমান— ক্রুসেডারদের আলী বিন সুফিয়ান।'

হারমান খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান। আলী বিন সুফিয়ানের ন্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ গোয়েন্দা এবং মানুষের চরিত্র ধ্বংসে অভিজ্ঞ। যেসব খৃস্টান ও ইহুদী মেয়েকে মুসলিম অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র ধ্বংসের জন্য প্রেরিত করা হতো, তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন এই হারমান। মিশনের বেশক'টি মেয়েসহ তিনি আক্রায় অবস্থান করছিলেন এবং ধরা পড়ে গেলেন। তিনি নগরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আইউবীর এক গোয়েন্দা পিছু নিয়ে

তাকে ধরে ফেলে। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও গোয়েন্দা তাকে চিনে ফেলে। সঙ্গের মেয়েগুলোকে কৃষাণীর পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোয়েন্দা এক কমান্ডারকে বিষয়টা অবহিত করে।

কমান্ডার দু'তিনজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে হারমানের কাফেলাটি ঘিরে ফেলে। হারমান মেয়েদের ছাড়া সঙ্গে সোনা-দানাও নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মেয়েগুলোকে কমান্ডারের ও সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন এবং সোনাগুলোও তার সামনে রেখে দিয়ে বললেন– 'যার যে মেয়েকে পছন্দ হয় নিয়ে নাও। আর এই সোনাগুলোও ভাগ করে নাও।'

'আমার সব ক'টা মেয়েই পছন্দ হয়'- কমান্ডার বললো– 'আর সোনাগুলোও সব নিয়ে নেবো। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

কমান্ডার সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সোনাসহ সব ক'জনকে সুলতান আইউবীর ব্যক্তিগত আমলার হাতে তুলে দেয়। হারমান সুলতান আইউবীর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কয়েদি। তাকে সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

'তুমি আমার ভাষা জানো'– সুলতান আইউবী হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তাই আমার ভাষায় কথা বলো। আমি তোমার বিদ্যা ও বিচক্ষণতার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি তোমার যতোটুকু কদর করতে পারবো, ততোটুকু তোমার সম্রাটরা পারেনি। আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলা ছাড়া আমার হত্যার আদেশ প্রদান করেন, তবেই ভালো হবে'– হারমান বললেন– 'আমাকে যদি আক্রার সেনাপতি-কমান্ডারদের ন্যায় খুনই হতে হয় এবং আমার মৃতদেহটা মাছের আহারে পরিণত হতেই হয়, তাহলে কথা বলে লাভ কী?'

'তোমাকে হত্যা করা হবে না হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি যাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তার সঙ্গে কথা বলি না।'

সুলতান আইউবী দারোয়ানকে ডেকে হারমানকে শরবত পান করাতে বললেন। হারমানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আরবের রীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, আরবী মেজবান যদি দুশমনকে পানি বা শরবত পান করতে দেয়, তো তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি অন্তর থেকে শত্রুতা দূর করে ফেলেছেন এবং তার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। দারোয়ার শরবত এনে দিলে হারমান তা পান করেন।

'আপনি বোধ হয় জানতে চাইবেন, আমাদের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে'– হারমান বললেন– 'আপনি এ-ও জানতে চাইবেন, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা কীরূপ?'

'না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'এ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে। আমার গোয়েন্দারা তোমাদের বুকের উপর বসে থাকে। তাছাড়া তোমাদের কোন্ অঞ্চলে কতো সৈন্য আছে, তা আমার জানবার গরজও নেই। হিত্তীনে তোমাদের সৈন্য কম ছিলো না। কম ছিলো আমার। এখন আরো কমে গেছে। কোনো বাহিনীই এখন আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না। তুমি সংবাদ শুনবে, সালাহুদ্দীন আইউবী মারা গেছেন– পিছপা হননি।'

'যে কমান্ডার আমাকে ধরে এনেছে, আপনার সকল কমান্ডারের চরিত্র যদি তার মতো হয়, তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলবো, যতো বৃহৎই হোক কোনো শক্তিই আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না'– হারমান বললেন– 'আমি তাকে যে মেয়েদের পেশ করেছিলাম, তারা আপনার পাথরসম সালার ও দুর্গপতিদের মোমে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে ক্রুসেডারদের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে। আর সোনা এমন এক বস্তু, যার চমক চক্ষুকে নয়– বিবেককেও অন্ধ কে তোলে। আমি সোনাকে শয়তানের সৃষ্টি বলে থাকি। অথচ আপনার কমান্ডার সোনাগুলোর প্রতি চোখ তুলেও তাকালো না। আমার দৃষ্টি সব সময় মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতাগুলোর উপর নিবদ্ধ থাকে। ভোগ-বিলাসিতা ঈমানকে খেয়ে ফেলে। আপনার বিরুদ্ধে আমি এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করেছিলাম। কোনো সেনা অধিনায়কের মধ্যে যখন এসব দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, তখন পরাজয় তার কপালের লিখন হয়ে যায়। আমি আপনার বলয়ে যে ক'জন গাদ্দার জন্ম দিয়েছি, তাদের মধ্যে প্রথমে এই দুর্বলতাগুলোই সৃষ্টি করেছি। ক্ষমতার নেশা মানুষকেসহ ডুবে মরে থাকে।'

'আমার বাহিনীর চরিত্র সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আপনার বাহিনীর চরিত্র যদি তেমন হতো, যেমনটি আমি তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম, তাহলে আপনার বাহিনী আজ এখানে থাকতো না'– হারমান বললেন– 'আপনি যদি দুশ্চরিত্র আমীর, সালার, শাসক ও উজিরদের উৎখাত না করতেন, তাহলে তারা সেই কবে আপনাকে

আমাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতো। আমি আপনার প্রশংসা করছি যে, আপনি অন্তরে ক্ষমতার মোহ স্থান দেননি।'

'হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমাকে জীবনদান করেছি। তোমাকে আমার বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছি। বলো, আমার বাহিনীর চরিত্রকে আমি কীভাবে অটুট ও উচ্চ রাখতে পারি। আর আমার মৃত্যুর পর এই চরিত্র কীভাবে অটুট থাকতে পারে।'

'মহামান্য সুলতান!'– আমরা এই যে যুদ্ধ লড়ছি, এটা আমার-আপনার কিংবা আমাদের সম্রাটদের আর আপনার যুদ্ধ নয়। এটা কালিমা ও কাবার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আমাদের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে। আমরা রণাঙ্গনে লড়বো না। আমরা কোন দেশ জয় করবো না। আমরা মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্ক জয় করবো। আমরা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ড অবরোধ করবো না– অবরোধ করবো মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা। আমাদের এই মেয়েরা, আমাদের ধন-ঐশ্বর্য ও আমাদের সভ্যতার আকর্ষণ– আপনি যাকে বেহায়াপনা বলেন– ইসলামের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দেবে। তারপর মুসলমানরা আপন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করবে আর ইউরোপের রীতি-নীতিকে ভালোবাসবে। সেই সময়টা আপনি দেখবেন না। আমিও দেখবো না। আমাদের আত্মারা দেখবে।'

সুলতান আইউবী জার্মান বংশোদ্ভূত খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হারমানের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন। হারমান বলছেন–

'আমরা পারস্য, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের উপর কেনো দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিনি। কেনো আমরা আরবকে যুদ্ধক্ষেত্র বানালাম? একমাত্র কারণ, সমগ্র পৃথবীর মুসলমান এই ভূখণ্ডটার প্রতি মুখ করে ইবাদত করে এবং এখানে মুসলমানদের কাবা অবস্থিত। আমরা মুসলমানদের এই কেন্দ্রটা ধ্বংস করছি। আপনার বিশ্বাস, আপনার রাসূল মসজিদে আকসা থেকে 'আকাশ ভ্রমণে' গিয়েছিলেন। আমরা তার মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করেছি এবং সেখানকার মুসলমানদের বুঝাচ্ছি, তোমাদের বিশ্বাস ভুল যে, তোমাদের রাসূল কখনো এখানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন।'

'হারমান!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রত্যয়-পরিকল্পনার প্রশংসা করছি। নিজ ধর্মের প্রতি এমনই অনুগত ও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত, যেমন তুমি হয়েছো। সে জাতিই জীবিত থাকে,

যারা আপন ধর্ম ও সভ্যতা লালন ও সংরক্ষণ করে এবং তার আশপাশে এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্থাপন করে রাখে, যাতে কোনো মিথ্যা ধর্ম-কালচার তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে। আমি জানি, ইহুদীরা আমাদের এখানে আমাদের চরিত্র-চেতনা ধ্বংসের মিশন নিয়ে কাজ করছে এবং তোমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি- সেই লক্ষ্যে যাচ্ছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছিলে। এটা আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি। আমার রাসূলকে আল্লাহ পাক এখান থেকে মেরাজের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। আমি তাকে ক্রুশের দখল থেকে মুক্ত করবো।'

'তারপর কী হবে?'- হারমান বললেন- 'তারপর আপনি এই জগত থেকে চলে যাবেন। মসজিদে আকসা পুনরায় আমাদের উপাসনালয়ে পরিণত হবে। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করছি, আপনার জাতির স্বভাব-চরিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই করছি। আমরা আপনার জাতিকে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত করে তাদেরকে একে অপরের শত্রু বানিয়ে দেবো। তারপর ফিলিস্তীনের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবো। ইহুদীরা আপনার জাতির যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌন পূজার বীজ বপণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এখন আর কোনো নুরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইউবী জন্ম নেবে না।'

সুলতান আইউবী মুচকি হাসি হেসে হারমানের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন- 'তোমার কথাগুলো অনেক মূল্যবান। আমি তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে তোমাকে সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে।'

'আর আমার সঙ্গের মেয়েগুলো?'

সুলতান আইউবী গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর বললেন- 'আমি নারীদের যুদ্ধবন্দি বানাই না। তোমার মেয়েগুলোকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিতে পারি।'

'মহামান্য সুলতান!'- হারমান বললেন- 'এরা অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। এক নজর দেখলে আপনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন না, বন্দিশালায়ও নিক্ষেপ করতে পারবেন না। আপনার ধর্মে দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। দাসীদেরকে হেরেমে রাখা যায়।'

'আমার ধর্ম এই বিলাসিতার অনুমতি দেয় না'- সুলতান আইউবী বললেন- 'আমি নিজের ঘরে কিংবা কোনো মুসলমানের ঘরে সাপ পুষতে পারি না।'

'কিন্তু তাদের তো কোনো অপরাধ নেই'– হারমান বললেন– 'এ কাজের জন্য তাদেরকে শৈশব থেকেই প্রস্তুত করে নেয়া হয়েছিলো।'

'এ কারণেই আমি তাদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছি না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আমি তোমার এই ভাবনার প্রশংসা করছি যে, তুমি এই মধুর বিষ আমার জাতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছো। কিন্তু আমি তোমার ন্যায় ভাবনা ভাবতে পারি না। ওদের বলে দাও, আক্রা থেকে বেরিয়ে যাক। আমার আওতার ভেতরে কোথাও তাদের কাউকে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে।

সুলতান আইউবী দু'-তিন দিনের মধ্যে আক্রায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। মসজিদগুলোকে পাক-পরিষ্কার করিয়ে নামাযের উপযোগী করে তোলেন। গনীমতের সম্পদ যা হাতে এসেছে, তার সিংহভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এতোদিন যারা খৃষ্টানদের কারাগারে আবদ্ধ ছিলো, একটা অংশ তাদেরকে দান করেন। কিন্তু সুলতানের সব ভাবনা-চিন্তা ফিলিস্তীনের মানচিত্রটার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর অঙুলি লেবানন ও ইসরাইলের কূল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলছে। তাঁর মন-মস্তিষ্কের উপর বাইতুল মুকাদ্দাস চেপে বসে আছে। এদিক-ওদিককার কোনো খবর তাঁর নেই। বাহিনীর কোন্ ইউনিট কোথায় অবস্থান করছে, তাঁর জানা আছে। কমান্ডো সেনাদের বণ্টন-বিন্যাস বেশ উন্নত ও যুৎসই ছিলো। প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে তাঁর যথারীতি যোগাযোগ আছে।

'সুলতানে আলী মাকাম!' সুলতান আইউবী হাসান ইবনে আবদুল্লাহর কণ্ঠ শুনতে পান।

'হাসান!'– মানচিত্র থেকে চোখ না সরিয়েই সুলতান আইউবী বললেন– যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমার হাতে সময় নেই যে, প্রতিটি কথা রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে শুনবো, বলবো। আর আমার 'মাকাম' সেদিন উচ্চ হবে, যেদিন আমি বিজয়ী বেশে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করবো।'

'ত্রিপোলী থেকে খবর এসেছে, রেমন্ড মারা গেছে।'

'আহত ছিলো?'

'না সুলতান!'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ উত্তর দেন– 'লোকটা অক্ষত এবং সুস্থই ত্রিপোলী পৌঁছে গিয়েছিলো। পরদিন নিজ কক্ষে তার লাশ পাওয়া গেছে। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।'

'লোকটা অতোটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আগেও কয়েকবার পরাজয়বরণ করে ময়দান থেকে পালিয়েছিলো। যাক গে, আমি তার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছি। লোকটা আমাকে হত্যা করার জন্য হাশিশিদের দ্বারা তিনবার আক্রমণ করিয়েছিলো।'

ঐতিহাসিকগণ রেমন্ড অব ত্রিপোলীর মৃত্যুর নানা কারণ উল্লেখ করেছেন। কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ ফুসফুসের ব্যাধি লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাশিশিরা তাকে বিষ খাইয়েছিলো। রেমন্ড অসচ্চরিত্র এবং কুটিল মনের খৃস্টান শাসক ছিলেন। মুসলমানদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়ানোর হীন কারসাজিতে তারও হাত ছিলো। খৃস্টান শাসকদের মাঝেও পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তার সখ্য ছিলো হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়ীদের সঙ্গে। সুলতান আইউবীর উপর একাধিক সংহারী আক্রমণ করিয়েছিলেন। এক-দু'জন খৃস্টান সম্রাটকেও ফেদায়ীদের দ্বারা হত্যা করাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। সে যুগের কাহিনীকারদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, রেমন্ড জোটের শরীক সম্রাটদের সঙ্গে বড় ক্রুশে হাত রেখে শপথ করে পরে হিত্তীনের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিপোলী পৌঁছার পরদিনই তাকে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। জীবনের শেষ রাতে হাশিশিদের নেতা শেখ সান্নান তার নিকট গিয়েছিলো।

তার আগে অপর খ্যাতিমান খৃস্টান সম্রাট বল্ডউইন মৃত্যুবরণ করেন। এই লোকটি ফিরিঙ্গিদের যুদ্ধবাজ সম্রাট ছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের তত্ত্বাবধান তার দায়িত্বে ছিলো। বল্ডউইন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে চাচ্ছেন। তাই বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার বাহিনীকে নিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ঘুরে-ফিরে যুদ্ধ করতে থাকেন। এটা তার যোগ্যতার প্রমাণ যে, তিনি ইয্যুদ্দীন, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগীনকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের এই রণময়দানকে যুদ্ধ সরঞ্জাম, মদ, সোনা-মাণিক্য ও সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা সুসংগঠিত করতে থাকেন। বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন। হিত্তীন যুদ্ধের দিন কয়েক আগে মারা যান। তার স্থলে গাই অফ লুজিনান বাইতুল মুকাদ্দাসের ক্ষমতা হাতে নেন।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইঊবীর সৈনিকরা যে ধরনের গেরিলা ও কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছিলো, ইতিহাস আজও তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। গেরিলারা শত্রু অঞ্চলে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে; কিন্তু কোনো ভূ-খণ্ড দখল করতে পারে না। ভূখণ্ড দখল করে সেনাবাহিনী। সুলতান আইউবী তাঁর গেরিলা ও ফৌজকে যে পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন, তা হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চল থেকে খৃস্টান বাহিনীকে উৎখাত ও ধ্বংস করা, উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের দুর্গগুলো জয় করা এবং দুশমনের যেসব অস্ত্র ও রসদ হস্তগত হবে, সেগুলো নিরাপদ স্থানে এনে জমা করা।

সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়ে রেখেছিলেন। এটাই ছিলো তার আসল শক্তি। সুলতান তাঁর সালারদের বলে রেখেছেন, যখন যে নগরী কিংবা পল্লী জয় করবে, সৈনিকদেরকে সেখানকার নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ চিত্র দেখাবে। তাদেরকে সেইসব মসজিদ দেখাবে, যেগুলোকে খৃস্টানরা বিরান ও অবমাননা করেছে। তাদেরকে সেই মুসলিম নারীদের দেখাবে, খৃস্টানদের হাতে যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছিলো, তাদেরকে ভালোভাবে দেখাও, আমাদের শত্রু কীরূপ এবং তাদের পরিকল্পনা কী।

এ কারণেই সুলতান আইউবীর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সেনাদল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শত্রু সেনাদলের উপর গজব হয়ে আপতিত হতো। সুলতান আইউবী যা যা দেখাতে চেয়েছিলেন, সৈনিকরা সব দেখে নিয়েছিলো। সে ছিলো এক উন্মাদনা। এখন সুলতান প্রতিনিয়ত একটিই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন– 'অমুক অঞ্চল দখল হয়ে গেছে। অমুক ক্যাম্প থেকে খৃস্টানরা পিছু হটে গেছে ইত্যাদি। আইউবীর বাহিনীর অবিশ্রাম ও অবিরাম যুদ্ধ করছে আর সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একদিনের এক ঘটনায় সুলতান আইউবীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

সুলতান কক্ষে বসে মানচিত্রের উপর ঝুঁকে বসে হাইকমান্ডের সালার ও উপদেষ্টাদের দ্বারা পরবর্তী পরিকল্পনা প্রস্তুব করাচ্ছেন। হঠাৎ বাইরে শোর ওঠে– 'আমি তোমাদের সুলতানকে হত্যা করবো, তোমরা ক্রুসেডারদের তাবেদার... আমাকে ছেড়ে দাও। নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার।' কণ্ঠটা একই ব্যক্তির। সেই সঙ্গে আরো কিছু মানুষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে–

'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও... সুলতান রুষ্ট হবেন... মেরে ফেলো বেটাকে... মুখে পানি ছিটাও... পাগল হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবী দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ধারণা ছিলো, কোনো খৃস্টান সৈনিক হবে হয়তো। কিন্তু এসে দেখেন তারই ফৌজের এক কমান্ডার, যার হাত দুটো রক্তে লাল হয়ে গেছে। গায়ের কাপড়-চোপড়ও রক্তে ভেজা। চোখ দুটোও রক্তের ন্যায় লাল। ঠোঁটের দু'কোণ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। চারজন লোক তাকে ঝাঁপটে ধরে আছে। তারপরও আটকে রাখতে পারছে না।

'এই ওকে ছেড়ে দাও।' সুলতান আইউবী গর্জে ওঠে বললেন।

'সুলতান!'– কমান্ডার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– 'এখানে এসে তোমার সকল সৈন্য আত্মমর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। কাফেররা কেনো জীবিত বেরিয়ে যাচ্ছে? তুমি আমাদের সুলতান সেজে বসে আছো! যেসব মুসলিম নারী ও শিশু কারাগারে পড়ে ছিলো, তুমি কি তাদেরকে দেখেছো?'

সুলতান আইউবীর রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ছুটে গিয়ে উক্ত কমান্ডারের মুখে হাত চেপে ধরে। সে কমান্ডারের বাহু ধরে এতো জোরে ধাক্কা মারে যে, লোকটা তার কাঁধের উপর হয়ে সুলতান আইউবীর সম্মুখে গিয়ে পড়ে।

'বাঁধা দিও না– ওকে বলতে দাও'– সুলতান আইউবী পুনরায় গর্জে ওঠে বললেন– 'এদিকে আসো বন্ধু! আমাকে বলো, তারা তোমাকে কেনো ধরে রেখেছে?'

তথ্য বের হয়, লোকটা এক বাহিনীর কমান্ডার ছিলো। তাকে সদ্য কারামুক্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি রিলিফ পৌঁছানোর এবং রুগ্নদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। এ কাজের জন্য একশত সৈনিকের দু'টি বাহিনী তৈরি করা হয়েছিলো। এই কমান্ডার মজলুম মুসলমানদের ঘরে ঘরে যেতে থাকে। সেই সূত্রে খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর কীরূপ নির্যাতন করেছিলো, তার বিবরণ জানতে পারে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর কাহিনী। কমান্ডার তার বাহিনীর সৈনিকদেরকে কার্কের মসজিদগুলো পরিষ্কার করতে দেখে। এক মসজিদ থেকে দু'জন নারীর বিবস্ত্র গলিত লাশ উদ্ধার হয়। এই কমান্ডার তা-ও নিজ চোখে দেখতে পায়।

সৈনিকরা লাশ দুটো মসজিদ থেকে বের করে আনে। তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। একজন বললো– 'ওরা আমাদের বোন-

কন্যাদের সঙ্গে এরূপ অমানুষিক আচরণ করলো আর আমাদের সুলতান কিনা তাদেরকে পরিবার-পরিজনসহ এখান থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন!'

কমান্ডারের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর সে পনের-বিশটি মেয়েকে যেতে দেখে। তার এক সহকর্মী কমান্ডার কয়েকজন সৈনিকসহ তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কমান্ডার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে- 'এরা কারা, তোমরা এদের সঙ্গে হাঁটছো কেনো?'

'এরা সেই মেয়ে, যারা মিসর ও সিরিয়ায় গাদ্দার তৈরি করেছিলো'- সঙ্গী উত্তর দেয়- 'এদের নেতা হারমান ধরা পড়েছে। সবাই খৃস্টান। সুলতান এদের নেতাকে কারাগারে আটক করে এদের ব্যাপারে আদেশ করেছেন, নগরী থেকে বের করে দূরে কোথাও সেই খৃস্টানদের হাতে তুলে দিতে, যারা আক্রা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'আর তোমরা এদেরকে জীবিত রেখে আসবে?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আদেশ তো এমনই পেয়েছি।'

'এরা কি আমাদের সেই বোনদের চেয়েও বেশি পবিত্র, যাদের উলঙ্গ লাশ মসজিদ থেকে উদ্ধার হচ্ছে এবং যাদেরকে কারাগারে আটক রেখে নিগৃহীত করা হয়েছিলো?'

সঙ্গী কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো- 'আমি তো হুকুমের পাবন্দ।'

কমান্ডার দাঁড়িয়ে যায় এবং কাফেলার গমন দেখতে থাকে। হঠাৎ তরবারী বের করে তাদের দিকে ছুটে যায়। সে চীৎকার করে বলে ওঠে- 'আমি কারো অনুগত নই।' সে এতো তীব্রগতিতে তরবারী চালায় যে, মুহূর্ত মধ্যে তিন-চারটি মেয়ের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রক্ষী কমান্ডার তাকে ধরার জন্য ছুটে যায়। মেয়েরা চীৎকার করে করে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ধাওয়া করে করে কমান্ডার আরো তিন-চারটি মেয়েকে হত্যা করে ফেলে। এক সৈনিক তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে বর্শার ন্যায় তরবারীটা তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আর কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

এই মানসিক অবস্থা নিয়েই কমান্ডার নগরী থেকে বেরিয়ে যায়। সে কয়েকজন খৃস্টানকে শহর ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। সামনে যাকে পেলো হত্যা করে ফেললো এবং তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকে- 'আমি আত্মমর্যাদাহীন নই- আল্লাহু আকবার।'

কমান্ডারের ডাক-চীৎকার শুনে কয়েকজন সৈনিক এগিয়ে আসে। তারা সকলে মিলে ঘেরাও করে কমান্ডারকে ধরে ফেলে। তাকে টেনে-হেঁচড়ে সুলতান আইউবী যে ভবনে অবস্থান করছিলেন, তার নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। একজন বললো, একে সুলতানের আমলাদের হাতে তুলে দাও। ব্যবস্থা যা নেয়ার তারাই নেবেন। অপরাধ গুরুতর- সুলতানের আদেশ লংঘন। সুলতান নিরস্ত্র নাগরিকের উপর হাত তুলতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কমান্ডার চীৎকার করতে থাকে। তার চীৎকার শুনে সুলতান আইউবী বাইরে বেরিয়ে আসেন।

সুলতান ঘটনাটা বিস্তারিত শোনেন। বিক্ষুব্ধ কমান্ডারের অভিযোগ-অনুযোগও ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন। সকলে আশঙ্কা করেছিলো, সুলতান তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু না, সুলতান লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে যান। তাকে শরবত পান করান এবং বুঝিয়ে দেন, আমাদের উদ্দেশ্য খৃস্টানদের হত্যা করা নয়। আমাদের লক্ষ্য প্রথম কেবলাকে মুক্ত করে এই পুণ্যভূমি থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করা।

কমান্ডারের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। সুলতান তাকে ডাক্তারের হাতে অর্পণ করেন।

'সৈনিকদের এতো আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়'- সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের বললেন- 'কিন্তু ঈমান উন্মাদনার পরিসীমা পর্যন্ত পোক্ত হওয়া দরকার। আমাদের এই কমান্ডার হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমান যদি আপন দীনের শত্রুদের দেখে উন্মাদ হয়ে যায়, তাহলে ইসলামের পতাকা সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে গিয়ে এই ভূখণ্ডের পরিসীমা সমাপ্ত হয়েছে।'

হারমানের যে মেয়েরা এই কমান্ডারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তাদের দু'জন সমুদ্রের কূলে পৌঁছে যায়। সমুদ্র দূরে ছিলো না। তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। তারা আশ্রয় সন্ধান করছে। তারা এক স্থানে চুপচাপ বসে পড়ে। খানিক পর একখানা নৌকা কূলে এসে ভিড়ে। মাল্লা দু'জন। তৃতীয়জন অফিসার গোছের লোক। ইনি সুলতান আইউবীর নৌ-বাহিনীর অফিসার আল-ফারেস বায়দারীন। নৌ-বাহিনীর প্রধান হলেন আবদুল মুহসিন। তার পরবর্তী পদের আমীর হলেন হুসামুদ্দীন লুলু।

সুলতান আইউবীর আদেশে নৌবহর- যার হেডকোয়ার্টার

আলেকজান্দ্রিয়ায়– রোম উপসাগরে টহল দিচ্ছিলো, ইউরোপের খৃস্টানদের জন্য যদি সেনা সাহায্য, রসদ-সরঞ্জাম ইত্যাদি আসে, তাহলে তাদের জাহাজগুলোকে পথেই যেনো প্রতিহত করা হয়।

হুসামুদ্দীন লুলু ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান আইউবী যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করতে চাচ্ছিলেন, তাই মিসরী নৌ-বহরকে নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেনো ছয়টি সামুদ্রিক জাহাজ কূলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এগুলো যুদ্ধজাহাজ, যাতে মিনজানিক ছাড়াও অভিজ্ঞ তীরন্দাজ এবং লড়াকু সৈনিক ছিলো।

নৌবাহিনী প্রধান আবদুল মহসিন আল-ফারেসকে কমান্ডার নিযুক্ত করে ছয়টি জাহাজ প্রেরণ করেন। আল-ফারেস তারই একটি জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় করে কূলে চলে আসেন। তিনি নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সুলতান আইউবীর নিকট যাচ্ছিলেন। কূলে অবতরণ করে তিনি কৃষাণীর পোশাক পরিহিত দু'টি মেয়েকে দেখতে পান। আল-ফারেস তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? এখানে কী করছো? তারা উত্তয় দেয়, আমরা যাযাবর গোত্রের মেয়ে, যুদ্ধের কবলে পড়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছি। আমাদের বহু পুরুষ মারা গেছে। অন্যরা এদকি-ওদিক পালিয়ে গেছে।

'আর আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি'– এক মেয়ে বললো– 'খৃস্টানদের এই জন্য ভয় করি, তারা আমাদের মুসলমান মনে করে আর মুসলমানরা মনে করে খৃস্টান। আমরা এখন নিরুপায়-নিরাশ্রয়।'

'তোমরা মুসলমান না খৃস্টান?'

'আমাদের যিনি মালিক হবেন, তার ধর্ম যা, আমাদের ধর্মও তা-ই হবে'– অপর মেয়ে বললো– 'আমাদেরকে কারো না কারো হাতে বিক্রি হতেই হবে।'

আল-ফারেস নৌযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং অস্বাভাবিক সাহসী কমান্ডার। তদুপরি তিনি খোশ মেজাজের প্রাণবন্ত পুরুষ। এসব গুণের কারণে তিনি সকলের প্রিয়ভাজন। সেকালে তার মতো একজন পুরুষ একসঙ্গে দু'তিনটি করে স্ত্রী রাখতো। কিন্তু তিনি এখনো বিয়েই করেননি। সময়টা ছিলো যুদ্ধ-বিগ্রহের। আল-ফারেসকে মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতে হচ্ছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থল চোখে দেখাই কপালে জুটছে না। প্রতিটি নৌ-জাহাজের কাপ্তান স্ত্রীকে সঙ্গে রাখছে।

মেয়েগুলোর রূপ-যৌবন আল-ফারেসকে এতোটা প্রভাবিত ও

বিমোহিত করে তোলে যে, তার ভেতরে অনুভূতি জাগ্রত হয়ে যায়, তিনি আজ তিনটি মাসেরও বেশি সময় সমুদ্রে ঘুরে ফিরছেন। তিনি মেয়েদের বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে জাহাজে রাখতে পারি।

'আমরা অসহায় অবলা নারী। আশা রাখি, আমরা প্রতারণার শিকার হবো না।'

'আমি তোমাদেরকে বিক্রি করবো না'– আল-ফারেস বললেন– 'মিসর নিয়ে যাবো এবং দু'জনকেই বিয়ে করে নেবো।'

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। চোখে চোখে কথা বলে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তারা আল-ফারেসের আশ্রয় গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

আল-ফারেস মেয়ে দুটোকে নৌকার মাল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এদেরকে আমার জাহাজে নিয়ে আমার কক্ষে খাবার খাওয়ায়। পরে এদের ওখানেই রেখে ফিরে এসে আমার অপেক্ষা করো।'

মেয়ে দুটোকে নৌকায় তুলে দিয়ে আল-ফারেস প্রেমের গান গাইতে গাইতে আক্রা অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

'আল-ফারেস!'– সুলতান আইউবী আর-ফারেসকে বললেন– 'আমি তোমার নাম জানি। তোমার দু'-তিনটি সামুদ্রিক অভিযানের কীর্তির কথাও শুনেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আগে তুমি একাকি ছোট-খাট অভিযান পরিচালনা করতে। এখন বড় মাপের বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে সকল বড় বড় বন্দর এলাকা দখল করতে হবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোকে দখলে নিতে হবে। এই উপকূলীয় শহরগুলোর মধ্যে টায়ের ও আসকালান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দূতদের মাধ্যমে হবে। তোমার দু'-তিনটি নৌকা সবসময় কূলে ভেড়ানো থাকতে হবে। আমি স্থলপথে যেখানেই যাবো, তোমাকে অবহিত রাখবো। তোমার জাহাজ সমুদ্রে টহল দিতে থাকবে। তোমার জাহাজগুলোতে অস্ত্র ও রসদের ঘাটতি নেই তো?'

'আমরা সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।' আল-ফারেস উত্তর দেন।

'বৃহৎ যুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ক্রুসেডাররা হিত্তীনে যে পরাজয় বরণ করেছে এবং যেরূপ শোচনীয়ভাবে

পলায়ন করেছে, তা খৃষ্টজগতের জন্য এক অসাধারণ ঘটনা। তাদের চার-চারজন সম্রাট আমার হাতে বন্দি। একজনকে আমি হত্যা করেছি। রেমন্ড মরে গেছে। তাদের অতিশয় যোগ্য ও দুঃসাহসী সম্রাট বল্ডউইনও মারা গেছে। তার ফিরিঙ্গিরা বিশাল এক শক্তি। কায়রো থেকে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ প্রেরণ করেছে, ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড এবং জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক ফিলিস্তীনে ক্রুশের রাজত্ব অটুট রাখার লক্ষ্যে নিজ নিজ বাহিনী ও নৌ-বহরসহ আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তারা আসলে পরে সিদ্ধান্ত নেবো, তাদেরকে ডাঙ্গায় আসতে দেবো, নাকি নদীতেই প্রতিহত করার চেষ্টা করবো। শুনেছি, ইংল্যান্ডের নৌ-বাহিনী নাকি অনেক শক্তিশালী। সংবাদ পেয়েছি, তারা বারুদ প্রস্তুত করে এমন খোলসে ভরে নিয়েছে, যেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলে উড়ে এসে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি এ জাতীয় খোলস সংগ্রহ করে এরূপ অস্ত্র তৈরি করে নেয়ার চেষ্টা করবো। যা হোক, তুমি তোমার জাহাজগুলোকে কূলের কাছাকাছি রাখবে। নৌ-বাহিনী প্রধান আবদুল মুহসিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে।'

আল-ফারেস প্রয়োজনীয় সব দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে বিদায় নিয়ে চলে যান। রেখে আসা নৌকা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নিজের জাহাজে পৌঁছে অন্যান্য জাহাজের কাপ্তানদের তলব করেন। তাদেরকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করে বিদায় করে দেন। নিজে আপন কেবিনে চলে যান, যেখানে আশ্রিতা মেয়ে দুটো তার অপেক্ষায় বসে আছে। অত্যন্ত সরল-সোজা সেজেছে মেয়েগুলো। কিছুই জানে না ভান ধরে জিজ্ঞেস করে, আপনারা সমুদ্রে কী করেন? আল-ফারেস অনেক দিন যাবত সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন-যাপন করছেন। আজ একটু হাসি-আনন্দের পরিবেশ পেয়েছেন। পুরুষদেরকে আঙুলের ইশারায় নাচানোর দীক্ষা মেয়ে দুটোর আছে।

১১৮৭ সালের ২০ জুলাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আক্রা ত্যাগ করেন। তাঁর গেরিলা সৈনিকরা তাঁর জন্য পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। সমুদ্রের কূলবর্তী কয়েকটি দুর্গ ও জনপদ তিনি জয় করে ফেলেছেন। ৩০ জুলাই তিনি বৈরুত অবরোধ করেন। খৃষ্টানরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটা রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সুলতান আইউবী পরম ত্যাগের বিনিময়ে নগরীটা দখল করে ফেলেন। আক্রার মুসলমানদের ন্যায় করুণ অবস্থা এখানকার মুসলমানদেরও।

২৯ জুলাই নাগাদ বৈরুতের শাসনক্ষমতা সুসংহত করে সুলতান আইউবী আরেক বিখ্যাত উপকূলীয় শহর টায়ের অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যতীত অগ্রযাত্রা করতেন না। তাঁকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজ অনেক বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এদিক-ওদিক পলায়নকরা খৃস্টান সৈন্যরা টায়েরে একত্রিত হয়ে সংগঠিত হচ্ছে। সকল ফিরিঙ্গিও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে পিছপা হয়ে টায়ের চলে গেছে। সুলতান আইউবী টায়ের আক্রমণ মুলতবী করে দেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য সৈন্যদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন।

এ সময়ে আল-ফারেস বায়দারীনের নৌ-জাহাজটি কূল থেকে দূরে দূরে টহল প্রদান করতে থাকে। মেয়ে দুটোও তার জাহাজে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে তারা আল-ফারেসের হৃদয়ে জেঁকে বসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল-ফারেস কর্তব্যে অবহেলা করছেন না। একটা নিয়ম আছে, যখনই কোনো রণতরী কূলে এসে নোঙ্গর ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট অনেক নৌকা তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। এগুলো গরীব পল্লীবাসীদের নৌকা। তারা নৌকায় করে এসে নানা রকম ফল-মূল, ডিম, মাখন ইত্যাদি মাল্লা ও সৈনিকদের নিকট বিক্রি করে থাকে। জাহাজের কাপ্তানরা তাদের কাউকে কাউকে রশির সিঁড়ি ফেলে জাহাজে তুলে নিয়ে তাদের থেকে স্থল জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করেন।

একদিন আল-ফারেসের জাহাজ কূলে এসে ভিড়ে। স্থল বাহিনীর কোনো এক কমান্ডারের সঙ্গে তার কথা বলার প্রয়োজন। মেয়ে দুটো ছাদের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট তিনটি নৌকা এগিয়ে আসে। সেগুলোতে ফল ইত্যাদি পণ্য দেখা যাচ্ছে। তাদের থেকে কিছু ক্রয় করার জন্য তারা জাহাজের লোকদের নিকট অনুনয় করতে শুরু করে। এক নৌকায় মাঝবয়সী এক বৃদ্ধ ছিলো। লোকটির গায়ে গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু নেই। নিতান্ত গরীব মনে হচ্ছে। সে দুটো মেয়েকে দণ্ডায়মান দেখে নৌকা জাহাজের একেবারে নিকটে নিয়ে আসে।

'কিছু নিন না শাহজাদী!'– লোকটি বিনয়ের সুরে বললো– 'আমরা নিতান্ত গরীব মানুষ। আপনাদের মতো লোকদের দয়ায়ই তো আমরা বাঁচি।'

মেয়েরা তার দিকে গভীর চোখে তাকালে সে বাঁ চোখে হাল্কা একটু ইঙ্গিত করে। উভয় মেয়ে খানিক বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকায়। লোকটি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটি আঙুল বুকের উপর

উপর-নীচ ও ডান-বাম করে ক্রুশের চিত্র আঁকে। এক মেয়ে নিজের ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তর্জনীর উপর আড়াআড়ি রেখে ক্রুশ তৈরি করে। বৃদ্ধ মুচকি হাসে। এক মেয়ে জাহাজের মাল্লাদের বললো, ঐ লোকটাকে উপরে তুলে আনো।

মাল্লাদের জানা আছে, এই মেয়ে দুটোর মালিক জাহাজের কাপ্তান, যিনি সবক'টি জাহাজের কমান্ডার। তারা সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ফেলে। বৃদ্ধ টুকরিতে বিভিন্ন পণ্য ভরে উপরে নিয়ে আসে এবং টুকরিটা মেয়েদের সম্মুখে রাখে। মেয়েরা নেড়ে-চেড়ে পণ্য দেখতে শুরু করে। অন্য কারো তাদের কাছে ঘেঁষবার সাহস নেই।

'তোমরা এখানে আসলে কীভাবে?' মাঝি জিজ্ঞেস করে।

'দৈবক্রমে'– এক মেয়ে উত্তর দেয়– 'হারমান ধরা পড়েছেন।' মেয়েটি লোকটাকে পূর্ণ ঘটনা শোনায় এবং আল-ফারেস সম্পর্কে জানায়, তিনি আমাদেরকে যাযাবর মনে করে আশ্রয় দিয়েছেন।

'কিছু ভেবেছো, কী করবে?'– মাঝি জিজ্ঞেস করে– 'যাবে কোথায়?'

'আপাতত জান বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছি'– মেয়েটি উত্তর দেয়– 'আমরা কমান্ডার আল-ফারেসের মন-মস্তিষ্ক কব্জা করে ফেলেছি। সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করবো। তবে তুমি দিক-নির্দেশনা দিলে এখানে থেকেই অন্য কিছু করতে পারি।'

গরীববেশী এই ব্যবসায়ী মাঝিটা ক্রুসেডারদের গুপ্তচর এবং মেয়েদেরকে ভালো করে জানে। মেয়েরাও তাকে বেশ চিনে। সে বললো, কূলে অবতরণ করে পালাবার চেষ্টা করো না। অন্যথায় শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। বৈরুত পর্যন্ত মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠি হয়ে গেছে। আমাদের খৃস্টান সৈনিরা প্রতিটি স্থান থেকে পিছু হটে যাচ্ছে। একটিমাত্র অঞ্চল টায়ের অবশিষ্ট আছে, যেখানে আমাদের আশ্রয় মিলতে পারে। এখনো এই জাহাজেই থাকো। আমি তোমাদের খোঁজ-খবর নেবো। পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক হয়ে ওঠেছে। সর্বত্র মুসলিম সৈনিকরা গিজ গিজ করছে।

'তুমি এখানে কী করছো?'

'ক্রুশের গায়ে হাত রেখে যে শপথ নিয়েছিলাম, তা পূর্ণ করার চেষ্টা করছি'– মাঝি উত্তর দেয়– 'এই ছয়টি রণতরীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছি। এগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা করবো।'

'নিজেদের তরী কোথায়?'

'টায়েরের নিকটে'– মাঝি উত্তর দেয়– 'এই বহর যদি সেদিকে রওনা হয়, তাহলে আগে-ভাগে সংবাদ বলে দেবো। ভাগ্যক্রমে তোমরা এখানে এসে পৌঁছে গেছো। এ কাজে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমিও তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে টায়ের পৌঁছিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে। সংকেত ঠিক করে নাও। আমি এই জাহাজগুলোর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় লাগা আছি। এই জাহজ যেখানেই নোঙ্গর ফেলবে, আমি এই বেশে সেখানে হাজির হয়ে যাবো।'

তারা সংকেত ঠিক করে নেয়। মেয়েরা লোকটির টুকরি থেকে কিছু জিন্সি নিয়ে দাম দিয়ে দেয়। লোকটি টুকরি মাথায় করে সিঁড়ি বেয়ে ডিঙ্গিতে নেমে পড়ে।

১১৮৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান আইউবী আরো একটি বিখ্যাত উপকূলীয় শহর আসকালান অবরোধ করেন। এখানেও ভারি পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক ব্যবহার করা হয়। সুরঙ্গ খননকারী বাহিনী রাতে প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে। নিকটেই একটি উঁচু জায়গা ছিলো। সেখান থেকে মিনজানিকের সাহায্যে শহরের ভেতরে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হয়। দ্বিতীয় দিনই অবরুদ্ধরা নগরীর ফটক খুলে দেয় এবং অস্ত্র সমর্পণ করে।

১১৫৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রিংক্ এই নগরীটা দখল করেছিলেন। পুরো চৌত্রিশ বছর পর শহরটি আবার স্বাধীন হলো।

আসকাল থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চল্লিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দূরত্বটা সুলতান আইউবীর দ্রুতগামী বাহিনী জন্য দু'দিনের পথ। তাঁর কোনো কোনো ইউনিট ও গেরিলা বাহিনী আগেই বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলো। তারা ক্রুসেডারদের বাইরের চৌকিগুলো ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে। জীবনে রক্ষাপাওয়া অবশিষ্ট খৃস্টান সৈন্যরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছাচ্ছে। সুলতান আইউবী তাঁর বিক্ষিপ্ত বাহিনীগুলোকে আসকালানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

সুলতান আইউবীর অব্যাহত জয় এবং ঝড়গতির অগ্রযাত্রার সংবাদ দামেশ্ক, বাগদাদ, হাল্ব, মসুল এবং ওদিকে কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি এসব আক্রমণ অভিযানে সুলতান আইউবীর সঙ্গে ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, লাগাতার জয়ের ফলে সুলতান আইউবীর বাহিনী ক্লান্তির কথা ভুলেই গিয়েছিলো। তারা একের পর এক অঞ্চল জয় করছিলো আর বিজিত অঞ্চলের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে অধিক থেকে অধিকতর উদগ্রীব হয়ে উঠছিলো। এ-ই তো ছিলো সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তি। কাজী বাহাউদ্দীন আরো লিখেছেন, আসকালানে সুলতান আইউবীর নিকট রূহানী শক্তিও পৌছুতে শুরু করেছিলো। তাঁরা হলেন দামেশ্‌ক, বাগদাদ ও অন্যান্য বড় বড় শহরের আলেম, দরবেশ ও সুফীগণ। তাঁরা সুলতান আইউবীর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করতে এসেছিলেন। তারা এসে সুলতান আইউবীকে দু'আ দেন এবং তাঁর বাহিনীকে বাইতুল মুকাদ্দাসের গুরুত্ব ও পবিত্রতা অবহিত করেন। মুসলিম বাহিনীকে উত্তেজিত করে তোলেন। সুলতান আইউবী আলেম-দরবেশদের বেশ শ্রদ্ধা করতেন। এবার তাদেরকে সঙ্গে পেয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন– 'এবার পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।'

আসকালান থেকে রওনা হওয়ার চার দিন আগে সুলতান আইউবীর নিকট হাল্‌ব থেকে একজন মেহমান আসেন, যাকে দেখে সুলতান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মেহমান নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিধবা রোজি খাতুন। রোজি খাতুন ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে সুলতান আইউবীকে জড়িয়ে ধরেন। দু'জনেরই আবেগ উথলে ওঠে। দু'জনই ভারাক্রান্ত হয়ে যান।

খানিক পর অনেকগুলো উটের দীর্ঘ এক সারি এসে দাঁড়িয়ে যায়। আরোহীরা শ' দুয়েক মেয়ে।

'এ কী?' সুলতান আইউবী পরম বিস্ময়ের সাথে রোজি খাতুনকে জিজ্ঞেস করেন।

'আহতদের সেবা-চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকটি মেয়ে'– রোজি খাতুন উত্তর দেন– 'আমি এদেরকে যুদ্ধেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। তীরন্দাজির বেশ অনুশীলন আছে। আমি জানি, তুমি মেয়েদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দেখতে চাও না। কিন্তু আমার ও এদের জয্‌বা বিনষ্ট করার চেষ্টা

করে না। তুমি জানো না, সিরিয়ায় তরুণীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কতো কষ্টকর হয়ে ওঠেছে। যে কোনো মেয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে যাওয়ার জন্য অস্থির-উদগ্রীব। তুমি অনুমতি দিলে আমি এক হাজার মেয়েকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেবো। তারা পুরুষ সৈনিকদের ন্যায় লড়াই করবে। এখানে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মায়েরা তাদের নিরাপত্তা নয়- জয়ের সংবাদ শুনতে অপেক্ষা করছে। লোকালয়ে একই কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে- 'সংবাদ কী?' বলো সালাহুদ্দীন কতো মেয়ে পাঠাবো?'

'আমি এদেরকে আমার সঙ্গে রেখে দেবো'- সুলতান আইউবী বললেন- 'আর কাউকে পাঠাবেন না।'

'উটের পিঠে করে আমি একটি মিম্বর এনেছি'- রোজি খাতুন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন- 'তোমার বোধ হয় মনে নেই, আমার মরহুম স্বামী নুরুদ্দীন জঙ্গী এই শপথ নিয়ে মিম্বরটি তৈরি করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করে এটি মসজিদে আকসায় স্থাপন করবেন। অনেক সুন্দর মিম্বর। দামেশ্‌কে রাখা ছিলো। আমি বহন করে এনেছি। আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন সালাহুদ্দীন। আমি দেখার অপেক্ষায় আছি, তুমি এই মিম্বরকে মসজিদে আকসায় স্থাপন করে আমার মরহুম স্বামীর শপথ পূরণ করেছো।'

সুলতান আইউবী আপ্লুত হয়ে ওঠেন। তাঁর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন- 'আল্লাহ যেনো এই শপথ আমার দ্বারা পূর্ণ করান।'

এক যুবতী মেয়ে সুলতানের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সুলতানকে সালাম করে। রোজি খাতুন বললেন- 'চেনোনি? আমার কন্যা শামসুন্নিসা।' সুলতান আইউবী মেয়েটাকে যখন দেখছিলেন, তখন ও অনেক ছোট ছিলো।

'শামসুন্নিসা তোমার সঙ্গে ময়দানে থাকবে'- রোজি খাতুন বললেন- 'মেয়ে সৈনিকরা তার কমান্ডে কাজ করবে। আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর নিকট যে আলেম-দরবেশগণ এসেছিলেন, তারা ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-অযীফা ও দু'আ-দরূদে নিমগ্ন। মাঝে-মধ্যে সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন এবং তাদের

জিহাদী চেতনাকে শাণিত করার চেষ্টা করছেন। আসকালানের বাইরে যেখানে সৈনিকরা ডিউটি করছে, তারা সে পর্যন্তও ঘুরে এসেছেন। তাদের ভাষণ-বক্তৃতার সারমর্ম মোটামুটি এরূপ–
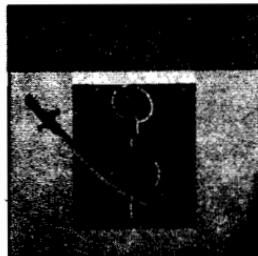
'নব্বই বছর যাবত কাফেররা তোমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে। কুরআন অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবে, প্রথম কেবলাকে কাফেরদের নাপাক কব্জা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো মুসলমানের ঘুম আসার কথা নয়। যে মসজিদে আকসা থেকে আমাদের প্রিয়নবী আল্লাহর আমন্ত্রণে মিরাজে গমন করেছিলেন, সেটি এখন কাফেরদের উপাসনালয়ে পরিণত। রাসূলে মকবুল (সা.)-এর পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অভিশম্পাত করছে। আহার-নিদ্রা, স্ত্রী সব আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু নব্বইটি বছর যাবত আমরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছি এবং ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত রয়েছি।'

'আল্লাহর সৈনিকগণ! ইহুদী-খৃস্টাদের সুদর্শন চক্রান্তজালে ফেঁসে আমাদের শাসকগণ তাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো, যারা প্রথম কেবলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে আমাদের প্রিয়নবীর মুবারক পা পড়েছিলো এবং তাঁর পবিত্র কপাল সিজদা করেছিলো। হযরত ইরবাহীম ও হযরত সুলায়মানসহ (আ.) না জানি কতো নবী-রাসূল এখানে ইবাদত করেছিলেন। কিন্তু নব্বইটি বছর যাবত এখানকার মুসলমানদের উপর যে বিভীষিকা চলছে, সেই চিত্র তোমরা নগরীতে প্রবেশ করে দেখে নিও। মসজিদে আকসার উপর ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদগুলা ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়ে আছে। মুসলমানদের এমন গণহত্যা হয়েছে যে, নগরীর অলি-গলিতে রক্তের নদী বইয়ে গেছে। মুসলমানরা বন্দিত্বের জীবন-যাপন করছে এবং মেয়েরা কাফেরদের দাসীতে পরিণত হয়ে আছে।'

'হে ইসলামের জানবাজ সৈনিকগণ! আল্লাহ তোমাদের বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত ও পবিত্র করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তোমাদের ভাগ্য প্রসন্ন যে, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর আমলে জন্ম নিয়েছো। তোমরা যদি ব্যর্থ হও, তাহলে সেখান থেকে তোমাদের লাশ তুলে আনা হবে। আর তোমরা শুনে বিস্মিত হবে, যে বাইতুল মুকাদ্দাসে হযরত ঈসা (আ.) প্রেমের পাঠ শিখিয়েছিলেন, সেখানে ক্রুসেডাররা

জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার মহড়া দিচ্ছে। শুনলে তোমাদের কান্না পাবে, আবেগ উথলে উঠবে, কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করলে খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসে উৎসবের আয়োজন করে থাকে। সেই উৎসবে তারা আমাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে বিবস্ত্র করে নাচায় এবং সুঠাম সুদেহী মুসলিম যুবকদের জবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খায়। আজ তোমাদেরকে প্রতিজন নিরপরাধ মজলুম মুসলমানের প্রতি ফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী মসজিদে আকসায় স্থাপন করার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। এখন তাঁর বিধবা সেটি এখানে এনে দিয়ে গেছেন। এই বিদূষী বীর মহিলা দু'শ' মেয়ে নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে পূরণ করতেই হবে।'

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মোতাবেক বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধের পরিকল্পনা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

সমুদ্রের নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবনে মেয়ে দুটো আল-ফারেসকে নব-জীবন দান করতে শুরু করেছে। কিন্তু একদিকে মেয়ে দুটো যেমন আল-ফারেসের জন্য রহস্যময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি আল-ফারেসও তাদের কাছে এক বিস্ময়কর পুরুষে পরিণত হয়েছেন। মেয়েরা বলেছিলো, তারা যাযাবর। তাদের গোত্রের সব মানুষ যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেছে এবং তারা অনেক কষ্টে লুকিয়ে লুকিয়ে নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আল-ফারেস দেখতে পাচ্ছেন, তাদের স্বভাব-চরিত্র, চলন-বলন ও রীতি-নীতি যাযাবরদের মতো নয়। যাযাবর মেয়েরা রূপসী হতে পারে; কিন্তু এদের মধ্যে যে রুচিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। তাছাড়া এদের মধ্যে যেটুকু অশ্লীলতা দেখা যাচ্ছে, যাযাবর মেয়েরা সাধারণত এমন বেহায়া হয় না।

মেয়েদের জন্য আল-ফারেস এক বিস্ময়কর পুরুষ। তাদের আশা ছিলো, তিনি তাদের সঙ্গে সেই আচরণই করবেন, যেমনটি অন্য পাঁচ-দশজন মুসলমান করেছিলো। ফলে মেয়ে দুটো প্রথম প্রথম নিরাশই হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা আল-ফারেসের অন্য একটি দুর্বলতা আন্দাজ করে নেয়। তা হচ্ছে, লোকটা দায়িত্বের ক্ষেত্রে যতোটা কর্তব্যপরায়ণ, অবসরে ততোটা অবোধ শিশুতে পরিণত হয়ে যান। তিনি মেয়েদের সঙ্গে সমবয়সী বান্ধবীর ন্যায় খেলতে শুরু করেন এবং তাদের রূপ-লাবণ্য থেকে স্বাদ উপভোগ করেন। তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলে বিলি কাটেন, তাদের মাঝে হারিয়ে গিয়ে দুনিয়ার কথা ভুলে যান।

একদিনের ঘটনা। এক মেয়ে আর আল-ফারেস কক্ষে উপবিষ্ট। অপরজন বাইরে কোথাও গেছে। মেয়েটি আল-ফারেসের চেতনাকে উত্তেজিত করতে কিংবা লোকটার মধ্যে চেতনা বলতে কিছু আছে কিনা, জানবার চেষ্টা করে। আল-ফারেস তার খোঁচাটা বুঝে ফেলে বললেন–

'প্রথম দিন যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি জাহাজে তোমাদেরকে আশ্রয় দিতে পারি, তখন তোমরা বলেছিলে, দয়া করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে মিসর নিয়ে যাবো এবং বিয়ে করবো। আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকতে চাই। বিবাহ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করবো না, যা থেকে তোমাদের মনে সন্দেহ জাগ্রত হবে। আমি সাময়িকভাবে মনোরঞ্জনের জন্য তোমাদেরকে এখানে এনেছি। আমি তোমাদের অসহায়ত্ব থেকে লাভবান হতে চাই না। মিসর রওনা হওয়া পর্যন্ত তোমরা চিন্তা করো। যদি আমার সঙ্গে থাকা পছন্দ না করো, তাহলে যেখানে বলবে পৌঁছিয়ে দেবো।'

সহসা মেয়েটি আবেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আল-ফারেসের গলা জড়িয়ে ধরে এবং তার গালে নিজ গালের পরশ বুলিয়ে বলে ওঠে– 'আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তোমাকেই প্রথম পুরুষ পেলাম, যার হৃদয়ে মানবতার পবিত্রতা আছে এবং যার মনোজগত শয়তানি চরিত্র ও পশুত্ব থেকে মুক্ত।'

মেয়েটি এমন ভাষায় ও এমন ধারায় প্রেম নিবেদন করে যে, পানির উপর সন্তরমান জাহাজটা আল-ফারেসের নিকট শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। এটিই তার দুর্বলতা, যা মানবীয় স্বভাবের সবচে' বেশি বিপজ্জনক দোষ। দীর্ঘ সময় দিনরাত সমুদ্রে টহল দান এবং মাঝে-মধ্যে ছোটখাটো সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার দেহে যে ক্লান্তি ও হৃদয়ে যে অবসাদ নেমে এসেছিলো, এক রূপসী যুবতীর দেহের পরশ ও প্রেম নিবেদনে সব দূর হয়ে গেছে। আল-ফারেসের দেহ-মন এখন চাঙ্গা ও ঝরঝরে। এখন দায়িত্ব তার আগের তুলনায় বেশি। হাতে ছয়টি জাহাজের কমান্ড এবং ফিলিস্তীন কূলের সামান্য দূরে সতর্ক টহল দিয়ে ফিরছেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্যুতের ন্যায় ফিলিস্তীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তীরবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছেন। আর এখন আসকালানে এসে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আল-ফারেসের দায়িত্ব, সমুদ্র পথে খৃস্টানদের জন্য কোনো সাহায্য কিংবা রসদ ইত্যাদি আসলে তাকে তীর পর্যন্ত পৌঁছুতে না দেয়া। এই দায়িত্ব তার ঘুম হারাম করে রেখেছে। এখন মেয়ে দুটো তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আল-ফারেস একদিন মেয়ে দুটোকে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে যাযাবরের স্বভাব নেই। তার স্থলে আমি তোমাদের মাঝে ভদ্রতা ও সামাজিকতা দেখতে পাচ্ছি। এসব কোথা থেকে আসলো?'

'আমরা উচ্চমানের খৃস্টান পরিবারে চাকুরি করেছি'– এক মেয়ে উত্তর দেয়– 'তারা আমাদেরকে আতিথেয়তার রীতি-নীতি এবং উঁচু স্তরের মেহমানদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের পন্থা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে আপনার সঙ্গে যাবাবরের ন্যায়ই আচরণ করতাম। আমাদের কথা-বার্তা ও চাল-চলন যাযাবরেরই মতো হতো। আপনি একটি দেশের নৌ-বাহিনীর এতো বড় একজন কমান্ডার এবং আপনার হৃদয়ে আমাদের এতো অধিক ভালোবাসা যে, আমরা আপনার সঙ্গে গেঁয়োর ন্যায় আচরণ করতে পারি না।'

অপর পাঁচ জাহাজের ক্যাপ্টেনগণ জেনে গেছেন, তাদের কমান্ডার আল-ফারেস নিজ জাহাজে দুটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন। শুনে সবাই মুখ টিপে হাসেন ও টিপ্পনি কাটেন। কিন্তু সবাই অনুভব করেন, যুদ্ধের সময় জাহাজে অচেনা-অপরিচিত মেয়েদের রাখা নিরাপদ নয়। প্রয়োজন হলে নিজ স্ত্রীকেই তো রাখা যায়। তারা বিষয়টি নিয়ে আল-ফারেসের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন। আল-ফারেস তাদের আশ্বস্ত করে দেন যে, কোনো সমস্যা হবে না। এদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে মাত্র। সকলে জানেন আল-ফারেস চরিত্রহীন মানুষ নন এবং কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আল-ফারেসের উত্তরে তারা সহজেই সন্দেহমুক্ত হয়ে যান।

বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এখানকার মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন চলছিলো, তার তুলনা অন্তত ফিলিস্তীনের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে নেই। এই নিপীড়নের ইতিহাস অনেক পুরনো। খৃস্টানরা ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেছিলো। মুসলমানদের অনৈক্য, ক্ষমতার মোহ ও গাদ্দারীর ফল ছিলো এটা। ইতিহাসে বহু হানাদার শক্তির এর চেয়েও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড দখলের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে তাকে এতো অধিক গুরুত্ব প্রদান করে, যেনো তারা অর্ধেক দুনিয়া জয় করে ফেলেছে। সমগ্র ইউরোপ এমনকি সমগ্র খৃস্টজগত ও পৃথিবীর তাবৎ গীর্জার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই গুরুত্বের এক কারণ ছিলো, খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের পবিত্র স্থান মনে করতো। তাদের বিশ্বাস মতে, হযরত ঈসাকে (আ.) এ অঞ্চলেরই কোথাও শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। আরেক কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখান থেকেই মি'রাজে গমন করেছিলেন। এ কারণে মসজিদে আকসার গুরুত্ব ও মাহাত্ম খানায়ে কা'বার চেয়ে কম ছিলো না। মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র মনে করতো। এখনও এটি আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। খৃস্টানরা আমাদের এই কেন্দ্রটার উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলো। খৃস্টানদের গোয়েন্দা প্রধান হারমান ভুল বলেননি যে, এই ক্রুসেড যুদ্ধ মুসলমান ও খৃস্টানদের রাজাদের লড়াই। এটা কালেমা ও কা'বার লড়াই, যা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যেদিন দুয়ের একটির পতন ঘটবে।

হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে, মুসলমানদের পরাজিত করাকে এবং যুদ্ধের ময়দানে তো বটে, যে কোনো অবস্থায় ধোঁকায় ফেলে হলেও মুসলমানদেরকে হত্যা করাকে ধর্মীয় কর্তব্য স্থির করে রেখেছে, তেমনি খৃস্টানদের পাদ্রীরাও মুসলমানদের খুন করাকে পুণ্যের কাজ সাব্যস্ত করে রেখেছিলেন। খৃস্টানরা যুদ্ধের বিধান লাভ করতো পোপের (প্রধান পাদ্রী) নিকট থেকে। আপনারা পড়েছেন, হিত্তীনের যুদ্ধে আক্রার পাদ্রী সেই বড় ক্রুশটি নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, যাতে তাদের বিশ্বাস মতে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। এই ঘটনাই প্রমাণ করছে, কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছিলো গীর্জা এবং ক্রুসেড যুদ্ধ দু'টি ধর্ম ও দু'টি সভ্যতার লড়াই ছিলো।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণকারী সম্রাট, সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক প্রত্যেকের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে ক্রুশের অফাদারী এবং জীবন ও সম্পদের কুরবানীর শপথ নেয়া হতো। এই শপথের কারণেই তাদেরকে 'সলীবি' তথা 'ক্রুসেডার' বলা হতো এবং বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষায় যেসব যুদ্ধ লড়া হয়েছিলো, সেগুলোকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' আখ্যা দেয়া হয়েছিলো। খৃস্টজগতে মুসলমান বিরোধী যুদ্ধ এবং আরব ভূখণ্ড দখল করাকে এমন উন্মাদনার রূপ দান করা হয়েছিলো, মহিলারা পর্যন্ত তাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ ও অলংকারাদি অকুণ্ঠচিত্তে গীর্জার হাতে

অর্পণ করতে শুরু করেছিলো। এই উন্মাদনার চূড়ান্ত রূপ এই ছিলো যে, যুবতী মেয়েরা উদার মনে তাদের সম্ভ্রম-সতীত্ব ক্রুশের বিজয় ও মুসলমানদের পরাজয়ের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো। মুসলমানদের চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংসের জন্য যেভাবে প্রয়োজন গীর্জার পক্ষ থেকে খৃস্টান মেয়েদের ব্যবহার করার অনুমোদন দিয়ে রাখা হয়েছিলো। মেয়েদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিলো, গীর্জার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খাতিরে সম্ভ্রম উৎসর্গকারী মেয়েরা স্বর্গ লাভ করবে।

এই বিশ্বাসেরই অনুকূলে রূপসী খৃস্টান মেয়েদেরকে নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এরা মুসলিম আমীরদের হেরেমে ঢুকে গিয়ে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে, যার বিস্তারিত কাহিনী আপনারা পেছনে পড়ে এসেছেন। তাদেরই কারসাজিতে মুসলমানরা পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং খৃস্টানদের পাতা এই সুদৃশ্য ফাঁদে এমনভাবে আটকে যায় যে, তারা আপন চিন্তা-চেতনা, স্বকীয়তা ও বোধ-বিশ্বাসকে ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনের জন্য পাগল হয়ে যায়। তারা তাদের ঈমান নিলাম করে দেয়। তবে তারপরও এমন কিছু লোক অবশিষ্ট থাকে, যাদের আত্মা ঈমানের আলোতে আলোকিত ছিলো। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারে রক্তের নজরানা দিতে থাকে। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধান হচ্ছে, একজন গাদ্দারই সমগ্র জাতিকে আত্মমর্যাদাহীন করে তোলার জন্য যথেষ্ট। আর সেই গাদ্দার যখন ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়, তখন তার শত্রু অপেক্ষা দশগুণ বেশি সৈন্যও পরাজয়বরণ করে।

মুসলিম শাসকদের এই গাদ্দার চরিত্রেরই ফলে ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই মোতাবেক ৪৯২ হিজরীর ২৩ শাবান খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিতে সক্ষম হয়। খৃস্টানদের এই বিজয়ে যেসব মুসলিম আমীর ও শাসক খৃস্টানদেরকে সহযোগিতা দান করে এবং যেভাবে করে, সে এক দীর্ঘ ও লজ্জাকর উপাখ্যান। উপমাস্বরূপ এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খৃস্টান বাহিনী যখন বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলো, তখন শাহজার আমীর তাদের প্রতিহত করা থেকে বিরত থেকেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদেরকে রসদ সরবরাহ করেন এবং গাইড দিয়েও সহযোগিতা করেন। হামাত-ত্রিপোলীর আমীরগণও খৃস্টান বাহিনীকে নিরাপদ রাস্তা, রসদ ও উপঢৌকন দিয়ে তাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের

জন্য রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। পথে তাদের আরো কয়েকটি মুসলিম রাজ্য অতিক্রম করতে হয়েছিলো। তারা তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার নিরাপত্তার খাতিরে খৃস্টানদের চিত্তাকর্ষক ও সুদৃশ্য উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করে এবং খৃস্টান বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে।

আরাকার আমীর ছিলেন একজন ঈমানদার পুরুষ, যার সামরিক শক্তি খৃস্টানদের মোকাবেলায় কিছুই ছিলো না। তবু তিনি খৃস্টান সেনাপতিদের দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃত জানান এবং তাদেরকে মোকাবেলার জন্য হুংকার ছাড়েন। খৃস্টান বাহিনী আরাকা অবরোধ করে ফেলে। ১০৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত আরাকার মুসলমানরা এমন প্রাণপণ মোকাবেলা করে যে, খৃস্টান বাহিনী বিপুল প্রাণহানির ক্ষতি মাথায় করে অবরোধ তুলে নিয়ে পথ পরিবর্তন করে সম্মুখে চলে যেতে বাধ্য হয়। সকল মুসলিম আমীর যদি নিজ নিজ এলাকায় বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসরমান খৃস্টান বাহিনীকে এভাবে প্রতিহত করতো, তাহলে ফোটায় ফোটায় নিঃসরিত হয়ে খৃস্টানদের রক্ত পথেই নিঃশেষ হয়ে যেতো, তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যেতো এবং ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।

যা হোক, মুসলমান আমীরগণ খৃস্টানদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে নিরাপদে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো। তার শাস্তি সেই মুসলমানরা ভোগ করে, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাস করছিলো। সে সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেসব মুসলিম পর্যটক অবস্থান করছিলেন, তারাও খৃস্টানদের পদতলে নিষ্পৃষ্ট হন। ১০৯৯ সালের ৭ জুন খৃস্টানরা এই মহান ও পবিত্র শহরটি অবরোধ করে। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের গবর্নর ছিলেন ইফতেখারুদ্দৌলা। তিনি পরম বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেন। মুসলিম সৈন্যেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু খৃস্টানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো যেমন অগণিত, তেমনি সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই খৃস্টান বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে।

সমগ্র ইউরোপ ও সকল খৃস্টান রাজ্যে এই বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হয়। কিন্তু সবচে' ভয়ংকর ও ভয়াবহ উৎসবটি পালিত হয় বিজিত বাইতুল মুকাদ্দাসে। খৃস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে লুটপাট

করে। কোনো গৃহে কাউকে– সে অশীতিপর বৃদ্ধ হোক কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু– জীবিত ছাড়েনি। জীবিত রাখে শুধু সুন্দরী যুবতী মেয়েদের, যারা পরে তাদের পাশবিকতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলো। অলি-গলিতে পলায়নপর মুসলিম শিশু, নারী ও পুরুষদেরকে অমানুষিক পন্থায় হত্যা করেছে। অবুঝ শিশুদেরকে জীবন্ত বর্শার আগায় গেঁথে উর্ধ্বে তুলে ধরে উৎসবে মেতে ওঠেছে। প্রকাশ্যে নারীর সম্ভ্রমহানি এবং নিহতদের মাথা কেটে কেটে ফুটবল খেলেছিলো খৃস্টানরা।

অবশেষে মুসলমানরা একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করে। তারা নিশ্চিত ছিলো, অন্তত এখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে এবং যে কোনো ধর্মেরই অনুসারীরা এখানে তাদের উপর অত্যাচার করাকে পাপ মনে করবে। সে ছিলো মসজিদে আকসা। মুসলমানরা পরিবার-পরিজনসহ মসজিদে আকসায় চলে যায়। কিন্তু এখানে তারা পা রাখারও জায়গা পায়নি। তারা বাবে দাউদ ও অন্যান্য মসজেদ চলে যায়। স্বয়ং খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই উদ্বাস্তু মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৭০ হাজার। খৃস্টানরা যে মসজিদে আকসাকে তাদের উপাসনালয় দাবি করতো, তার মর্যাদার একবিন্দু তোয়াক্কাও তারা করেনি। তারা আশ্রয় প্রার্থীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজনকেও জীবিত রাখেনি। মসজিদে আকসা, বাবে দাউদ এবং অন্য সকল মসজিদ লাশে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। রক্ত বেয়ে বেয়ে মসজিদের বাইরে গড়িয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিকদের ভাষায়, খৃস্টানদের ঘোড়ার পা গোড়ালি পর্যন্ত মুসলিম নাগরিকদের রক্তে ডুবে গিয়েছিলো।

মেয়েদেরকে মসজিদে মসজিদে এবং মুসলমানদের অন্যান্য পবিত্র স্থানে নিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। সবচে' বেশি হতভাগ্য ছিলো এই মেয়েরা আর যুদ্ধবন্দিরা। বন্দিদের সঙ্গে পশুর ন্যায় আচরণ করা হয়েছে। তাদের আহার অল্প দেয়া হতো এবং কাজ বেশি নেয়া হতো। সেকালে যেসব কাজে উট-ঘোড়া ব্যবহার হতো, সেসব কাজে এই মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের ব্যবহার করা হয়। তাদের হাতে মসজিদগুলো গুড়িয়ে দেয়া হয়। যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এক হিংস্র খৃস্টান এক যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করে তার দেহের গোশত কেটে রান্না করে খায়। পরে সঙ্গীদের জানায়, গোশতগুলো খেতে বেশ স্বাদ লেগেছে। তারপর থেকে খৃস্টানরা মানুষ খেতে শুরু করে। যখন কোনো

উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান হতো, তারা সুস্থ-সবল মুসলমানদের ধরে এনে যবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খেতো।

খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এসব ঘটনা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণই খৃস্টানদের মানবখোরীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

মসজিদগুলোকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও খৃস্টানরা সেগুলোতে ঘোড়া বাঁধতো। মসজিদে আকসায় বিভিন্ন মুসলিম রাজা এবং সৌখিন পর্যটকগণ সোনা-চাঁদির ঝাড় ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কয়েকটি সোনার বস্তু রাখা ছিলো। খৃস্টানরা সেসব সামগ্রী তুলে নিয়ে যায় এবং মসজিদের মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করে দেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবমাননা ও সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের এই কাহিনী তাঁর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব শৈশব থেকেই শোনাতে শুরু করেছিলেন। নাজমুদ্দীন আইউব উপাখ্যানটা শুনেছেন তার পিতা শাদীর নিকট। এই কাহিনী সুলতান আইউবীর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। এক সময়ে তিনি শপথ করে ফেলেন, যে কোনো মূল্যে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করে ছাড়বেন। আজ যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে বের হলেন, তার দুই যুবক পুত্র আল-মালিকুল আফজাল ও আল-মালিকুয যাহিরও তাঁর বাহিনীতে রয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে যে কাহিনী তিনি স্বীয় পিতা থেকে শুনেছিলেন, সেসব নিজ পুত্রদেরও শুনিয়ে দেন, যেনো একটি মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি বংশ পরম্পরায় হাত বদল হচ্ছে।

'লক্ষ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে সময়ের আগে মরে যাওয়াই ভালো'– পুত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সুলতান আইউবী বললেন– 'এই উক্তি তোমাদের মরহুম দাদার। আমি যখন আমার চাচা শেরেকোহর সঙ্গে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে রওনা হয়েছিলাম, তখন আব্বাজান আমাকে কথাটা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কোনো একটি ভূখণ্ডের শাসক হবে। হতে পারে তুমি সুলতান হয়ে যাবে। স্মরণ রেখো বেটা! আজ থেকে তুমি আমার পুত্র নও– জাতির পুত্র। কুরআন মানুষকে পিতা-মাতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে। এখন থেকে দেশের জনগণ ও সালতানাত

তোমার পিতা-মাতা। আল্লাহ্ সন্তানকে পিতার উপর শাসন করতে এবং তাদের কষ্ট দিতে বারণ করেছেন। সাবধান ইউসুফ! দেশের জনগণকে কষ্ট দেবে না। দেখবে তোমার উপর জাতির কী কী হক আছে। সেসব আদায় করতে সচেষ্ট হবে।'...

'আর আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমাদের দাদা বলেছেন, ঘাড় সেদিন উঁচু করবে, যেদিন মসজিদে আকসাকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আরামের ঘুম সেই রাত ঘুমাবে, যে রাতে মসজিদে আকসায় বিজয়ের নফল নামায আদায় করবে। আর আমাদের প্রিয় রাসূল যে মসজিদের আঙ্গিনা থেকে আল্লাহর দরবারে মি'রাজে গমন করেছিলেন, তাকে নিজ চোখের অশ্রু দ্বারা ধৌত করবে। আমার পুত্রগণ! যেসব শিশু বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে ও মসজিদে মসজিদে খুন হয়েছিলো এবং জাতির যে মেয়েরা লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছিলো, তারা আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। যে মসজিদে আমার প্রিয় রাসূলের পবিত্র পা পড়েছিলো, যে মসজিদে রাসূলে পাকের পবিত্র কপাল সেজাদবনত হয়েছিলো, তার ইটগুলো রাতভর আমার উপর পতিত হতে থাকে। আমি ব্যাথায় কুকিয়ে উঠি। মুখ থেকে এমন চীৎকার বেরিয়ে আসে, যেনো মসজিদে আকসায় খুন হওয়া শিশুরা কান্নার সুরে আযান দিচ্ছে। তারা তোমাদের ডাকছে আমার পুত্রগণ! তারা আমাকে ডাকছে।'...

'তোমাদের দাদা বার্ধক্যে কম্পমান হাত দুটো আমাকে দেখিয়ে বলতেন, আমি আমার যৌবন তোমাদের দিয়ে দিলাম। যে কাজ আমি করতে পারিনি, তা তোমরা সম্পন্ন করো। বাইতুল মুকাদ্দাস যাও। বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারই হয় যেনো তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। ক্ষমতার মসনদে বসে যদি নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে জাতির উপর শাসন করার জন্য শত্রুকে উপেক্ষা করে চলো, তাহলে এই মসনদের আয়ু দীর্ঘ হবে না। শহীদদের আত্মা জিনের রূপ ধারণ করে তোমার ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেবে। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই যেনো তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।'...

'আমার প্রিয় পুত্রগণ! আজ আমি আমার পিতার উত্তরাধিকার তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। আজ থেকে তোমরা আমার নও— মিল্লাতে ইসলামিয়ার সন্তান। আমি তোমাদের মাকে বলে দিয়েছি, তোমার কোলে কোনো সন্তান জন্মলাভ করেছিলো, সে কথা ভুলে যাও। যদি না পারো,

তাহলে অন্তত তাদের বেঁচে থাকার দু'আ করো না। আমি তাদেরকে সেই জায়গায় জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর পথে কুরবান করতে গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। দু'আ যদি করতেই হয়, আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ জানাবে, এই সন্তানদের তুমি যে দুধপান করিয়েছো, তা যেনো নূরান্বিত রক্তে পরিণত হয়ে মসজিদে আকসার মেঝে ধৌত করে দেয়। আর আল্লাহ করুন, যেনো এমনই হয়। শপথ করো আমার পুত্রগণ! আমি যদি বেঁচে না থাকি, তাহলে তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করবে।'...

সুলতান আইউবী তাঁর পুত্রদ্বয়কে ১০৯৯ সালের রক্তাক্ত কাহিনী শোনান। শেষে যখন তিনি তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন তারা সুলতানকে সে নিয়মে সালাম করেনি, যেভাবে পুত্ররা পিতাকে সালাম করে থাকে। তারা উঠে দাঁড়ায়। আল-আফজল বললো– 'মহান সুলতান! শুধু শহীদ হওয়া কোনো কৃতিত্ব নয়। আমরা শহীদ হওয়ার আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে দুশমনের এতো রক্ত প্রবাহিত করবো যে, আপনার ঘোড়ার পা পিছলে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, আপনি মসজিদে আকসা থেকে ক্রুশটা নিজ হাতে খুলে ক্রুসেডারদের নাপাক রক্তের মাঝে ছুঁড়ে ফেলছেন।'

'আর সেই রক্ত নিরস্ত্র নাগরিকদের না হওয়া চাই আল-আফজাল!' সুলতান আইউবী বললেন।

'এই রক্ত বর্মপরিহিত ক্রুসেডারদের হবে'– আল-আফজল বললো– 'এই রক্ত সেই লোহা থেকে ঝরবে, যদ্বারা ক্রুসেডাররা তাদের দেহকে আবৃত করে রাখে। ঈমানের তরবারী মিথ্যার ইস্পাতকেও কেটে ফেলার ক্ষমতা রাখে।'

'আল্লাহ তোমার মুখ রক্ষা করুন।' সুলতান আইউবী বললেন।

পুত্রগণ সামরিক কায়দায় পিতাকে সালাম করে বেরিয়ে যায়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রোম উপসাগরের তীরে আসকালানে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় ওঁৎ পেতে বসে আছেন, যে আপন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। আবেগের দিক থেকে তিনি এক্ষুনি বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রযাত্রা করতে প্রস্তুত আছেন বটে; কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তিনি

যুদ্ধের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই চল্লিশ মাইলের দূরত্বটা যেনো আগুন-গরম পাথরে পরিপূর্ণ। এ হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শুধু নগরীটাই প্রাচীরঘেরা নয়– নগরীর চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চলেও ছোট ছোট দুর্গ ও খৃস্টান বাহিনীর অসংখ্য চৌকি বিদ্যমান। টহল প্রহরার ব্যবস্থাও বাদ নেই। বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে অশ্বারোহী সেনারা দলে দলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আগের তুলনায় বেশি শক্ত করা হয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে যে ফৌজ আছে, তার সেনাপতিরা সুলতান আইউবীর প্রতিটি গতিবিধি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাদের এতোটুকু হিম্মত নেই যে, তারা সুলতান আইউবীকে আসকালানে প্রতিহত করবে কিংবা তাঁর উপর জবাবী আক্রমণ চালাবে। হিত্তীন থেকে আসকালান পর্যন্ত সুলতান আইউবী তাদের সামরিক শক্তির অনেক রক্ত চুষে নিয়েছেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান– যিনি হিত্তীনের যুদ্ধে বন্দি হয়েছেন এবং এখন দামেশ্‌কের কারাগারে আটক রয়েছেন যে বাহিনীটি সঙ্গে নিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ মারা গেছে। কিছু বন্দিত্ববরণ করেছে। অবশিষ্টরা এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, এখন তার অফিসার, সৈনিক ও বর্মপরিহিত নাইটরা আহত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। নাইটদের মনোবলে কিছুটা প্রাণ আছে। কারণ, পদমর্যাদার লাজ তো রাখতে হবে। অন্যান্য সৈন্যরা শহরে ঢুকে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেনাপতিগণ নাইটদেরকে নতুন করে সংগঠিত করে নিয়েছে। এখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরের সেনাসংখ্যা ষাট হাজারে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু নাগরিক সাধারণ জেনে ফেলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবী নগরী জয় করতে আসছেন, তাই তারাও যুদ্ধ লড়া ও মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। নগরীর প্রতিরক্ষাকে আরো বেশি শক্ত করা হয়েছে।

নগরীর এক-দু'টি ফটক দিনের বেলা খোলা রাখতে হচ্ছে। কেননা, রণাঙ্গন থেকে পলাতক খৃস্টান সেনারা একজন-দু'জন-চারজন করে এসে নগরীতে প্রবেশ করছে। সুলতান আইউবীর গোয়েন্দারা আগে থেকেই নগরীতে উপস্থিত। এবার পলায়নপর খৃস্টানদের বেশে আরো কিছু গুপ্তচর এসে নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাচীর ভালোভাবে দেখে বেরিয়েও গেছে। মুসলমানদের উপর কড়াকড়ির মাত্রা আগের চেয়ে বেশি কঠোর করে দেয়া হয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ-বারো মাইল দূরে আসকালানের দিকে খৃস্টানদের একটি চৌকি ছিলো। তাতে প্রায় একশ' খৃস্টান সৈন্য অবস্থান করতো। তারা তাঁবু স্থাপন করে রেখেছিলো। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের এক রাতে তাদের সেই চৌকির সন্নিকটে একটি বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটে। পরে অনুরূপ আরো দু'তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। পরক্ষণেই আগুন জ্বলে ওঠে এবং তিন-চারটি তাঁবু জ্বলতে শুরু করে। সৈনিকরা জাগ্রত হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায়। যেইমাত্র সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়, অমনি তাদের উপর চতুর্দিক থেকে তীর আসতে শুরু করে। জ্বলন্ত তাঁবুগুলোর আলোতে এই তীরবৃষ্টি চোখে পড়তে শুরু করে। এ ছিলো দাহ্য পদার্থের সেসব পাতিলের কৃতিত্ব, যেগুলো সুলতান আইউবীর একটি কমান্ডো দল মিনজানিকের সাহায্যে নিক্ষেপ করেছিলো। পাতিলগুলো চৌকিগুলোতে এসে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিস্ফোরিত হওয়ার পর পর সেখানে সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর ছোঁড়া হয়। এই তীর এসে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাহ্য পদার্থে আগুন ধরে যায়।

খৃস্টানরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যাওয়ার পর টের পায়, তারা শত্রুবাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে গেছে এবং এই ঘেরাও থেকে জীবিত বের হওয়া সম্ভব নয়। কমান্ডোরা হুংকার ছাড়তে শুরু করে– 'যদি জীবনে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে অস্ত্র ত্যাগ করে একদিকে সরে দাঁড়িয়ে যাও।' আগুনের ধ্বংসলীলার পর সুলতান আইউবীর কমান্ডোদের এই হুংকার ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট দমটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। তারা অস্ত্র ত্যাগ করে কমান্ডোদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এখন তাদের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশজন। তাদের ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি দখল করে পেছনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ভোর নাগাদ ভস্মিভূত চৌকিটিতে সুলতান আইউবীর সম্মুখ বাহিনীর একটি ইউনিট পৌঁছে যায়। এতে বাহিনীর অগ্রযাত্রা বেশ দূর অঞ্চল পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে যায়। গেরিলাদের অবস্থা বনের হায়েনাদের ন্যায় হয়ে যায়। দু'জন দু'জন করে জানবাজ ঝোঁপ-ঝাড়, পাথরখণ্ড ও টিলার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। যেখানেই টহল অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক সৈন্যদের শব্দ কানে আসছে, তারা চুপসে যাচ্ছে এবং যখনই খৃস্টানরা নিকটে এসে পৌঁছছে, অমনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দু'জন লোক যদি ছয় ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে

দু'জনের পরিণতি কী হয় সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এই অভিযানে কমান্ডোরা শহীদ এবং জখমীও হয়ে চলছে।

এ ছিলো তাদের এক স্বতন্ত্র যুদ্ধ। তাদের কোনো কমান্ডার নেই। এদিক-ওদিক কোথাও লুকিয়ে বসে থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করার কেউ ছিলো না। কিন্তু দৈহিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের যে আত্মিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিলো, তা তাদেরকে আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত করে রেখেছিলো। হিত্তীনের জয়ের পর সুলতান আইউবী যে বড় শহরটি জয় করেছিলেন, সেখানকার মুসলমানদের করুণ অবস্থা ফৌজকে দেখানো হয়েছিলো। তাদেরকে মসজিদের অবমাননা ও ধ্বংসলীলা দেখানো হয়েছিলো। তাদের বলা হয়েছে, এই যুদ্ধ কোনো রাজার রাজত্বের নিরাপত্তা বা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়া হচ্ছে না, বরং এই যুদ্ধ লড়া হচ্ছে ইসলামের সুরক্ষা ও এই মহান ধর্মের দুশমনের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে। প্রশিক্ষণের পর এই যুদ্ধ তাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

আসকালানে সুলতান আইউবী রাতে ঘুমাবার তেমন সময় পাচ্ছেন না। গেরিলাদের পক্ষ থেকে দূতরা যাওয়া-আসা করছে ও সংবাদ আদান-প্রদান করছে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকেও দূতরা আসছে-যাচ্ছে। এরা রাতেও আসছে। সুলতান আইউবী নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কোথাও থেকে কোনো সংবাদ আসলে যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ যেনো তাঁকে অবহিত করা হয়। যদিও তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকেন। গেরিলারা রিপোর্ট নিয়ে আসছে, অমুক স্থানে খৃস্টানদের একটি চৌকির উপর আক্রমণ হয়েছে, এতোজন খৃস্টান সেনা মারা গেছে, এতোজন গেরিলা শহীদ ও এতোজন আহত হয়েছে। অমুক রাস্তাটি নিরাপদ করে ফেলা হয়েছে ইত্যাদি। সে মোতাবেক সুলতান আইউবী নকশায় অগ্রযাত্রার পথের চিহ্নে রদবদল করে নিচ্ছেন।

সুলতান আইউবী সালার ও নায়েব সালারদের সর্বশেষ বৈঠকের আয়োজন করেন। তাতে নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন আল-ফারেসকেও তলব করা হয়। দূত যখন আল-ফারেসের নিকট পৌঁছে, তখন তার জাহাজ আসকালান থেকে বিশ মাইল দূর খোলা সমুদ্রে অবস্থান করছিলো। ডিঙি সে পর্যন্ত পৌঁছুতে আধা দিন সময় লেগে যায়। আল-ফারেস সেই ডিঙিতে

করে রাতেই আসকালান পৌঁছে যান। দূত তাকে বলেছিলো, সুলতান সকল সালারকে তলব করেছেন। তাতেই তিনি বুঝে ফেলেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ সম্পর্কে বৈঠক হবে। দূতের সঙ্গে জাহাজ থেকে রওনার সময় মেয়ে দুটোকে বললেন– 'আমি আসকালান যাচ্ছি।'

'সুলতান ডেকেছেন?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কেনো ডেকেছেন?' অপরজন জানতে চায়।

'আমার রাষ্ট্রীয় কাজে তোমরা এতো মাথা ঘামাচ্ছো কেনো?'– আল-ফারেস বিরক্তি প্রকাশ করেন– 'তোমাদের কয়েকবার বলেছি, আমার ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

দু'জনেই হেসে ওঠে। একজন বললো– 'যোগ্যতা থাকলে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম এবং দুশমনরা আক্রমণ করলে মোকাবেলা করতাম।'

'তোমরা যার যোগ্য, আমি তোমাদের থেকে সে কাজই নেবো'– আল-ফারেস বললেন– 'আমার অবর্তমানে বেশিরভাগ সময় নীচে কাটাবে। উপরে গিয়ে মাল্লা ও সৈনিদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।'

'আপনি কবে ফিরবেন?'

'আজ রাতে বোধ হয় আসতে পারবো না'– আল-ফারেস উত্তর দেন– 'কাল সন্ধ্যা নাগাদ এসে পড়বো।'

আল-ফারেস মেয়ে দু'টির মাঝে পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছেন। মেয়েরা তাকে সুলতান আইউবীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো। জানতে চাইতো, রোম উপসাগরে মিসর ও সিরিয়ার নৌ-বহর বন্দরে আছে, নাকি সমুদ্রে। মোট জাহাজ কয়টি। এগুলোতে কতোজন সৈন্য আছে। আল-ফারেস তাদের পরিষ্কার বলে দিতেন, আমাকে এসব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করবে না। তথাপি তারা নিজেদের রূপ-লাবণ্য ও ভাবভঙ্গির যাদু প্রয়োগ করে তার নিকট এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে বসতো, যা একটি বাহিনীর গোপন সামরিক বিষয়। আল-ফারেস আবেগময় অবস্থা থেকে সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে যেতেন এবং তাদেরকে প্রীতির সাথে শাসিয়ে দিতেন।

নেশার অবস্থায় মানুষ হৃদয়ে লুকায়িত গোপন তথ্য উগরে দিয়ে থাকে। চাই নেশাটা মদের হোক কিংবা অন্য কোন ওষুধের। কিন্তু আল-ফারেস মদপান করতেন না। না জাহাজে মদ কিংবা অন্য কোনো

নেশাকর দ্রব্য রাখার অনুমতি ছিলো। তিনি চরিত্রহীন মানুষও নন। কিন্তু এখন দু'টি মেয়ের নেশা তাকে জেঁকে ধরেছে, যাদের সাহায্যে তার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং তিনি চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এই মেয়ে দুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা দেখলো, আল-ফারেসের মধ্যে না মদের অভ্যাস আছে, না তার চরিত্রে কোনো কলুষতা আছে। তারা তার উপর প্রেম-ভালোবাসার নেশা জাগিয়ে তুলতে শুরু করে। কিন্তু আল-ফারেস নিজ কর্তব্যে এতোই পরিপক্ক যে, আবেগের উপর মাদকতা ছেয়ে গেলেও তিনি কর্তব্যে একবিন্দু ত্রুটি করছেন না।

এক রাত। আল-ফারেস গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। মেয়ে দুটো কেবিন থেকে বেরিয়ে উপরে চলে যায় এবং ছাদের রেলিং ধরে জোৎস্না রাতের হিমেল হাওয়া উপভোগ করতে শুরু করে।

'রোজি!'– এক মেয়ে অপরজনকে বললো– 'আমি সামনে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। আল-ফারেস দেখতে মোম। কিন্তু এটা-ওটা জিজ্ঞেস করলে পাথর হয়ে যান। আমার মনে হচ্ছে, এখানে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না। এন্ড্রু আসলে বলবো, সম্ভব হলে তুমি আমাদেরকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাও। কী বলো, ভালো হবে না?'

ক্ষুদ্র ডিঙিতে করে জাহাজের নিকট এসে জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকদের নিকট এটা-ওটা বিক্রি করতো যে বৃদ্ধ, আসলে মেয়ে দুটো যাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কেনা-কাটার ভান ধরে কথা বলতো, এন্ড্রু সেই ব্যক্তি। লোকটার সঙ্গে মেয়ে দুটোর ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। লোকটি গরীব হকারের বেশে নিজের ডিঙিতে করে আল-ফারেসের জাহাজের নিকট পণ্য বিক্রয় করতে এসেছিলো। সে মেয়ে দুটোকে এবং মেয়ে দুটো তাকে চিনে ফেলে। মেয়েরা পণ্য ক্রয়ের কথা বলে তাকে জাহাজে তুলে নিয়েছিলো। সে মেয়েদের বলেছিলো, তারা আল-ফারেসের এই ছয়টি জাহাজের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় লেগে আছে এবং সুযোগ পেলেই জাহাজগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। মেয়েরা তাকে বলেছিলো, আশ্রয়ের বাহানায় আমরা তোমাদের জন্য গোয়েন্দাগিরি করবো।

এন্ড্রু একজন নাশকতাকারী গোয়েন্দা। প্রথম সাক্ষাতের পর সে দু'বার আপন বেশে এসেছিলো এবং মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো। মেয়েরা তাকে জানায়, আল-ফারেস তাদের জালে আসছেন না এবং কোনো

তথ্যও দিচ্ছেন না। এন্ড্রুর জানবার প্রয়োজন ছিলো, জাহাজগুলো কতোদিন এই ডিউটিতে থাকবে এবং টায়েরের দিকে যাবে কিনা? সে মেয়েদের বললো, মনে হচ্ছে তোমরা বিদ্যা ভুলে গেছো। এই জাহাজে তো আল-ফারেস একজনই লোক নয়। তার নায়েবও তো আছে এবং তার নীচে আরো একজন অফিসারও আছে। তোমরা তাদের একজনকে হাত করে নাও। তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দাও। আল-ফারেসের নায়েবকে তার শত্রু বানিয়ে দাও। যাদু প্রয়োগ করো। কী করতে হবে জানো না? সবই তো জানো।'

সে রাতে এক মেয়ে অপরজনকে হতাশা ব্যক্ত করে বললো, রোজি! এন্ড্রু আসলে বলবো, আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

'শোন ফ্লোরি!'— রোজি উত্তর দেয়— 'এন্ড্রু এখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না। এটি যুদ্ধজাহাজ। দেখছো না, রাতে ছাদের উপর বরং আরো উপরে মাস্তুলে মাচান পেতে এক সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে। পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সঙ্গে এন্ড্রুরও ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে। আমাদেরকে এতো তাড়াতাড়ি নিরাশ হওয়া ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করবে?' ফ্লোরি জিজ্ঞেস করে।

'করতে হবে'— রোজি বললো— 'আল-ফারেসের নায়েব তো পূর্ব থেকেই আমাদেরকে কামনার চোখে দেখছে এবং মুচকি হাসছে। এই লোকগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সমুদ্রে অতিবাহিত করছে। মৃত্যু সব সময় এদের মাথার উপর অপেক্ষমান থাকে। খোদা পুরুষের মধ্যে নারীর যে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছেন, তা এমনি পরিস্থিতিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইঙ্গিত করতে দেরি, সাড়া আসতে দেরি হয় না। বলো, কাজটা আমি করবো, নাকি তুমি? আমার তুলনায় অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতা ভালো।'

'আচ্ছা আমিই করি।' ফ্লোরি বললো।

'কিন্তু এ কাজের নিয়ম-নীতি মনে রাখতে হবে'— রোজি বললো— 'তথ্য নেবে; তবে তার মূল্যটা শুধু দেখাবে— পরিশোধ করবে না। লোকটার মধ্যে এমন পিপাসা সৃষ্টি করবে, যেনো সে আল-ফারেসকে হত্যা করার ভাবনা ভাবতে বাধ্য হয়।'

আল-ফারেসের নায়েবের নাম রউফ কুর্দি। আগে থেকেই লোকটি মেয়েগুলোর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে আসছে। এদের প্রতি তাকাতো আর মিটি মিটি হাসতো। তার জানা ছিলো, এরা আল-ফারেসের স্ত্রী

কিংবা গণিকা নয়– আশ্রিতা যাযাবর। আল-ফারেস এদেরকে নিজ জাহাজে আশ্রয়দান করেছেন। মেয়ে দুটো রউফ কুর্দির হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। সে রাতে যখন তারা ছাদে রেলিং ধরে কথা বলছিলো, রউফ কুর্দি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলো। আল-ফারেস তো সুলতান আইউবীর বৈঠকে যোগ দিতে চলে গেছেন। জাহাজের কর্তৃত্ব এখন রউফ কুর্দির হাতে।

ফ্লোরি ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রোজি পায়চারি করার ভান ধরে সেখান থেকে সরে যায় এবং রউফ কুর্দির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মুচকি একটা হাসি দেয়। রউফ কুর্দি 'শোন' বলে তাকে কাছে ডেকে নেয় এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে শুরু করে। দু'চারটি কথার উত্তর দিয়ে রোজি চলে যেতে উদ্যত হলে রউফ কুর্দি তাকে বসতে বলে।

'আমি আপনার কাছে বসে থাকলে ও (ফ্লোরি) ক্ষেপে যাবে।' রোজি বললো।

'কেনো?' রউফ কুর্দি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'এ যার যার মনের ব্যাপার'– রোজি বললো– 'আল-ফারেস একদিন নীচে ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি উপরে এসে আপনার কাছে দাঁড়ালাম। ও দেখে ফেলে। পরে আমাকে বললো, আমার মালিকানায় ভাগ বসাতে চেষ্টা করো না। রউফ আমার। মিসর গিয়ে আমি তার সঙ্গে চলে যাবো। ও আবার আল-ফারেসকে পছন্দ করে না। কিন্তু পাছে আল-ফারেস অসন্তুষ্ট হন কিনা সে ভয়ে আপনার কাছে ঘেঁষে না।'

রউফ কুর্দির আবেগের সমুদ্রে জোয়ার এসে যায়। পুরুষিত স্বভাবের দুর্বলতা তাকে কাবু করে ফেলে। ফ্লোরি-রোজি অপেক্ষা বেশি রূপসী মেয়েও রউফ দেখেছে। কিন্তু এদের রূপ ও অঙ্গভঙ্গিতে যে আকর্ষণ রয়েছে, তা অন্যদের মধ্যে দেখেনি। এখন যখন জানতে পারলো, এদের একজন তাকে কামনা করছে, তখন তার মস্তিষ্ক আবেগের উপর সেই পথে চলতে শুরু করে দিয়েছে, যে পথে একজন পুরুষের যাওয়া দেখা যায়; কিন্তু ফিরে আসা দেখা যায় না। রোজি তাকে আত্মহারা এক ঘোরের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। কেবিনে অবতরণের জন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে পেছন পানে তাকায়। দেখে, রউফ কুর্দি ধীরে ধীরে ফ্লোরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আজ রাত ঘুমাবে না জুয়াশি!' ফ্লোরি আল-ফারেসকে নিজের যে নাম বলেছিলো, রউফ কুর্দি কাছে গিয়ে তাকে সেই নামে ডাকে।

রোজি নিজের নাম বলেছিলো আজমির। যাযাবরদের নাম এমন অদ্ভুতই হয়ে থাকে।

রউফ কুর্দিকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখে ফ্লোরি প্রশিক্ষণ অনুযায়ী এমন ধারায় লজ্জা প্রকাশ করে, যেমনটি নববধূও করে না। রউফ কুর্দি মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলে সে সলাজ নতমুখে একদিকে সরে যায়।

'আজমির আমাকে তোমার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে'– রউফ কুর্দি বললো– 'এসব কি সত্য?'

ফ্লোরি রউফের প্রতি একবার মুখ তুলে তাকিয়েই অমনি ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখতে থাকে। রউফ কুর্দি প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ফ্লোরি যে হাতে রেলিং ধরেছিলো, সে হাতের উপর নিজের একটা হাত রাখে। ফ্লোরি ধীরে ধীরে নিজের হাত উল্টো করে আঙুলগুলো রউফ কুর্দির আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

অল্পক্ষণ পর। ফ্লোরি এখন রউফ কুর্দির সঙ্গে তার ডিউটির স্থলে উপবিষ্ট। জাহাজ নোঙ্গরকরা। গোটা চারেক বাতি সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। এগুলো আল-ফারেসের জাহাজ, সমুদ্রে টহল দিয়ে ফিরছে।

মধ্যরাতে রউফ কুর্দির স্থলে তার এক অধীন অফিসার ডিউটিতে আসবার কথা। রউফ কুর্দি ফ্লোরিকে বললো, তুমি আমার কেবিনে চলে যাও, আমি আসছি।

ফ্লোরি চলে যায়।

জাহাজের ছাদ থেকে ফজরের আযান ভেসে আসলে ফ্লোরি রউফ কুর্দির কেবিন থেকে বের হয়। মেয়েটি আল-ফারেসের নায়েবকে নিশ্চিত করে, তাকে সে মনে-প্রাণে কামনা করছে এবং কোনো দিনই আল-ফারেসকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না। সে রউফ কুর্দিকে জানালো, আল-ফারেস আমাকে বলেছিলেন, তুমি রউফের সঙ্গে কথা বলবে না। লোকটা বড্ড খারাপ মানুষ। আসলে তিনি নিজেই বদমাশ। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন বটে; কিন্তু আমাদের অসহায়ত্ব থেকে পুরোপুরিই সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা যদি অসহায়-নিরাশ্রয় না হতাম, তাহলে এতো বেশি মূল্য কখনো দিতাম না।'

রউফ কুর্দির অন্তরে নিজের ভালোবাসার প্রতারণা ও আল-ফারেসের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে ফ্লোরি তার কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়। আল-ফারেস যে তথ্য কখনো তাদের দেননি, রউফ তার সব উগরে দেয়।

সুলতান আইউবীর চোখে ঘুম নেই। গোটা রাত বৈঠকে কেটেছে। তিনি এমন কোনো ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছেন না, যার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরোধ ব্যর্থ হতে পারে। তিনি মানচিত্রে সালার ও অন্যান্যদের বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা দেখিয়ে দেন। যেসব স্থানে এই ক'দিন খৃস্টানদের চৌকি ছিলো আর এখন সেখানে তাঁর গেরিলা কিংবা সম্মুখ বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল অবস্থান করছে কিংবা ওখানে কিছুই ছিলো না, সেসব জায়গার উপর চিহ্ন দিয়ে রাখেন। এমন স্থানগুলোও চিহ্নিত করে রাখেন, যেখানে এখনো ক্রুসেডারদের চৌকি বহাল আছে এবং তাতে অনেক সৈন্য বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান সকলকে অবহিত করেন, তিনি এসব চৌকি দখল করার চেষ্টা-ই করেননি। কারণ, তিনি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত নিজের সামরিক শক্তি নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই চৌকিগুলো সব উঁচুতে অবস্থিত। তাই এগুলো এড়িয়ে সামান্য দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করার কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি। সেগুলোতে যে সৈন্য আছে, তারা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের পথরোধ করার সাহস করবে না।'

'কিন্তু দূর থেকে আমাদেরকে দেখে তাদের দূত বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে সংবাদ পৌঁছাবে'– এক সালার বললেন– 'ফলে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরতে ব্যর্থ হবো।'

'অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা মন থেকে ফেলে দাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ক্রুসেডাররা ভালোভাবেই জানে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। তাদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে আমাদের মোকাবেলায় আসবে না। একে তো নগরীতে এমন বাহিনী আছে, যারা কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদেরকে নগরীর নিরাপত্তার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে। সেখান থেকে গুপ্তচর রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, এই বাহিনী দিনরাত অবরোধে লড়াই করার ও অবরোধ ভাঙার মহড়া দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা যেসব অঞ্চল জয় করেছি, সেখানকার পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরাও বাইতুল মুকাদ্দাস চলে গেছে। তাদের মধ্যে বর্মপরিহিত নাইটও আছে। আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, অবরোধ চলাকালে এই নাইটরা ফটকের বাইরে এসে আক্রমণ করবে এবং প্রতিটি আক্রমণের পর নগরীতে ঢুকে পড়বে। এই পদ্ধতি তারা আমাদের থেকে শিখেছে। আঘাত হানো আর অদৃশ্য হয়ে

যাও। কাজেই দুশমনকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা বাদ দাও। দুশমন তোমাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও খৃস্টানদের কোনো চৌকি থেকে কোনো দূত যেনো বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে না পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। বাইতুল মুকাদ্দাস ও তাদের চৌকিগুলোর মাঝে আমাদের গেরিলাদের বসিয়ে রেখেছি। তারা কাউকে জীবিত যেতে দেবে না।'

'তাদের সেনাসংখ্যা সম্পর্কে গোয়েন্দারা বিভিন্ন তথ্য বলেছে। সে থেকে আমি অনুমান করেছি, বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে খৃস্টানদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাসংখ্যা ষাট হাজারেরও কিছু বেশি হতে পারে। আমাদেরকে এ কথাটাও মাথায় রাখতে হবে যে, ওখানে মুসলমানরা কয়েদ ও নজরবন্দি অবস্থায় আছে। ফলে ভেতর থেকে তারা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বিপরীতে খৃস্টান জনসাধারণ তাদের বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। খৃস্টানরা তাদের কিশোরদেরকেও তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে। নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আমাদের উপর তীর সঠিক অর্থেই মুষলধারার বৃষ্টির ন্যায় আসবে। তীর ছোঁড়ার জন্য খৃস্টানরা নতুন ধরনের একটি ধনুক নিয়ে এসেছে, যেটি দেখতে ক্রুশের ন্যায়। তা দ্বারা ছোঁড়া তীর বেশ দূরেও যায় এবং নিশানাও অব্যর্থ হয়।'

সুলতান আইউবী নকশা ধরে ধরে উপস্থিত সকলকে প্রতিটি স্থান ও রাস্তা ইত্যাদি দেখিয়ে দেন। পরে অবরোধ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বললেন, এটি শেষ বৈঠক। কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকলে দূর করে ফেলো। কোনো প্রশ্ন থাকলে তা যতো অর্থহীন হোক না কেনো জিজ্ঞেস করে উত্তর জেনে নাও। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ– যিনি সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধাভিযানে সুলতান আইউবীর সঙ্গে ছিলেন– তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফের উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিলো' শিরোনামে লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী (উক্ত শেষ বৈঠকে) রাসূলে আকরাম (সা.)-এর একটি হাদীস শোনান– 'যার জন্য সফলতার দরজা খুলে যায়, তাতে তার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে যাওয়া উচিত। বলা যায় না, এই দরজা কখন বন্ধ হয়ে যায়।' সুলতান আইউবী দ্রুত অধিকৃত অঞ্চল ও দুর্গ জয় করতে আসছিলেন। তাই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণে বিলম্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন- 'আল্লাহ আমাদের সফলতার দরজা

খুলে দিয়েছেন। বন্ধ হওয়ার আগেই তাতে ঢুকে পড়ো।'...

'আমার বন্ধুগণ!'– সুলতান আইউবী নকশাটা একধারে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন– 'হিত্তীন যুদ্ধের আগে আমি তোমাদেরকে কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সে কথাগুলোই আবার বলছি। এরপর আর কথা বলার সুযোগ পাবো না। পরস্পর জীবিত সাক্ষাৎ হবে কিনা, তাও বলতে পারি না। ইতিপূর্বে আমরা শুধু যুদ্ধ লড়েছি। গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি আর শত্রুকে আমাদের অঞ্চলে দুর্গ সুসংহত করতে ও বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করতে সময় ও সুযোগ দিয়েছি। তারপর আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড লড়াই লড়তে থাকি। খৃস্টানরা আপন রূপসী কন্যাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের আমীর-উজির ও সামরিক-বেসামরিক অফিসারদের নিকট প্রেরণ করতে থাকে। তারা আমাদের সারিতে বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী ঢুকিয়ে দেয়। এই নারী আর গাদ্দাররা যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, সেসব তোমাদের কারুরই অজানা নয়। আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবীস এবং তাদের বিভাগ বড় দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সেই অদৃশ্য অঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার হাতে আমার অভিজ্ঞ অনেক কর্মকর্তা ও সালার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। একের পর এক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে আর আমরা সেগুলো দমন করি।'...

'দুশমনের উদ্দেশ্য কী ছিলো? আমাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করা, ধর্ম ও ঈমানকে দুর্বল করা এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। আমাদের মাঝে দুশমন গাদ্দার তৈরি করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিলো, প্রথম কেবলার দখল অটুট রেখে আমাদের ঈমান-বিক্রেতা ভাইদের সাহায্যে পবিত্র মক্কাও দখল করে নেবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পাঁচটি বছর আমি দক্ষিণাঞ্চলে দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলাম। রেজিনাল্ড (প্রিন্স অর্নাত) পবিত্র মদীনার সামান্য দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। আমার ভাই আল-মালিকুল আদিল ও নৌবাহিনী প্রধান হুসামুদ্দীনের কৃতিত্ব যে, তারা সময়মতো তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঐ খৃস্টানটাকে পেছনে হটিয়ে দেয়। আমি লোকটাকে নিজ হাতে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছি।'...

'দুশমনের টার্গেট আমাদের উৎসগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে খৃস্টানদের উৎসে পরিণত করা। আমাদের লক্ষ্য দুশমনের এই টার্গেটকে

বানচাল করা। যুদ্ধের এদিকটাকে তোমরা সবসময় স্মরণ রাখবে। এটি আমাদের নৈতিকতার যুদ্ধ। ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করেছিলো কিনা সে বিতর্ক ভিন্ন। কিন্তু আমি ইসলামের সুরক্ষার জন্য তরবারীকে জরুরি মনে করি। জাতি সেই তরবারী সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিহাস আমাদের পানে তাকিয়ে আছে। মহান আল্লাহর দৃষ্টিও জাতির সৈনিকদের উপর নিবদ্ধ। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র আত্মা আমাদের দেখছেন। ভেবে দেখো, আমাদের দায়িত্ব কতো মহান ও কতো পবিত্র। আল্লাহর সৈনিকরা শাসন করে না– আল্লাহর শাসন ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে মাত্র।'...

বলতে বলতে সুলতান আইউবী আবেগময় হয়ে ওঠেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আহ্ আমার বন্ধুগণ! ষোল হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের কথা স্মরণ করো। সেদিন হযরত উমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গী সেনাপতিগণ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করেন। হযরত বিলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে। তাঁরা সকলে মসজিদে আকসায় নামায আদায় করেন। সেই নামাযের আযান দীর্ঘ সময় পর হযরত বিলাল (রা.) দিয়েছিলেন। হযরত বিলাল রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পর এমন নীরব হয়ে গিয়েছিলেন যে, মানুষ তাঁর জ্বালাময়ী কণ্ঠ ভুলে গিয়েছিলো। তিনি আযান দেয়া ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মসজিদে আকসায় এসে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, বিলাল! মসজিদে আকসা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা-দেয়াল বহুদিন যাবত আযান শোনেনি। আযাদীর প্রথম আযানটা তুমিই দাও। রাসূলে মকবুল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত বিলাল এ-ই প্রথম আযান দিলেন।'...

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের আমলে মসজিদে আকসা পুনরায় আযানের সুর ভুলে গেছে। নব্বইটি বছর যাবত এই মহান মসজিদের দরজা-দেয়াল একজন মুয়াজ্জিনের পথপানে তাকিয়ে আছে। স্মরণ রেখো, মসজিদে আকসার আযান সমগ্র পৃথিবীতে শোনা হয়। খৃস্টানরা সেই আযানের গলা টিপে ধরে রেখেছে। এই পবিত্র লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে অগ্রসর হও। আমরা সাধারণ কোনো যুদ্ধ লড়তে যাচ্ছি না। আমরা আপন রক্তের ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি পুনরায় লিখতে যাচ্ছি, যা আমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গীরা লিখেছিলেন। যদি কামনা করো, মাথায় আলো নিয়ে

মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, যদি কামনা করো ,অনাগত বংশধর তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাক; তাহলে তোমাদেরকে সেই মিম্বরটি বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপন করতে হবে, যেটি বিশ বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী মরহুম ওখানে স্থাপনের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।'

সুলতান আইউবী মিম্বরটি সকলকে দেখালেন এবং বললেন– 'এই মিম্বর জঙ্গী মরহুমের বিধবা ও কন্যা বয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে সেই নারীর লাজ রক্ষা করতে হবে, যে জাতির দু'শ' মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য, আমাদের কেউ যেনো যুদ্ধের ময়দানে পিপাসার মারা না যাই, কেউ যাতে আহত হয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না থাকি। তোমরা জানো, আমি কখনো যুদ্ধের ময়দানে নারীর উপস্থিতির পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু এই মেয়েগুলোকে এ জন্য রেখে গিয়েছি, যেনো আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার এই চিহ্নটা আমাদের সম্মুখে থাকে এবং আমাদের স্মরণ থাকে, আমাদের এদেরই ন্যায় কন্যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে কাফেরদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার শিকার হয়ে আছে। মনে রেখো আমার বন্ধুগণ! যে জাতি জাতির কন্যা ও শহীদদের কথা ভুলে যায়, আল্লাহও সে জাতিকে ভুলে যান এবং তাদের ভাগ্যে আজীবনের জন্য অভিশাপ লিখে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন তোমরা অভিশপ্তদের মাঝে উত্থিত হবে, নাকি আল্লাহর রহমত ও রাসূলের সুপারিশপ্রাপ্তদের মাঝে, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের।'

সুলতান আইউবী এরূপ আবেগময় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে তিনি এতোই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, যখনই ইতিহাসের এ ভূখণ্ডটি আলোচনায় উঠে আসতো, তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসতো এবং তিনি অস্থির হয়ে উঠে পায়চারি করতে শুরু করতেন। এই শেষ বৈঠকে তিনি তাঁর সালার প্রমুখদের মাঝে এমন আবেগ জাগিয়ে তোলেন যে, তিনি এজলাস ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরও কারো মুখ থেকে কোনো কথা ফোটেনি। তাদের গতি-প্রকৃতিই বদলে গেছে। তারা সোজা নিজ নিজ বাহিনীর নিকট চলে যায় এবং স্ব স্ব কমান্ডারদেরকেও অনুরূপ আবেগময় করে তোলে।

সকলে চলে গেলে সুলতান আইউবী নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেস বায়দারীনকে ডেকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, সমুদ্রের খবর কী? আল-ফারেস জানান, আমার জাহাজ টহল দিয়ে ফিরছে এবং আমি

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যথারীতি বার্তা পেয়ে আসছি, যা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ক্রুসেডারদের নৌবহরের কোনো চিহ্ন নেই। টায়েরের বন্দর এলাকায় আমার রণতরী অবস্থান করছে এবং ছোট ছোট পালতোলা ডিঙিতে করে মৎস্যজীবির বেশে আমার গোয়েন্দারা সেখানে যাওয়া-আসা করছে। টায়ের এবং তার আগে ক্রুসেডারদের বহরে কোনো সংযোজন হয়নি। যে তরীগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। তারা জাহাজে এমন অগ্নিগোলার ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেগুলো দূর থেকে উড়ে এসে পালে আগুন ধরিয়ে দিতে সক্ষম।

'এই গোলা এতো দূর থেকে আসতে পারে, যতোটুকু দূর পর্যন্ত তোমাদের প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা তীর যেতে পারে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আমাদের কারো অন্তরে কোন ভীতি নেই'– আল-ফারেস বললেন– 'নৌ-কমান্ডোরা এতোটুকু প্রস্তুত যে, নৌ-যুদ্ধের সময় তারা ছোট ছোট ডিঙিতে করে দুশমনের জাহাজের নিকটে গিয়ে তাতে ছিদ্র করে ফেলবে এবং তার উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে।'

'যদি যুদ্ধটা রাতে হয়'– সুলতান আইউবী বললেন– 'দিনের বেলা কোন কমান্ডো যেনো সমুদ্রে না নামে। আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করলে জীবনই নষ্ট হবে। সাবধান থাকতে হবে আল-ফারেস! তোমরা যেমন মৎস্য শিকারীর বেশে টায়ের পর্যন্ত গোয়েন্দা প্রেরণ করো, তেমনি দুশমনের গোয়েন্দাও কোনো না কোনো ছদ্মবেশে তোমাদের জাহাজের নিকট এসে থাকবে। জাহাজগুলোকে একটি অপরটি থেকে দূরে রাখবে, যাতে হঠাৎ আক্রমণ হলে সবগুলো একসঙ্গে ঘেরাওয়ে পড়ে না যায়। এমনভাবে ছড়িয়ে রাখবে, যেনো প্রয়োজনে দুশমনকে ঘিরে ফেলতে পারো। দিনে পতাকা আর রাতে বাতির মাধ্যমে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করবে।'

আল-ফারেস যখন সুলতান আইউবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। সেখানেই তিনি ফজর নামায আদায় করেন।

'আল-ফারেস!'– আল-ফারেস সন্নিকটেই কারো ডাক শুনতে পান। মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখেন ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডার হাসান ইবনে আবদুল্লাহ। হাসান এগিয়ে কাছে এসে আল-ফারেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করেন– 'ধন্যবাদ ভাই! একই সঙ্গে দু'টি মেয়েকে বিয়ে করেছো বুঝি? দু'জনকেই সঙ্গে রেখেছো? নিজের সঙ্গে তাদেরও খুন করতে চাও নাকি?'

'উহ হাসান ভাই!'– আল-ফারেস অন্ধকারে কণ্ঠে হাসানকে চিনতে পেরে বললেন– 'ওরা তো আশ্রিতা মেয়ে দোস্ত! কূলে একস্থানে লুকিয়ে ছিলো। বলছে যাবাবর। সমগ্র গোত্র নাকি যুদ্ধের কবলে পড়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মরেছে।

আর ভাগ্যক্রমে শুধু তারা বেঁচে রয়েছে এবং সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'খৃস্টানরা অন্যসব যাবাবরদের ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষে মারলো আর এমন রূপসী দু'টি মেয়েকে জীবিত ছেড়ে দিলো! তুমি বোধ হয় সমুদ্রে থেকে থেকে স্থলের মানুষগুলোর স্বভাব-চরিত্র ভুলে গেছো দোস্ত!'

আল-ফারেস হেসে ওঠে বললেন– 'হাসান ভাই! গোয়েন্দাগিরি করতে করতে এখন তুমি কাক-চিলকেও ক্রুসেডারদের গোয়েন্দা ভাবতে শুরু করেছো। বলতে চাচ্ছো, এই মেয়ে দুটো দুশমনের গোয়েন্দা হতে পারে, তাই না?'

'হতে পারে'– হাসান বললেন– 'তুমি খানিকটা বেশি প্রাণোচ্ছল মানুষ আল-ফারেস! ভালো হবে, তুমি মেয়ে দুটোকে টায়েরের নিকট কূলে রেখে আসো। অপরিচিত মেয়েদের জাহাজে রাখা ঠিক হবে না।'

'কেনো, মিসর নিয়ে ওদের বিবাহ করে নেয়া কি পুণ্যের কাজ হবে না?'– আল-ফারেস বললেন– 'কিংবা আমি তাদের একজনকে বিয়ে করে নেবো আর অপরজনকে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। এরা গরীব মেয়ে। এদেরকে কূলে কোথাও ফেলে আসলে জানো তো খৃস্টানরা এদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে!'

'হতে পারে তারাও খৃস্টান'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– শোনো আল-ফারেস! তুমি অবুঝ শিশু নও। সাধারণ সৈনিকও নও। তুমি নৌ-বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার। ভাবতে ও বুঝতে চেষ্টা করো। আমি রিপোর্ট পেয়েছি, অবসর সময়টা তুমি ওদের সঙ্গে হেসে-খেলে অতিবাহিত করো। এক হাজার কসম খেলেও আমি মেনে নেবো না, তুমি ওদেরকে পবিত্র মেয়ে বানিয়ে রেখেছো। তারা যদিও তোমাকে না দেয়, তুমি তো নিজেকে ধোঁকা দিতে পারো। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের যাদু যে কোন পুরুষকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে। অনেক কিছু হতে পারে আল-ফারেস! বলছি, মেয়েগুলোকে তুমি কোথাও রেখে আসো।'

'যদি আমি তোমার পরামর্শ মান্য না করি, তাহলে?'

'তখন আমাকে দেখতে হবে মেয়েগুলো আসলে কারা ও কেমন'– হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন– 'যদি সন্দেহভাজন বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হবো। কিন্তু বিষয়টা নিষ্পত্তির ভার আমি তোমারই উপর অর্পণ করতে চাই। তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তুমি নিজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, যাতে আমাকে কর্তব্য পালনে বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে না হয়।'

'আমার দিক থেকে কোনো অন্যায় আচরণের আশংকা করো না হাসান!'– আল-ফারেস বললেন– 'তুমি বন্ধুত্বের কথা বলছো। আমি তো কর্তব্য পালনে নিজের জীবনও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়ে দুটো আমার কোনো ক্ষতি করবে না। তাদের প্রতি যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগ্রত হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরকে কূলে নিয়ে রেখে আসবো কিংবা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবো।'

'জাহাজে কখন ফিরবে?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন।

'নামায পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমাবো। অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি'– আল ফারেস বললেন– 'তারপর চলে যাবো। সন্ধ্যা নাগাদ জাহাজে গিয়ে পৌঁছবো।'

আল-ফারেস থেকে বিদায় নিয়ে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সেই কক্ষে চলে যান, যেখানে তার বিভাগের লোকেরা থাকে। তাদের একজনকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-ফারেস বায়দারীনের জাহাজ অমুক জায়গায় নোঙ্গর ফেলে অবস্থান করছে। তুমি জাহাজে গিয়ে আল-ফারেসের নায়েব রউফ কুর্দিকে বলবে, আমাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রেরণ করেছেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রউফ কুর্দির নামে বার্তা প্রদান করেন– 'এই লোকটিকে কোনো কাজে জুড়িয়ে দাও। জাহাজে আশ্রিতা মেয়ে দুটো সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে, জাহাজে ওদের কোনো গোপন তৎপরতা আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি এ কাজে তোমার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ লোকটিকে জরুরি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে একটি পালতোলা নৌকায় তুলে বিদায় করে দেন। বাতাসের গতি অনুকূল ও তীব্র ছিলো। নৌকা অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের সঙ্গে গিয়ে

ভিড়ে। জাহাজ থেকে সিঁড়ি ফেলে তাকে উপরে তুলে নেয়া হলো। লোকটি রউফ কুর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর বার্তা প্রদান করে এবং নিজেও মৌখিকভাবে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু রউফ কুর্দির চেহারা বলছে, লোকটাকে তার ভালো লাগেনি। তবে বিপক্ষে কিছু বলাও তো সম্ভব নয়। তার জানা আছে, সুলতান আইউবীর অন্তরে একজন গুপ্তচরের ততোটুকু মর্যাদা আছে, যতোটুকু একজন সালারেরও নেই। একজন গোয়েন্দার রিপোর্ট একজন সালারকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। অগত্যা রউফ কুর্দি উপরে উপরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর এই গোয়েন্দা লোকটিকে বরণ করে নেয় এবং খাতির-যত্ন করতে শুরু করে।

'আপনি মেয়ে দুটোকে প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছেন'– গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বললো– 'তাদের ব্যাপারে আপনার সামান্যতম সন্দেহ থাকলে বলুন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি তাদেরকে আসকালান নিয়ে যাবো।'

'না, এ যাবত তাদের মধ্যে সন্দেহজনক কোনো আচরণ দেখিনি'– রউফ কুর্দি উত্তর দেয়– 'বেশিরভাগ সময় তারা আল-ফারেসের কক্ষেই থাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে রউফ কুর্দির ফ্লোরির কথা মনে পড়ে যায়। গোয়েন্দা লোকটা যদি একদিন আগেও আসতো, তাহলে রউফ কুর্দি বলতো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কারণ, আমাদের কমান্ডার সারাক্ষণ এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এই গত রাতই ফ্লোরির সঙ্গে তার ভাব গড়ে ওঠেছে। রোজি তাদের এই গোপন সম্পর্কের সব জানে। রউফ কুর্দি এখন কোনো মূল্যে ফ্লোরিকে হারাতে চাচ্ছে না। তার অন্তরে আল-ফারেসের শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো বটে; কিন্তু ফ্লোরির ভাবনায় এখন আসল কথা বলা যাচ্ছে না।

'আমি আপনার সঙ্গে থাকবো'– গোয়েন্দা বললো– 'আল-ফারেস যেনো জানতে না পারে আমি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি। আপনি আদেশনামা পাঠ করেছেন। আমি নিজ চোখে দেখবো, মেয়ে দুটো কেমন এবং কী করে। মেয়েগুলো শত্রুর গোয়েন্দা হতে পারে। নাও যদি হয়, যদি শুধু এটুকু প্রমাণ পাই যে, আল-ফারেস কাজের সময়েও এদের নিয়ে নিমগ্ন থাকে, আমি তাদেরকে এখানে থাকতে দেবো না। আল-ফারেস যদি টের পেয়ে যান আমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করছি, তাহলে ধরে নেবো, তাকে বিষয়টা আপনি বলে দিয়েছেন। কারণ, আপনি ছাড়া আমার উদ্দেশ্য আর কেউ জানে না।'

এটি যুদ্ধজাহাজ। জাহাজে আমলা-কর্মচারি আছে। আছে নৌযুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থল বাহিনীও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য আছে অনেক কর্মচারি। কাজেই একজন লোকের পক্ষে নিজের আসল রূপ গোপন রেখে অবস্থান করা কঠিন নয়। আল্‌-ফারেস কমান্ডার। প্রত্যেককে আলাদা ডেকে ডেকে বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, ঐ লোকটি বহিরাগত। ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

গোয়েন্দা সেদিনই মেয়ে দুটোকে দেখে রউফ কুর্দিকে জানিয়ে দেয়– 'এরা যাযাবর মেয়ে নয়, বিপদগ্রস্তও নয়। আমার সন্দেহ জেগে গেছে।'

'ওরা অনেক দিন যাবত আমাদের সঙ্গে থাকছে'– রউফ কুর্দি বললো– 'আমরা তো সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি।'

'আমার গোয়েন্দা চোখ যা দেখে, আপনার চোখ তা দেখে না'– গোয়েন্দা বললো– 'শীতল অঞ্চলের যাযাবর নারীর গায়ের রং এমনই হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের চোখের রং এরূপ হয় না। তাছাড়া তাদের মধ্যে এমন সাজগোজ-পরিপাটিও থাকে না। মুহতারাম! আমরা এরূপ মেয়েদের সঙ্গেই যুদ্ধ করে থাকি। এই মেয়েগুলো এখানে থাকবে না।'

'ঠিক আছে, কিছুদিন দেখেন'– রউফ কুর্দি বললো– 'পাছে এমন না হয়, মেয়েগুলো আসলেই বিপদগ্রস্ত আর আপনি তাদেরকে আরেক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ'– গোয়েন্দা বললো– 'আমি তাড়াহুড়া করবো না। কয়েক দিন দেখেই তবে সিদ্ধান্ত নেবো।'

সুলতান আইউবী তাঁর সালাদের ঠিকই বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত খৃস্টান সেনাপতিরা জানে, ইসলামী ফৌজ বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। এদিকে সুলতান আইউবী তাঁর সালারদেরকে সর্বশেষ দিক-নির্দেশনা প্রদান করছেন, ওদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসে খৃস্টান হাইকমান্ড আপন সেনাপতিদেরকে অবরোধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছে।

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীকে পথে প্রতিহত করবো না'– খৃস্টানদের কমান্ডার ইন চীফ বললেন– 'তার বাহিনী সংখ্যায় আমাদের চেয়ে কম অবশ্যই। কিন্তু তার অস্ত্র ও রসদের কোন ভাবনা নেই। সাহায্য ব্যবস্থাপনা তার খুবই মজবুত ও বিশ্বস্ত। লোকটাকে বাইতুল মুকাদ্দাস

অবরোধ করতে দাও। আমাদের কাছে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মজুদ রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘ হতে হতে যদি খাদ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দেয়, তাহলে আমরা নগরীর মুসলমানদেরকে না খাইয়ে মারবো। তাতে আমাদের অনেক খাদ্য বেচে যাবে। আমার সবচে' বেশি ভরসা নাইটদের উপর। তারা বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করবে এবং ফিরে আসবে। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইউবীর অবরোধ ব্যর্থ হবে।'

'আপনি বাহিনীর অবস্থাকে বিবেচনায় আনেননি'– এক সেনাপতি বললো– 'নগরীতে অবস্থানরত বাহিনীর অর্ধেক এমন যে, তারা হিত্তীন থেকে আসকালান পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধগুলো থেকে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহায় ভাটা পড়ে গেছে। বরং এ কথা বললেও ভুল হবে না, এদের উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। যেসব সৈন্য বাইরের রণাঙ্গনগুলোতে যায়নি, তাদেরই শুধু মনোবল চাঙ্গা রয়েছে।'...

'আমরা এ সমস্যার সমাধান বের করে নিয়েছি'– কমান্ডার ইন চীফ বললেন– 'মহামান্য পাদ্রী ফৌজের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন। তিনি ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি দিয়ে সৈন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করা জরুরি। কেনো জরুরি তারও ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। এ-ও বোঝাচ্ছেন, এটা তোমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডারগণ যদি একে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে লড়াই করে, তাহলে সাধারণ সৈন্যরা ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। আমরা যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধে পরাজয়বরণ করি, তাহলে রোম উপসাগরও আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবী সফল হয়েছেন কেনো? কারণ, তিনি পাকা ধার্মিক। আমরা তাকে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি সে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। যেসব মুসলিম শাসককে আমরা তার বিরোধি বানিয়েছিলাম, তারা তার অনুগত হয়ে গেছে। আমরা আমাদের মেয়েদের দ্বারা তার সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের এই ত্যাগও বৃথা গেছে। এটা বোধ হয় আমাদের ভুলই ছিলো যে, আমরা মেয়েদের ব্যবহার করেছি এবং এই আশায় বসে ছিলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবী ঘরে বসেই মরে যাক।'...

'আমাদের কোনো ত্যাগ ব্যর্থ যায়নি'– সভায় উপস্থিত পোপ বললেন– 'আপনার এই চিন্তা ভুল যে, দু'টি ধর্মের যুদ্ধ শুধু সৈন্যরাই লড়ে থাকে। আপন ধর্মের বিজয়-প্রতিষ্ঠা এবং শত্রু ধর্মের ধ্বংসের জন্য তরবারী আবশ্যক বটে। কিন্তু শত্রুর চিন্তা-চেতনা বিনষ্টের জন্য সেই পদ্ধতিটি আবশ্যকীয় ছিলো, আপনি যার ব্যাপারে বলেছেন, আমাদের সেই ত্যাগ বৃথা গেছে। উঁচুমানের রূপের বদৌলতে আমাদের যে মেয়েদের পদস্থ শাসক-অফিসারদের স্ত্রী হয়ে রাজকীয় জীবন-যাপন করার কথা ছিলো, তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে ক্রুশের জন্য কুরবান করে মুসলমানদের হেরেমে অপদস্ত-লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ ঘটিয়েছে, মুসলিম শাসকদের ঈমান ক্রয় করে এনেছে। একই দেশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে একজনকে অপরজনের শত্রুতে পরিণত করেছে। এসব কীর্তির জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'...

'ক্রুশের সেনাপতিগণ! তোমরা ভুলে যেয়ো না, দুশমনকে খুন করার উত্তম পন্থা হচ্ছে তাদের মাঝে মানসিক বিলাসিতা ও যৌনতা সৃষ্টি করে দেয়া। তাদেরকে রাগ-রং ও কল্পনার সুখ-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। তাদের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতার মোহ ও বিত্তের গোলাম বানিয়ে তোলো। মুসলমান দুঃসাহসী সৈনিক। সামরিক চেতনা ও ধর্মযুদ্ধের (জিহাদের) উন্মাদনা মুসলমানদের মাঝে যতোটুকু আছে, ততোটুকু আমাদের মাঝে নেই। মুসলমান যে পরিমাণ সুদক্ষ সেনাপতি জন্ম দিয়েছে, আমরা তা পারিনি। এটা তাদের ধারা। আমরা যদি তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করতে না পারি, তাহলে তাদের এই চেতনা ও ধর্মীয় উন্মাদনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আর তা-ই যদি থাকে, তাহলে ক্রুশের পতন ঘটবে। ইসলাম ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষ পার হয়ে চীন পর্যন্ত চলে গেছে। চীনের নৌ-বাহিনী প্রধান একজন মুসলমান। ওখানকার অনেক সেনাপতি এখনো মুসলমান। হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চলে বড় বড় দ্বীপে গিয়ে দেখে আসো, সেখানেও আরব তথা মুসলমানদের শাসন দেখতে পাবে।'...

'আপনি এই প্লাবন শুধু তরবারী দ্বারা রুখতে পারবেন না। এর জন্য আপনাকে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ইসলামের যে কেন্দ্রটাকে মুসলমানরা খানায়ে কা'বা বলে থাকে, তাকে নিষ্প্রাণ করে দিতে হবে।

বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল অটুট রাখতে হবে। মুসলমান শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ যে যেখানে থাকুন না কেনো, সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে অথর্ব করে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের হেরেমে আমাদের অভিজ্ঞ মেয়েদেরকে ঠিক সেভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যেভাবে আরবের রাজ্যগুলোতে ঢুকিয়ে রেখেছে। এই পন্থাটা আমরা ইহুদীদের নিকট থেকে শিখেছি। তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস ও ধর্মের মূলোৎপাটনে বেশ চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছে এবং সে অনুপাতে কাজও করছে। তারা আমাদেরকে সাহায্য প্রদান করছে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অনতিবিলম্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আমাদের একক দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তার আশপাশের দূর-দূরান্তের অঞ্চলও আমাদের দখলে এসে যাবে। মুসলিম রাজ্যগুলো খণ্ডিত হয়ে হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। অন্তত তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। ইহুদীদের বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমান নিজেদেরকে রাজার আসনে আসীন ভাববে বটে; কিন্তু রাজত্ব ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বাগডোর আমাদের হাতে থাকবে। এ কাজটা আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিন। এই গোপন ও আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞজন ও ধর্মী নেতাদের। আপনি সৈনিক। যুদ্ধের ময়দানের কথা বলুন। আপনার অতিশয় ভয়ঙ্কর এক শত্রু বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। তাকে কীভাবে পরাজিত করবেন চিন্তা করুন।'

এক রবিবারের সকাল বেলা। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ। সুলতান আইউবী বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যান। হিজরী ক্যালেন্ডার মোতাবেক দিনটি ৫৮৩ হিজরীর ১৫ রজব। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবীর জন্য অপেক্ষমান ছিলো। কিন্তু সুলতান এতো দ্রুত এসে পড়বেন তারা ভাবেনি। তিনি পথে উঁচুতে অবস্থিত ক্রুসেডারদের দুর্গ ও পোস্টগুলোকে এড়িয়ে এগিয়ে যান। দুর্গগুলো থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সময়ের আগে সংবাদ পৌঁছোনোর জন্য দূত প্রেরণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা একজনও গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তার প্রমাণ, রাতভর পথ চলে ভোরবেলা সুলতান আইউবীর সম্মুখ ইউনিট যখন শহর গিয়ে পৌঁছে, তখন নগরীর প্রাচীরের উপর দু'-চারজন

সান্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলো মাত্র। নগরীর ফটক বন্ধ ছিলো। ভেতর থেকে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

নাকাড়া ও বিউগল বেজে ওঠে। প্রাচীরের উপর চতুর্দিকে একের পর এক মাথা উত্থিত হতে শুরু করে। লোহার টুপি পরিহিত মাথাগুলো। সকলের হাতে ধনুক। ধীরে ধীরে মাথার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মনে হলো, যেনো প্রাচীরের উপর মানবমুণ্ডের আরেক প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে। নগরীর পশ্চিম দিকে খোলামেলা একটি অঞ্চল। সুলতান আইউবী তাঁর বাহিনীকে সেখানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে নিজে দেখতে চলে গেছেন, প্রাচীর কোন্‌দিক থেকে দুর্বল, কোন্ স্থানে ছিদ্র করা যায় এবং কোথাও থেকে সুড়ঙ্গ খনন করা যায় কিনা। শত্রুর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ছিদ্র করার জন্য সুলতান আইউবীর আছে একদল বিখ্যাত জানবাজ সৈনিক।

ইসলামী ফৌজ নগরীর চারদিকে অবস্থান করছে। বড় সমাবেশটা পশ্চিম প্রান্তে। সুলতান আইউবী নগরীর চারদিকে ঘুরে-ফিরে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করছেন। পশ্চিম দিকে অবস্থানরত বাহিনীর সালার আগুন ও পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করতে শুরু করেছে। ক্রুসেডাররা তাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মোতাবেক নগরীর একটি ফটক খুলে দেয়। প্রথমে বর্মপরিহিত নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা তাক করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়ে এবং মিনজানিক স্থাপনরত মুসলিম সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা বেরিয়ে আসামাত্র ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

বেশ প্রশস্ত জায়গা। ঘোড়ার ছুটে চলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। নাইটরা বর্মপরিহিত। তীর তাদের গায়ে কোনো ক্রিয়া করতে পারছে না। তাছাড়া তাদের এই আক্রমণ এতোই আকস্মিক, তীব্র ও অপ্রত্যাশিত ছিলো যে, মুসলিম সৈন্যরা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। বেশ ক'জন মুসলিম সৈন্য নাইটদের বর্শার আঘাতে আহত ও শহীদ হয়ে যায়। অনেকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করে উল্কার ন্যায় ছুটে আসা নাইটরা ঝড়ের ন্যায় কেটে পড়ে। ফটক খুলে যায়। তারা নগরীতে ঢুকে পড়ে। আবার ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

ময়দানে আহত মুসলিম সৈন্যরা ছট্‌ফট্ করছে। অক্ষত সৈনিকরা তাদের তুলে আনতে ছুটে যায়। এমন সময় দু'-তিনটি নারীকণ্ঠ ভেসে

ওঠে– 'সরে যাও, এ কাজ আমাদের।' সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে আসে। তারা গাছের ডালের তৈরি স্ট্রেচার নিয়ে আসে। কয়েকজনের কাঁধে পানির মশক। উপর থেকে খৃস্টানদের তীর ছুটে আসছে। সেই তীরের আঘাতে দু'-তিনটি মেয়ে লুটিয়ে পড়ে। দেখে মুসলিম তীরন্দাজ সৈন্যরা এগিয়ে আসে। তারা পাল্টা তীর ছুঁড়তে শুরু করে। এবার নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আসা তীরবৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। উভয় দিকের তীরের ছায়ায় মেয়েরা জখমীদের তুলে পেছনে গাছের ছায়ায় নিয়ে যায়।

সে যুগের কাহিনীকার আসাদুল আসাদী তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, সৈনিকরা যে কোনো যুদ্ধেই আহত হতো, তাদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু এই সেবাটা করতো তাদেরই ন্যায় পুরুষ সৈনিকরা। এ কাজে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করতো না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের এই অবরোধ যুদ্ধে এ কাজের জন্য কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে আসে। তারা জখমীদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যায়। নিজ হাতে ক্ষতস্থানে পট্টি বাধে এবং আহতদের মাথা কোলে তুলে নিয়ে পানি পান করায়। কয়েকজন জখমী উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠে– 'এই জখম আমাদেরকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।' কেউ বলে– 'আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করেই তবে জখমে পট্টি বাঁধবো।' আহতরা যখন দেখলো, তিন-চারটি মেয়েও তীরবিদ্ধ হয়েছে, তখন তাদেরকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মেয়েরা সৈনিকদের জোশ-জযবায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

উক্ত স্থানেই মিনজানিক স্থাপন করার জন্য আরেকটি বিশেষজ্ঞ সেনাদল এগিয়ে আসে। তীরন্দাজি তীব্র করে দেয়া হয়। মিনজানিক স্থাপিত হয়ে যায়। সেগুলোর সাহায্যে ভারি পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। পাথর-গোলা প্রাচীরের উপর এবং প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরেও নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

ফটক আরেকবার খুলে যায়। নাইটদের ঘোড়াগুলো মিনজানিকের দিকে বাতাসের গতিতে ধেয়ে আসে। এবার এক পার্শ্ব থেকে মুসলিম অশ্বারোহী দল শকুনের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেছন থেকে আরেকটি দল তাদের পলায়নের পথ বন্ধ করার জন্য এগিয়ে আসে। মুসলমানরা বর্শা ও তরবারীর সাহায্যে নাইটদের ঘোড়াগুলোকে আহত করতে শুরু করে।

কিন্তু লোহার বর্ম-শিরস্ত্রাণ নাইটদেরকে অক্ষত ও নিরাপদ রাখে।

আহত ঘোড়াগুলোর সঙ্গে অক্ষত নাইটরাও ভূ-তলে লুটিয়ে পড়তে শুরু করে। এ অবস্থায় তাদেরকে ঘায়েল করা কঠিন ছিলো না। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। ঘায়েল করা সম্ভব হলো না। উল্টো তারা কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এবার ফিরে যেতে উদ্যত হলে মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বহাল থাকা নাইটরা মুসলমানদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর এই ধারা চলতে থাকে। বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর পশ্চিমে প্রাচীরের বাইরে এরূপ যে যুদ্ধ লড়া হয়েছিলো, গতি, তীব্রতা, রক্তক্ষরণ ও উভয় পক্ষের বীরত্বের দিক থেকে তাকে 'নজিরবিহীন' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে উভয় বাহিনীর প্রত্যয় ও দৃঢ়তা অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিম-খৃস্টান উভয় পক্ষের উপর উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। যেসব খৃস্টান অশ্বারোহী আহত হয়ে বাইরে পড়েছিলো, তারা ছিলো হতভাগ্য। তাদের তুলে নিয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাবার মতো কেউ ছিলো না। একে তো সেপ্টেম্বর মাস– গরমের মওসুম, তদুপরি সময়টা দ্বি-প্রহর। আহত খৃস্টান নাইটরা লোহার পোশাকের ভেতর পুড়ে মরতে শুরু করে। বিপরীতে মুসলিম জখমীদেরকে নারী স্বেচ্ছাসেবীরা আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে পানি পান করাতো, মুখ-মাথা ধুয়ে দিতো এবং পোশাক পরিবর্তন করে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। কয়েকটি মেয়ে মশক ভরে কোথাও থেকে পানি এনে এনে আধমরা হয়ে গিয়েছিলো।

খচ্চর গাড়িগুলো ভারি ভারি পাথর কুড়িয়ে এনে সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত। মিনজানিকগুলো রাতেও প্রাচীরের উপর এবং ভেতরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের দিকেও পাথর ও আগুনের গোলা আসতে শুরু করে। পেছনে সলিতাওয়ালা তীর এসে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'-তিনটি মিনজানিক আগুনের কবলে এসে পড়ে। সেগুলোর প্রকৌশলীগণ আগুনে ঝলসে যায়। তবু পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে।

প্রাচীরের অন্যান্য দিক থেকেও পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বাইরে কোথাও কোথাও ভূমি উঁচু ছিলো। সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর-গোলা প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে

যেতো। তার পেছনে পেছনে সলিতাওয়ালা অগ্নিতীরও চলে যেতো। মুসলিম সৈন্যরা নগরীতে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাইরে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছিলো।

যেসব খৃস্টান সৈন্য পূর্ব থেকে নগরীর ভেতরে ছিলো, তাদের মনোবল শক্ত। অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদের কতিপয়ের অবস্থা হচ্ছে, তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর এবং কতিপয় ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু এখন সকলে কোমর বেঁধে মোকাবেলা করছে। তাদের জোশ ও মনোবল দেখে মনে হচ্ছে, তারা সুলতান আইউবীকে পিছু না হটিয়ে ছাড়বে না। অপর একটি ফটক অতিক্রম করেও একটি অশ্বারোহী বাহিনী বাইরে গিয়ে অবরোধের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা সৈনিকদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের মাঝে আক্রা-আসকালান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা উদ্বাস্তুও রয়েছে। তারা আপাদমস্তক ত্রাসের প্রতীক হয়ে আছে। শহরময় তারা আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা তাদের চোখের সামনে কয়েকটি জনবসতিকে পুড়িয়ে দিয়েছিলো।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সবক'টি গীর্জার ঘণ্টা অনবরত বেজে চলছে। দিন-রাত এক হয়ে গেছে। খৃস্টানরা গীর্জায় গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। পাদ্রীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনার গান গাইছে। নগরীর বাইরে সুলতান আইউবীর সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনি নগরীর ভেতরে এমন শোনা যাচ্ছে, যেনো অনবরত বজ্রপাত হচ্ছে। প্রজ্বলমান অগ্নিশিখা খৃস্টানদের দম নাকের আগায় এনে রেখেছে। সুলতান আইউবীর যেসব গোয়েন্দা খৃস্টান বেশে নগরীতে অবস্থান করছে, তারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। একটি গুজব এই ছড়ানো হয় যে, সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করবেন না। নগরীটা ধ্বংস করে তিনি সকল খৃস্টানকে হত্যা করে ফেলবেন এবং তাদের যুবতী মেয়ে ও সকল মুসলিম অধিবাসীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আতঙ্কের সবচে' বড় কারণ ছিলো, খৃস্টানদের বড় ক্রুশটা সুলতান আইউবীর দখলে। তার অর্থ হচ্ছে, যীশুখৃস্ট খৃস্টানদের প্রতি নারাজ। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত তারা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য, নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিলো, সেই অপরাধবোধ তাদের তাড়া করে ফিরছিলো। তারা

তাদের বিশ্বাস মোতাবেক গীর্জায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে

বর্তমান শতাব্দীর এক আমেরিকান ইতিহাসবিদ এ্যান্থনি ওয়েস্ট বেশ ক'জন ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরুদ্ধ খৃস্টানরা এতোই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, বহু খৃস্টান রাস্তায়-গলিতে বেরিয়ে আসে। কেউ হায় হায় করে বুক চাপড়াতে শুরু করে এবং কেউ কেউ নিজেই নিজেকে বেত্রাঘাত শুরু করে। তাদের বিশ্বাস মতে, এটি খোদার নিকট পাপের ক্ষমা লাভের একটি পন্থা। খৃস্টান যুবতী মেয়েদের মায়েরা তাদের মাথার চুল ন্যাড়া করে দেয় এবং তাদের পানিতে নামিয়ে ডুব দেয়াতে শুরু করে। তাদের বিশ্বাস ছিলো, এভাবে মেয়েরা সম্ভ্রম খোয়ানো থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। পাদ্রীরা তাদেরকে এই ভীতি ও শঙ্কা থেকে মুক্তি দেয়ার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের অভয় বাণী কোনো ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়।

মুসলমান অধিবাসীদের অবস্থা ছিলো ভিন্ন রকম। তিন হাজারের অধিক মুসলিম পুরুষ, নারী ও শিশু বন্দি ছিলো। যারা বাড়ি-ঘরে ছিলো, তারা নজরবন্দির জীবন-যাপন করছিলো। খৃস্টানদের ভয়ে তারা মসজিদে যেতো না। সকল মুসলমান জেনে ফেলেছে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছেন। খৃস্টানদের ভীতি ও কাপুরুষতা দেখে কয়েকটি উত্তেজিত মুসলিম যুবক বাড়ির ছাদে ওঠে আযান দিতে শুরু করে। মহিলারা ঘরে-কারাগারে যে যেখানে ছিলো, মহান আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দুআ-দরূদ পাঠ করতে শুরু করে।

খৃস্টানরা তাদের দেখেও নিশ্চুপ থাকে। কেউ কিছু বলছে না। কারণ, তারা বুঝে গেছে, তারা মুসলমানদের উপর যে নিপীড়িন চালিয়েছিলো, তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। এখন অনাগত শাস্তির ভয়েই তারা কাঁপছে। তাই এখন মুসলমানদের কোনো কাজে বাঁধা দেয়ার হিম্মত তাদের নেই। খৃস্টানদের এই মনোভাব আন্দাজ করে মুসলিম যুবকরা অলি-গলিতে চীৎকার করতে শুরু করে– 'ইমাম মাহদী এসে পড়েছেন। আমাদের মুক্তিদাতা এসে গেছেন। তিনি নগরীর দেয়ালের উপর দিয়ে আসছেন। ফটক ভেঙে আসছেন।'

নগরীর ভেতরে হক ও বাতিলের, গীর্জার ঘণ্টা ও আযান ধ্বনির সংঘর্ষ চলছে। বাইরে চলছে ঘোড়া, তরবারী ও তীর-বর্শার যুদ্ধ। খৃস্টানদের

গীর্জাগুলোতে প্রার্থনা গীতও উচ্চ হচ্ছে। সেই তালে তালে কুরআন তিলাওয়াতের সুরও উঁচু হচ্ছে। অবুঝ শিশুরাও মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে আছে।

কিন্তু বাইরে সুলতান আইউবী এখনো কোথাও থেকে প্রাচীর ভাঙার কিংবা সুড়ঙ্গ খনন করার ব্যবস্থা করে ওঠতে পারেননি। প্রাচীরের উপর থেকে বাইরের দিকে মুষলধারা বৃষ্টির ন্যায় তীর আসছে। মিনজানিক চালনাকারী ও পাথর বহনকারী মুসলিম সৈনিকদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে। বর্মপরিহিত নাইটরা এখনো থেকে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করছে এবং যানপরনাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়ে ফিরে যাচ্ছে।

চল্লিশ মাইল দূরে রোম উপসাগরে আল-ফারেস বায়দারীনের ছয়টি জাহাজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। উদ্দেশ্য, যাতে টায়েরে অবস্থানরত খৃষ্টানদের নৌবহর সৈন্য ও সরঞ্জামাদি নিয়ে আসতে না পারে। মেয়ে দুটো তার জাহাজে আছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি তাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। নৌ-বাহিনী প্রধান আল-মুহসিন তার উপর অতিশয় স্পর্শকাতর দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছেন। কখনো কখনো নিজে মাস্তুলের উপর পাতা মাচানে উঠে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত গভীর চোখে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করছেন। অন্যান্য জাহাজে গিয়েও খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, যাতে কেউ দায়িত্বে অবহেলা না করে।

এদিকে নায়েব রউফ কুর্দি ফ্লোরির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যা এখন অনেকটা গোপন অভিসারের রূপ লাভ করেছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা উভয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে চলছে।

মিসরে নৌবহর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। আশঙ্কা আছে, ইউরোপ থেকে বিশেষত ইংল্যান্ড থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য আসবে। সুলতান আইউবীর ঝড়গতির অগ্রযাত্রা এবং খৃষ্টানদের প্রতিটি দুর্গ ও নগরীর উপর সফল আক্রমণের প্রেক্ষিতে তারা জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডকে এ মর্মে পত্র লিখেছে যে, আরব থেকে ক্রুশের পতন ঘটছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করা কঠিন মনে হচ্ছে। তোমরা আসো, আমাদেরকে সাহায্য করো। বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ রোম উপসাগরেও অনুষ্ঠিত হোক এবং যুদ্ধ অনেক ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করুক, তা সুলতান আইউবীর

কাম্য। কিন্তু জার্মানি ও ইংল্যান্ড থেকে কোনো তৎপরতার সংবাদ আসছে না। পরাজিত খৃস্টান বাহিনীর নৌবহর টায়েরের বন্দর অঞ্চলে চুপচাপ বসে আছে। তথাপি সুলতান আইউবীর নৌবাহিনী প্রধান দুশমনের নৌবাহিনীর এই নীরবতাকে বিপদের পূর্ব সংকেত মনে করছেন। তাই তিনি পূর্ণ সতর্ক রয়েছেন।

অবরোধের চতুর্থ রাত। এখনো কোনো সফলতা অর্জিত হয়নি। খৃস্টান ও অন্যান্য অশ্বারোহী সেনারা বাইরে এসে অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালাচ্ছে এবং মানুষ ও পশুদের জীবনহানির ঝুঁকি বরণ করছে। চার দিনের আহত ও শহীদদের হিসাব নেয়ার পর সুলতান আইউবীর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তার অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব নেই। বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে তিনি দীর্ঘ যুদ্ধ লড়ার জন্য বিপুল অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিয়েছেন। তার অভাব শুধু লোকের। সেনাসংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর তার জন্য যথারীতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চাম দিন সুলতান আইউবী পশ্চিম দিককার ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেন এবং সেখানকার যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। দক্ষিণ দিকে এক স্থানে প্রাচীর দুর্বল পেয়েছেন। পশ্চিম দিক থেকে মিনজানিকগুলো সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং দূরে পেছনে যে তাঁবু স্থাপন করা ছিলো, সেগুলো তুলে নেয়া হয়েছে। চিত্রটা এমন, যেনো সুলতান আইউবী অবরোধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। প্রাচীরের উপর যেসব খৃস্টান নাগরিক ছিলো, তারা নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, অবরোধ উঠে গেছে এবং মুসলিম সৈন্যরা পেছনে সরে যাচ্ছে। সুলতান আইউবী প্রাচীর থেকে দূরে বাহিনীকে স্থানান্তরিত করছেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নগরীতে খৃস্টানরা ভীতি, শঙ্কা, হা-হুতাশ ও প্রার্থনার স্থলে উল্লাসে মেতে ওঠে। সারারাত তারা গীর্জায় সমবেত হয়ে খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করে। এই সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা নিজেদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছিলো, তারা নবউদ্যমে মুসলমান নাগরিকদের উপর নিপীড়ন চালানোর পরিকল্পনা আঁটতে বসে গেছে। তিরস্কার ও গালাগাল দ্বারা তারা তার উদ্বোধন করে। মুসলমানরা স্তব্ধ, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

পরদিন শুক্রবার। ১১৮৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। খৃষ্টানরা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো, দক্ষিণ দিকে যাইতুন পর্বতের উপর সুলতান আইউবীর পতাকা উড়ছে এবং তার সম্মুখে প্রাচীর থেকে সামান্য দূরে মুসলমানরা মিনজানিক স্থাপন করেছে ও অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে কমপক্ষে দশ হাজার সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পজিশন ও প্লান পরিবর্তন করে সুলতান আইউবী জুমার দিন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ চালান।

নগরীর উপর পাথর ও আগুনের গোলা পূর্বাপেক্ষা বেশি নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। তৎক্ষণাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ে, মুসলমানদের আরো বেশি ফৌজ এসে পড়েছে এবং নগরী এখন এক-দু'দিনের মেহমান মাত্র। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নগরীতে আতঙ্কের নতুন ধারা শুরু হয়ে যায়। খৃষ্টানরা ঘর থেকে বের হয়ে অলি-গলি ও হাট-বাজারে হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। মুসলমানদের আযান পুনর্বার ধ্বনিত হতে শুরু করে। খৃষ্টানদের করুণ অবস্থায় স্বয়ং পাদ্রীও প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি ক্রুশ হাতে অলিতে-গলিতে ঘুরতে শুরু করেন। তিনিও কাঁদছেন এবং প্রার্থনা করছেন।

খৃষ্টান অশ্বরোহীগণ পুনরায় বের হয়ে মুসলমানদের মিনজানিকগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই যুদ্ধ এখন সুলতান আইউবী নিজে তদারক করছেন। তাঁর অশ্বারোহী সেনারা তিন দিক থেকে খৃষ্টান সৈনিকদের উপর দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পিষে ফেলে। পরে খৃষ্টানরা আরো দু'বার বেরিয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম সৈনিকরা তাদেরকে ফটক থেকে বেশি এগুতে দেয়নি। সুলতান আইউবী প্রথমবারের মতো সুড়ঙ্গ খনন ও প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য সম্মুখে বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে ঢাল। তারা এই ঢালের পেছনে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যায়। তাছাড়া প্রাচীরের যে অংশটির নীচে সুড়ঙ্গ খনন কিংবা প্রাচীর ভাঙা হবে, সুলতান আইউবীর তীরন্দাজ সৈন্যরা অত্যন্ত তীব্রতার সাথে তার উপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে।

সেখানে একটি ফটক আছে, যার উপর ভবন নির্মিত আছে। সে ফটকের পেছনে অনুরূপ আরো একটি মজবুত ফটক আছে। দুই ফটকের মাঝে দেউড়ি। এই দেউড়ির উপরও একটি ভবন। সুলতান আইউবী

তারই নীচে সুড়ঙ্গ খনন করাতে চাচ্ছেন। এই ফটকের একটু দূরে প্রাচীর খানিকটা দুর্বল মনে হলো। বড় মিনজানিকগুলো তার উপর কয়েক মণ ওজনের পাথর নিক্ষেপ করে চলছে। প্রাচীরটা বেশ চওড়া। কিন্তু অনবরত একই স্থানে পাথর নিক্ষেপের ফলে তাতে ফাটল ধরে যায়। পাথরের বিস্ফোরণ নগরবাসীদের রক্ত শুকিয়ে ফেলতে শুরু করে।

দিনের বেলা বাহিনী ঢালের আড়ালে ও তীরের ছায়ায় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখন উপর থেকে তাদের উপর তীর ছোঁড়া হচ্ছে না। রাতে কয়েকশ' জানবাজ মিলে দেউড়ির নীচে ত্রিশ গজ লম্বা সুড়ঙ্গ খনন করে ফেলে, যা দেউড়িরই সমান চওড়া। এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘাস ও শুকনো কাঠ ভরে তার উপর তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। জানবাজ সেনারা সেখান থেকে সরে আসে।

আগুনে সবকিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। উপর থেকে ভবনটাও ধসে পড়তে শুরু করে। একসময় ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভবনটি পড়ে গুড়িয়ে যায়। ওদিকে প্রাচীরের উপর যে স্থানে ভারী ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, সেখানেও প্রাচীর ভেঙে পথ বেরিয়ে আসে। এবার ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশ করার পালা। কিন্তু এ বড় বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ধ্বংসাবশেষ সরানোর অভিযান শুরু হয়ে যায়।

নগরীর গীর্জাগুলোর ঘণ্টা আরো জোরে বাজতে শুরু করেছে। সুললিত আযানের পবিত্র ও জয়সূচক ধ্বনিও তীব্র হয়ে ওঠেছে। খৃস্টান সেনাপতি-সম্রাটদের মনোবলেও ভাটা এসে পড়েছে। তারা বৈঠকে বসেছেন। সেনাপতিরা প্রস্তাব পেশ করেছে, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী জনসাধারণ সকলে মিলে একযোগে বাইরে বেরিয়ে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পোপ এ প্রস্তাব এই বলে নাকচ করে দেন যে, এ পন্থা অবলম্বন করলে নগরীতে শুধু নারী ও শিশুরা রয়ে যাবে, যারা মুসলমানদের প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হবে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তারা সুলতান আইউবীর সঙ্গে সন্ধি করবে। এক খৃস্টান নেতা বালিয়ানকে এ কাজে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

বাইরে থেকে সুলতান আইউবীর সৈন্যরা দেখে, ফটকের বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষের উপর সাদা পতাকা উড়ছে। তীরন্দাজদের থামিয়ে দেয়া হলো। পতাকার সঙ্গে তিন-চারজন লোকও আত্মপ্রকাশ করে।

একজন উচ্চস্বরে বললো– 'আমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।' সুলতান আইউবী ঘোষণাটা শুনলেন। বললেন– 'ওদেরকে নিয়ে আসো।'

সুলতান আইউবী তাদের স্বাগত জানান এবং তাঁবুতে নিয়ে বসান। দলনেতা বালিয়ান কথা শুরু করে– 'আপনি অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যান।' সুলতান আইউবী শর্ত আরোপ করেন। আসলে খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল ছাড়তে চাচ্ছে না। আর সুলতান আইউবীও বাইতুল মুকাদ্দাস না নিয়ে নড়তে রাজি নন। অথচ তাঁর একজন সৈনিকও এ পর্যন্ত নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি এখনো দাবি করতে পারছেন না, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে ফেলেছেন। খৃস্টানরা এখনো বলতে পারে, বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের দখলে।

একদিকে সন্ধির আলোচনা চলছে, অপরদিকে অবরোধ যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। সুলতান আইউবী আলোচনা ও সন্ধি চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছেন। প্রাচীরের ছিদ্র এখন বিস্তৃত হয়ে গেছে। মুসলিম জানবাজরা বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে এবং প্রাচীরভাঙা পথে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। কিন্তু খৃস্টানদের দৃঢ় প্রত্যয়, তারা নগরী হাতছাড়া করবে না। তারা উভয় স্থান থেকে আক্রমণকারীদের বাইরে ঠেলে দেয়। বাইরে থেকে সৈন্যরা স্রোতের ন্যায় এগিয়ে যায়। সম্মুখভাগের সৈনিকরা খৃস্টানদের তীর ও বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। পেছনের সৈনিকরা তাদের পদপৃষ্ঠ করে করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকে। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক জানবাজ নগরীর প্রধান ফটকের উপর লাল ক্রস খচিত পতাকাটা সরিয়ে সেখানে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়। খৃস্টান জনসাধারণ এমন হুলস্থুল শুরু করে দেয় যে, তারা সৈন্যদের জন্য প্রতিবন্ধক ও সমস্যারূপে আবির্ভূত হয়।

সুলতান আইউবীর জানবাজরা পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাদের কতিপয় মসজিদে আকসায় ঢুকে উপর থেকে ক্রুশটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে। সেখানেও ইসলামী পতাকা উড়তে শুরু করে। কিন্তু নগরীতে উভয় বাহিনী ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, ক্রুসেডারদের হিংস্রতা ও প্রতিরোধ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী খৃস্টান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করছেন। বাইরের এবং নগরীর ভেতরের নতুন কোনো সংবাদ এখনো তিনি জানেন না। তিনি বালিয়ানকে বললেন– 'আমি বাইতুল মুকাদ্দাসকে শক্তির জোরে মুক্ত করবো বলে কসম খেয়েছি। আপনারা যদি নগরীটা আমাকে এমনভাবে দিয়ে দেন, যেনো আমি জয় করেছি, তাহলে সন্ধি করা যেতে পারে।'

'সালাহুদ্দীন!'– বালিয়ান খানিকটা হুমকির সুরে বললো– 'এ নগরীর নাম এখনো জেরুজালেম– বাইতুল মুকাদ্দাস নয়। আপনি যদি সন্ধি করতে সম্মত না হন, তাহলে আমরা আপনাকে বাধ্য করবো না। তবে শুনে রাখুন, এই নগরীতে আপনার চার হাজার সৈনিক আমাদের যুদ্ধবন্দি আছে। আমাদের কাছে আটক সাধারণ মুসলমান কয়েদির সংখ্যা তিন হাজার। আমরা এই প্রত্যেক কয়েদি এবং নগরীর প্রতিজন মুসলিম অধিবাসীকে– চাই সে নারী হোক কিংবা শিশু, যুবক হোক বা বৃদ্ধ– হত্যা করে ফেলবো।'

রাগে-ক্ষোভে সুলতান আইউবীর চোখ দুটো লাল হয়ে যায়। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। কিছু বলতে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁবুর পর্দা ফাঁক হয়ে যায়। তাঁর এক কমান্ডার এসেছে। সুলতান তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নেন। কমান্ডার সুলতানের কানে ফিসফিস শব্দে বললো– 'নগরী জয় হয়ে গেছে। প্রধান ফটক ও মসজিদে আকসার উপর ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

সুলতান আইউবী বালিয়ানের হুমকির জবাব পেয়ে গেছেন। তাঁর রক্তজবার ন্যায় লাল চোখে অস্বাভাবিক এক ঝিলিক ভেসে ওঠে। তিনি সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মেরে খৃস্টান নেতা বালিয়ানকে বললেন– 'বিজেতা পরাজিতের সঙ্গে সন্ধি আলোচনা করে না। একজন মুসলমানও আর তোমাদের কয়েদি নেই।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবী সব সময় অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে কথা বলতেন। সেদিনও একই নিয়মে বলছিলেন। কিন্তু বালিয়ানের হুমকির সঙ্গে সঙ্গে জয়ের সংবাদে তাঁর কণ্ঠে রোষ ও গর্জন সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বললেন– 'তোমরা সকলে আমার বন্দি। তোমাদের সমস্ত ফৌজ আমার কয়েদি। নগরীতে অবস্থানরত প্রতিজন খৃস্টান আমার কয়েদি। এই নগরী থেকে এখন একজন খৃস্টানও আমার

নির্ধারিত ফি আদায় না করে বের হতে পারবে না। যাও, ভেতরে গিয়ে দেখো, ওটা জেরুজালেম নয়– বাইতুল মুকাদ্দাস।'

বালিয়ান ও তার সঙ্গের খৃস্টানরা ভয় পেয়ে যায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখে। সুলতান আইউবীর অধিকাংশ সৈন্য ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রধান ফটকের উপর ইসলামী পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ খৃস্টাব্দের ২ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়ী বেশে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। হতে পারে ঘটনাটা কাকতালীয় কিংবা সুলতান আইউবী পরিকল্পনাটাই এভাবে প্রণয়ন করেছিলেন অথবা মহান আল্লাহর ইচ্ছাই এমন ছিলো। একে তো শুক্রবার, সুলতান আইউবীর মহৎ কাজের মহান দিবস। তদুপরি রজবের সাতাশতম রাত। এ রাতে রাসূলে আকরাম (সা.) উক্ত স্থান থেকেই পবিত্র মিরাজে গমন করেছিলেন। সকল মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের এ তারিখই লিখেছেন।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী যখন নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন মুসলমানরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মহিলার মাথার ওড়না খুলে খুলে সুলতানের চলার পথে ছুঁড়ে দিয়ে সুলতানকে স্বাগত জানায়। সুলতানের দেহরক্ষীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওড়নাগুলো রাস্তা থেকে তুলে নেয়।

দীর্ঘ অমানুষিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট মুসলমানরা চীৎকার করে করে তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকে। অনেকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। অশ্রু নেমে আসে সকলেরই চোখে। সে এক আবেগঘন ও বেদনাবিধূর দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মোতাবেক সুলতান আইউবী এতোটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, জনতার ধ্বনির উত্তরে তিনি হাত দুটো উঁচু করে নাড়াতে থাকেন ঠিক, কিন্তু ঠোঁটে হাসির বাষ্পও ছিলো না। বরং তিনি উভয় ঠোঁট একত্রিত করে দাঁতে চেপে ধরে আবেগ দমন করার এবং হেঁচকি প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন।

খৃস্টান নাগরিকরা নিজ নিজ ঘরে নিস্তব্ধ বসে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তারা তাদের যুবতী কন্যাদেরকে লুকিয়ে ফেলে। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, অনেকে মেয়েদেরকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস ছিলো, মুসলিম সৈনিকরা মুসলিম নারীদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক

লেনপোল লিখেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবীর বাহিনী যখন খৃস্টান বাহিনী থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর দখল বুঝে নিচ্ছিলো, তখন তিনি যে পরিমাণ উদারতা ও উন্নত চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমনি অতীতে কখনো করেননি। তাঁর নির্দেশে তাঁর বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারগণ নগরীর শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার জন্য রাস্তায়-গলিতে টহল দিতে নেমে পড়েছিলো। কোনো মুসলিম নাগরিক যেনো কোনো খৃস্টান নাগরিকের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ না করে বসে, সেদিকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তবে কোনো খৃস্টান নাগরিকের নগরী থেকে বের হওয়ার অনুমতি ছিলো না।

সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় গমন করেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি মসজিদের বারান্দায় যেনো উপুড় হয়ে পড়ে যান। তিনি মসজিদেয় বারান্দাতেই সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ও আহমদ মিসরীর বর্ণনা মোতাবেক সুলতান আইউবীর চোখ থেকে এমন ধারায় অশ্রু ঝরতে শুরু করে, যেনো তিনি এই মহান মসজিদটি চোখের পানিতে ধৌত করছিলেন।

মসজিদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। কয়েকজন মুসলিম শাসক আপন আপন শাসনামলে মসজিদে সোনা-রূপার ঝাড়বাতি ও দীপাধার স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ মসজিদে নানা রকম মূল্যবান উপহার সামগ্রীও রেখেছিলেন। খৃস্টানরা সে সকল ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান সম্পদ ও স্মৃতি চিহ্নগুলো তুলে নিয়ে গেছে। মসজিদের মেঝে থেকে স্থানে স্থানে মর্মরের পাত উধাও হয়ে গেছে। মেরামত ছাড়া মসজিদটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো।

মসজিদ মেরামতের প্রতি মনোনিবেশ করার আগে সুলতান আইউবী পরাজিত খৃস্টানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি মনে করেন। তিনি উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করেন, প্রতিজন খৃস্টান পুরুষ দশ দিনার, মহিলারা পাঁচ দিনার এবং শিশুরা এক দিনার করে পণ আদায় করে নগরী থেকে বেরিয়ে যাবে। একজন খৃস্টানও সেখানে থাকতে প্রস্তুত ছিলো না। দীর্ঘদিনের অপরাধবোধ তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে যেতে তাড়া করে ফিরছিলো। পশ্চিম দিককার ফটক খুলে দিয়ে সেখানে পণ আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খৃস্টানরা বেরিয়ে যেতে শুরু করে। সর্বপ্রথম খৃস্টান নেতা বালিয়ান

নগরী থেকে বের হয়। তার নিকট ইংল্যান্ডের রাজা হেনরির প্রেরিত বিপুল অর্থ ছিলো। সেখান থেকে ত্রিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে সে দশ হাজার খৃস্টানকে মুক্ত করে নেয়।

ফটকে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগকারী খৃস্টানদের ভিড় জমে যায়। তারা গোটা পরিবারের পণ আদায় করে করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিজিত নগরীকে বিজয়ী বাহিনীর নির্বিচার লুণ্ঠন করা একটি সাধারণ নিয়ম। বাইতুল মুকাদ্দাস তো সেই নগরী, যেখানে জয়লাভের পর খৃস্টানরা মুসলমানদের গণহত্যা করেছিলো, তাদের বাড়ি-ঘর লুট করেছিলো, যুবতী কন্যা ও মসজিদগুলোর অবমাননা করেছিলো। কিন্তু সেই বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করার পর লুটপাটের পরিবর্তে সুলতান আইউবীর বাহিনী এবং বাইরে থেকে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাওয়া মুসলিম ব্যবসায়ীগণ খৃস্টানদের ঘরের মালামাল ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে নেয়, যাতে তারা পণ আদায় করে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে সেই খৃস্টান পরিবারগুলোও মুক্তি পেয়ে যায়, যাদের নিকট পণ আদায় করার মতো নগদ অর্থ ছিলো না।

বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান প্যাট্রিয়ক হারকিডলেস দেখান ভিন্ন এক চরিত্র। তিনি সকল গীর্জার সঞ্চিত অর্থ একা কুক্ষিগত করে ফেলেন। গীর্জাগুলোর সোনার পেয়ালা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু-সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যান। বর্ণিত আছে, এই সম্পদ এতো বেশি ছিলো যে, তার বিনিময়ে কয়েক হাজার গরীব খৃস্টান পরিবারকে মুক্ত করা যেতো। কিন্তু তাদের বড় পাদ্রী একজনেরও পণ আদায় করেননি। শুধু নিজের পণটুকু আদায় করে বেরিয়ে যান। একজন মুসলিম সৈনিক টের পেয়ে যায়, লোকটা বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। তার রিপোর্ট মোতাবেক এক কর্মকর্তা সুলতান আইউবীকে বিষয়টি অবহিত করেন। কিন্তু সুলতান আইউবী বললেন– 'সে যদি পণ আদায় করে থাকে, তাহলে তাকে বাধা দিও না। আমি কারো থেকে অতিরিক্ত মূল্য নিতে বারণ করে দিয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।'

সুলতান আইউবী এই পণ আদায় করে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করার মেয়াদ চল্লিশ দিন নির্ধারণ করেন। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কয়েক হাজার গরীব-অসহায় খৃস্টান নগরীতে রয়ে যায়। নব্বই বছর আগে খৃস্টানরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিলো, তখন

দূর-দূরান্ত থেকে খৃস্টানরা সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলো। কোনদিন আবার সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তাদের কল্পনায়ও ছিলো না। এই অবস্থা দেখে সুলতান আইউবীর ভাই আল-আদিল সুলতানের নিকট আসেন।

'সুলতানে মুহ্তারাম!'– আল-আদিল বললেন– 'আপনি জানেন এই নগরী জয়ে আমার ও আমার সেনা ইউনিটের অবদান কতোখানি। তার বিনিময়ে গোলাম হিসেবে আমাকে এক হাজার খৃস্টান দান করুন।'

'এতো গোলাম কী করবে?' সুলতান আইউবী জিজ্ঞেস করেন।

'আমি যা খুশি করবো।'

সুলতান আইউবী আল-আদিলকে এক হাজার খৃস্টান দিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। অনুমোদন পেয়ে আল-আদিল এক হাজার খৃস্টান নির্বাচন করে তাদেরকে ফটকের নিকট নিয়ে মুক্ত করে দেন।

'মহামান্য সুলতান!'– আল-আদিল ফিরে এসে সুলতান আইউবীকে বললেন– 'আমি সে সকল নাগরিককে নগরী থেকে বিদায় করে দিয়েছি। তাদের কাছে পণ আদায় করার মতো অর্থ ছিলো না।'

'আমি জানতাম তুমি এমনই করবে'– সুলতান আইউবী বললেন– 'অন্যথায় আমি তোমাকে একটি গোলামও দিতাম না। মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তোমার এই পুণ্য কবুল করুন।'

এসব কাহিনী রূপকথা নয়। ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বাস্তব সত্য। তারা লিখেছেন, একদল খৃস্টান মহিলা সুলতান আইউবীর নিকট আসে। জানা গেলো, এরা নিহত কিংবা বন্দি হওয়া খৃস্টানদের স্ত্রী, কন্যা, বোন। এদের কাছে পণ আদায় করার অর্থ নেই। সুলতান আইউবী তাদেরকে শুধু মুক্তই করে দেননি, বরং প্রত্যেককে কিছু কিছু করে অর্থ দিয়ে বিদায় করে দেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এখনো যেসব খৃস্টান নগরীতে রয়ে গেছে, তাদের পণ মাফ করে দেয়া হলো। তারা এমনিতেই চলে যেতে পারে। বাইতুল মুকাদ্দাসে শুধু খৃস্টান বন্দিরাই অবশিষ্ট থাকে।

ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী মসজিদ পরিচ্ছন্ন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে ফেলেন। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, মেরামত কাজে সুলতান স্বয়ং ইট-পাথর বহন করেছিলেন। ১১৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর শুক্রবার সুলতান আইউবী জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আকসায় গমন করেন। নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রস্তুতকৃত মিম্বরটি তাঁর সঙ্গে। তিনি নিজ হাতে

মিম্বরটি মসজিদে রাখেন। দামেশ্‌ক থেকে আসা এক খতীব জুমার খুতবা পাঠ করেন।

এবার সুলতান আইউবী মসজিদের সাজসজ্জার প্রতি মনোনিবেশ করেন। মেঝেতে মর্মর পাথর স্থাপন করেন এবং মনের মতো করে মসজিদটি সুদৃশ্য করে তোলেন। সুলতান আইউবী নিজ হাতে যে সুন্দর সুন্দর পাথরগুলো স্থাপন করেছিলেন, আজও সেসব মসজিদে আকসায় বর্তমান রয়েছে এবং তার সৌন্দর্য এতোটুকুও বিনষ্ট বা বিকৃত হয়নি। এখনো সেদিনেরই ন্যায় চকচক করছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস জয় ইসলামের ইতিহাসের বিরাট এক ঘটনা এবং এক সুমহান কীর্তি। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জিহাদ এখনো শেষ হয়নি। তাঁর আরব ভূখণ্ড ও ফিলিস্তীনকে খৃষ্টানদের থেকে মুক্ত করতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে তিনি একদিকে যেমন ইসলামী শক্তির শক্ত এক ঘাঁটিতে পরিণত করেন, তেমনি এই পবিত্র স্থানটিকে ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রের রূপদান করেন। ৫৮৩ হিজরীর ৫ রমযান মোতাবেক ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ নবেম্বর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা হন। গতি তাঁর উত্তর দিকে। তিনি পুত্র আল-মালিকুয যাহিরকে— যিনি অন্য কোথাও অবস্থান করছিলেন— বার্তা প্রেরণ করেন, তুমি তোমার সঙ্গীদেরসহ আমার নিকট চলে আসো। সুলতান টায়েরের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এটি ক্রুসেডারদের একটি শক্ত ক্যাম্প এবং বন্দর অঞ্চল। সুলতান নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেসকে বার্তা পাঠান, যেনো তিনি টায়েরের খানিক দূরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সুলতান যখন এই নগরীটা আক্রমণ করবেন, তখন যেনো তিনি খৃস্টান নৌবহরের উপর আক্রমণ চালান। সুলতান আইউবী আল-ফারেসকে যে দিনটির কথা বলেন, সেটি ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারির শুরুর দিককার কোনো একটি দিন ছিলো।

মেয়ে দুটো আল-ফারেসের জাহাজে অবস্থান করছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর প্রেরিতে গোয়েন্দা জাহাজে নেই। হাসান বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ এবং বিজয় পরবর্তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এদিক থেকে অবসর হলে তার মনে পড়ে, আল-ফারেসের জাহাজে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। লোকটি কী করছে জানার জন্য তিনি রউফ কুর্দির

নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূতের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছুতে কয়েকদিন লেগে যায়। রউফ কুর্দি দূতকে জানায়, সেই গোয়েন্দা অনেক দিন হলো চলে গেছে।

কিন্তু গোয়েন্দা এতোক্ষণে রোম উপসাগরে মাছের পেটে হজম হয়ে গেছে। রউফ কুর্দি তার এই পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। দিন কয়েক আগে গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বলেছিলো, আমি এই মেয়েগুলোকে এখানে থাকতে দেবো না। সে দেখেছে, জাহাজ যখন কূলে গিয়ে নোঙ্গর ফেলে, তখন ছোট ছোট অনেক ডিঙ্গি তার নিকটে এসে পড়ে এবং মৎস্য শিকারীরূপী অনেক লোক নানা জিনিস বিক্রি করে। তাদের একজনকে সে কয়েক জায়গায় দেখেছে। মেয়ে দুটো তাকে রশির সিঁড়িতে করে উপরে তুলে আনে এবং কিছু ক্রয় করার পরিবর্তে তার সঙ্গে কথা বলে। জাহাজ যখন দশ-পনের মাইল দূরে কূলে কোথাও অবস্থান করে, তখনো এই লোকটি ডিঙি নিয়ে এসে পড়ে। এই লোকটার প্রতি গোয়েন্দার সন্দেহ জন্মে যায়।

ফ্লোরি রউফ কুর্দির বিবেক মেরে ফেলেছে। সে তাকে নানা গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করছে এবং অবলীলায় সব বলে দিচ্ছে। আল-ফারেস অনেক ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনি মাঝে-মধ্যে অন্যান্য জাহাজেও চলে যাচ্ছেন এবং খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। একদিন রউফ কুর্দি ফ্লোরির যাদুতে বিমোহিত হয়ে আবেগের আতিশয্যে বলে দেয়, জাহাজে একজন বিপজ্জনক লোক আছে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলো না। রউফ কুর্দি এখনো মেয়েগুলোকে যাযাবরই মনে করছে এবং তাদের আসল নাম ফ্লোরি ও রোজি সম্পর্কে অনবহিত। মেয়েগুলো মূলত অভিজ্ঞ গুপ্তচর। ফ্লোরি বুঝে ফেলে, রউফ কুর্দি যার কথা বলছে, সে একজন গোয়েন্দা। ফ্লোরি জাহাজ থেকে চলে যাক, রউফ কুর্দি মেনে নিতে পারছেন না। তাই সে মেয়েগুলোকে জানিয়ে দেয়, এই লোকটি গোয়েন্দা, তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

এক রাতে আল-ফারেস অন্য এক জাহাজে যান। মধ্যরাতে রউফ কুর্দি ও ফ্লোরি জাহাজের ছাদের উপর রেলিংয়ের সঙ্গে এমন এক স্থানে লুকিয়ে যায়, যার পেছনে ও ডানে-বাঁয়ে অনেক মালপত্র পড়ে আছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা জ্ঞাতসারে কিংবা ঘটনাক্রমে ওদিকে চলে যায়। সে দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে। রউফ কুর্দি ভীত

হওয়া কিংবা মিথ্যা বুঝ দেয়ার পরিবর্তে তাকে সরিয়ে খানিক আড়ালে নিয়ে যায় এবং বলে, মেয়েটাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমরা আসলে কারা। আমি চলে যাচ্ছি, তুমি তার পাশে বসে যাও এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা অনুসারে কথা বলে তার থেকে তথ্য উদ্ধার করো, তারা কারা।

গোয়েন্দাকে ফ্লোরির কাছে বসিয়ে দিয়ে রউফ কুর্দি কক্ষে গিয়ে রোজিকে জাগিয়ে তোলে। বলে, শিকার অমুক জায়গায় আছে। তুমিও চলে যাও। আমি কেউ এসে পড়ে কিনা এদিক-ওদিক দেখতে থাকি।

রোজি ছাদে আসে। রউফ কুর্দি তাকে হাত দুয়েক লম্বা একটা রশি দিয়ে দেয়। গোয়েন্দা ও ফ্লোরি যেখানে বসা আছে, রোজি সেখানে চলে যায়। জায়গাটায় অন্ধকার। রোজি আস্তে করে তাদের কাছে বসে পড়ে। গোয়েন্দার গল্প-গুজবের এক ফাঁকে রোজি রশিটা তার গলায় পেঁচিয়ে ধরে। মেয়ে দুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফ্লোরি সঙ্গে সঙ্গে রশির অপর মাথা ধরে ফেলে। গোয়েন্দা নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত-পা ছোঁড়ার আগেই মেয়েরা দু'দিক থেকে টান দিয়ে তার গলার ফাঁস শক্ত করে ফেলে। ক্ষণকাল ছটফট করে করে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

রউফ কুর্দি খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এক কর্মচারি ওদিকে আসতে চাইলে কাজের কথা বলে তাকে সরিয়ে দেয়। মেয়ে দুটো গোয়েন্দার মৃতদেহটা সমুদ্রে ফেলে দেয়। রোজি চলে যায়। ফ্লোরি ওখানেই বসে থাকে। রউফ কুর্দি তার নিকট ফিরে আসে এবং দু'জনে দু'জনের মাঝে হারিয়ে যায়।

আল-ফারেস জানেনেই না তার জাহাজে কোনো গোয়েন্দা এসেছে কিংবা রউফ কুর্দি নতুন কাউকে চাকরিতে নিয়োগদান করেছে। গোয়েন্দার হত্যাকাণ্ডের তিন-চার দিন পর আল-ফারেসের মনে ভাবনা জাগে, নিজের ও অন্যান্য জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকরা মাসের পর মাস সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন-যাপন করছে এবং এতো দিনে সবাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠেছে। অন্যান্য জাহাজে গিয়ে তিনি মাল্লা ও সৈনিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। কারোরই মন ভালো নেই। মাঝে-মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তাদের মনের অবস্থা অন্তত এরূপ হতো না। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন, কোনো এক রাতে সবাইকে একত্রিত করে একটা বিনোদন ও ভোজসভার আয়োজন করবেন।

আল-ফারেস রউফ কুর্দি এবং অন্যান্য অধীন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার সময় মেয়ে দুটোও উপস্থিত ছিলো। তারা খুশিতে আটখানা হয়ে বললো, আমরা নাচবো। আল-ফারেস প্রাণোচ্ছল-ফূর্তিবাজ মানুষ। তিনি মেয়েদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। তবে অনুষ্ঠান কোন্ রাতে হবে এখনো ঠিক করেননি। কারণ, তিনি স্থল থেকে সুলতান আইউবীর দূতের অপেক্ষা করছেন। সময়টা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ।

দু'দিন পর দূত এসে পৌঁছে। জানায়, সুলতান আইউবী টায়ের থেকে সামান্য দূরে এসে অবস্থান নিয়েছেন। আপনি বহর নিয়ে টায়েরের কাছাকাছি চলে যান, যাতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত টায়ের পৌঁছে যেতে পারেন। দূত বিশেষভাবে সতর্ক করে, এখন দিন-রাত সব সময় চৌকস থাকতে হবে। কেননা, খৃস্টান রণতরীগুলো নিকটেই অবস্থান করছে। আল-ফারেস দূতকে বিদায় দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলোকে এক স্থানে একত্রিত করার ইঙ্গিত দিয়ে দেন। তিনি রউফ কুর্দিকে জানান, সম্ভবত দিন কয়েকের মধ্যেই আমাদেরকে নৌযুদ্ধ লড়তে হবে। কাজেই, অনুষ্ঠানটা দু'রাত পরই আয়োজন করে ফেললে ভালো হয়।

রউফ কুর্দি মেয়েদেরকে জানিয়ে দেয়, অমুক রাত জাহাজগুলো একত্রিত হবে এবং আমাদের বিনোদন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

এন্ড্রুর আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা তাকে কয়েক জায়গায় দেখেছিলো। এখন যখন জাহাজগুলো কূলে এসে ভিড়ে, তো এন্ড্রু এসে পড়ে। মেয়েরা যথারীতি তাকে উপরে তুলে আনে এবং কেনাকাটার ছলে তার কানে তথ্য দিয়ে দেয়, অমুক রাত জাহাজগুলো একত্রিত হবে এবং এই জাহাজের ছাদে বিনোদন অনুষ্ঠান হবে। সে এই বলে চলে যায় যে, সে রাতে আমার ডিঙ্গি আসবে। তোমরা সিঁড়ি ফেলে আমাকে উপরে তুলে নেবে।'

আজ সেই রাত। ছয়টি জাহাজ পাল খুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজগুলোর ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসার– আল-ফারেসের জাহাজে এসে সমবেত হয়েছে। উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হচ্ছে। মাল্লা ও সৈনিকগণ নিজ নিজ জাহাজে উৎসব্ করছে। আল-ফারেসের জাহাজে

মেয়ে দুটো নাচছে। দফ ও সারেন্দার বাজনা চলছে। জাহাজে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। রাতকে দিনে পরিণত করা হয়েছে।

উৎসব যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন রাত অনেক কেটে গেছে। খৃষ্টানদের দশ-বারোটি রণতরী আল-ফারেসের জাহাজের দিকে বাতি নিভিয়ে এগিয়ে আসছে। নবচন্দ্রের বিন্যাসে আসছে জাহাজগুলো। নিকটে এসে পৌঁছার পরও কারো খবর হয়নি, শত্রুর নৌবহর আসছে। এদিকে ছোট একটি ডিঙি নৌকা আল-ফারেসের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ আল-ফারেসের জাহাজগুলোর উপর জ্বলন্ত গোলা এসে পড়তে শুরু করে এবং এমন মুষলধারায় তীর আসতে শুরু করে যে, মুহূর্ত মধ্যে কয়েকজন মাল্লা ও সৈনিক লুটিয়ে পড়ে। আল-ফারেস ও তার কাপ্তানগণ এই অতর্কিত আক্রমণ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জাহাজ বের করে নেয়া সম্ভব হলো না। সৈনিকরা তীর ছুঁড়ে আক্রমণের উত্তর দেয়। মিনজানিক দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করা হয়। একটি খৃস্টান জাহাজে আগুন ধরে যায়। কিন্তু খৃস্টানরা তাদের কার্যসিদ্ধি করে ফেলে। তাদের জাহাজ ফিরে চলে যায়।

যুদ্ধ যেরূপ হঠাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের বিবরণ তোমাবেক আল-ফারেসের পাঁচটি জাহাজ পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এ ঘটনা ৫৮৩ হিজরীর ২৭ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮৭ খৃস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঘটে।

জাহাজগুলো জ্বলছিলো। প্রজ্বলমান জাহাজের আলোতে এক ব্যক্তি দেখে একটি ডিঙি চলে যাচ্ছে, যাতে দু'জন পুরুষ ও দু'জন নারী। আল-ফারেস জাহাজ দেখে নৌকা নামিয়ে দিয়ে ধাওয়া করে তাদের ধরার চেষ্টা করেন। এদিক থেকেও তীর ছোঁড়া হয়। ডিঙিটি ঘিরে ফেলা হয়। পুরুষ দু'জন ও এক নারী তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। এক মেয়ে রক্ষা পেয়েছে। পরে তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

সে সময় সুলতান আইউবী টায়ের থেকে সামান্য দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর সোজা টায়ের আক্রমণ করার পরিকল্পনা। রওনার একদিন আগে তিনি সংবাদ পান, ছয় জাহাজের পাঁচটি ধ্বংস হয়ে গেছে। শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান। এ মুহূর্তে এরূপ দুঃসংবাদ শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রযাত্রা মুলতবি করে

দেন এবং আল-ফারেস ও জাহাজের কাপ্তানদের ডেকে পাঠান। আল-ফারেস সোজাসাপ্টা উত্তর দেন, সৈনিকদের বিনোদনের জন্য আমরা একটু উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। সবাই আনন্দে মেতে ছিলো। সে ফাঁকে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে।

সুলতান আইউবী তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের বৈঠক ডাকেন। সকলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। সবাই পরামর্শ দেয়, প্রচণ্ড শীত পড়ছে। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। এ মওসুমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অবিরাম যুদ্ধে সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অবিচার হবে। পরিণামে পরাজয় আসতে পারে। তারা নৌবহরের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সুলতান আইউবীকে বুঝাবার চেষ্টা করে, এতো দীর্ঘ সময় সৈনিকদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে দূরে রাখার প্রতিক্রিয়া এমনই হয়ে থাকে। এমন না হয় যেনো, বাইতুল মুকাদ্দাসের মহান বিজয়ও আমাদের জন্য নতুন কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবী একনায়ক শাসক নন। তিনি নায়েব-উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করে নেন এবং আদেশ জারি করেন, বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে যে অস্থায়ী বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো, সেগুলো ভেঙে দেয়া হোক এবং কিছু অর্থ প্রদান করে তাদের বাড়ি-ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হোক। তিনি তার নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যদের একাংশকেও অল্প ক'দিনের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ১১৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। মার্চ পর্যন্ত সুলতান আইউবী আক্রায় অবস্থান করেন।

রানী সাবীলা

ক্রুসেড যুদ্ধ তুঙ্গে পৌছে গিয়েছিলো। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাইতুল মুকাদ্দাস জয় সমগ্র ইউরোপকে তীব্র এক ভূ-কম্পনের ন্যায় কাঁপিয়ে তোলে। সুলতান আইউবী জীবনের মিশন বাস্তবায়িত করে ফেলেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় ছিলো তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। তবে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করাই যথেষ্ট ছিলো না। এই পবিত্র নগরীটির প্রতিরক্ষা সৃদুঢ় করাও আবশ্যক ছিলো। তার জন্য নগরীর চারদিকে শক্ত প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আশপাশের অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকাগুলো দখলে আনাও জরুরি। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করেও ফেলেছেন। অবশিষ্টগুলোর উপর সুলতানের বাহিনী আক্রমণ করছে আর দখল করে নিচ্ছে।

বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে খৃস্টান নাগরিকরা পালিয়ে যাচ্ছে। যেসব অঞ্চলের উপর খৃস্টানদের দখল ছিলো, সেখানে তারা মুসলমানদের বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছিলেন। তাদের জন্য মুসলমানদের গণহত্যা দৈনন্দিন কর্মসূচি ও ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তার বিপরীতে সুলতান আইউবী যখন যে অঞ্চল জয় করতেন, সেখানকার খৃস্টান অধিবাসীদেরকে নিজ বাহিনীর নিরাপত্তায় বের করে দিতেন, যাতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এখন ফিলিস্তীনেও তিনি একই নীতি অবলম্বন করেন। একজন খৃস্টান নাগরিকও যাতে নিগ্রহের শিকার না হয়, সুলতান আইউবী তার নিশ্চয়তা বিধান করেন।

হেডকোয়ার্টার থেকে যতোই দূরে থাকুক না কেনো, সুলতান আইউবী তাঁর প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছেন এবং তাদেরকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছেন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাউকে কিছু করতে দিচ্ছেন না। গেরিলা বাহিনী শকুন ও ব্যাঘ্রের ন্যায় পাহাড়-পর্বত ও বন-বিয়াবানে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানেই খৃস্টান বাহিনীর কোনো ইউনিট কিংবা রসদের বহর চোখে পড়ছে, অমনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কমান্ডো আক্রমণ করছে, হতাহত করছে ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের ঘোড়া, অস্ত্র ও রসদ সরঞ্জামাদি তুলে আনছে।

এই গেরিলারা যেসব কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছে, ইসলামের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর, ঈমানদীপ্ত ও অস্বাভাবিক বীরত্বের কাহিনী। তার প্রতিটি কাহিনী লিখতে গেলে এই সিরিজ শেষ হবে না। তারা ছিলো ফিলিস্তীনের মাটির প্রহরী। তারা একজন একজন দু'জন দু'জন ও চারজন চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে শত শতজনের শত্রুসেনা দল ও ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতো কিংবা নিজেদেরই রক্তে ডুবে যেতো। নিজেদের লাগানো আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হতো। শহীদ হওয়ার পর তাদের কপালে কাফন জোটেনি। কেউ তাদের জানাযা পড়েনি। কাউকে সসম্মানে কবরস্ত করা হয়নি।

তারা শত্রুর উপর গজবরূপে আবির্ভূত হতো। তাদেরই উপর নির্ভর করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী সমগ্র ফিলিস্তীনে সিংহের ন্যায় হুংকার দিয়ে চলছিলেন। সুলতান আইউবীর এই গেরিলা ও কমান্ডো বাহিনীগুলো সম্পর্কে প্রখ্যাত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লেনপোল লিখেছেন—

'এই বিধর্মীরা (মুসলমানরা) আমাদের নাইটদের ন্যায় ভারি বর্ম পরিধান করতো না। অথচ তারা আমাদের বর্মপরিহিত নাইটদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিতো। তাদের উপর আক্রমণ হলে তারা পালাতো না। তাদের ঘোড়াগুলো সমগ্র পৃথিবীতে সবচে' দ্রুতগামী ঘোড়া বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারা যখন দেখতো, খৃস্টানরা তাদের পেছন থেকে সরে গেছে, তখন তারা পুনরায় ফিরে আসতো। এরা ছিলো সেই ক্লান্তিহীন মাছির ন্যায়, যাদেকে উড়িয়ে দিলে মুহূর্তের জন্য উড়ে আবার ফিরে এসে গায়ে বসে। সারাক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে সরে থাকে। যখনই এই প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেয়া হয়, অমনি কমান্ডো হামলা করে বসে। তারা পার্বত্য অঞ্চলের ঝড়-বৃষ্টির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এসে খৃস্টান বাহিনীর বিন্যাস চুরমার করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। তারা আমাদের নাইটদেরকে পায়ে পায়ে অস্থির এবং বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে রাখতো।'

❖ ❖ ❖

বর্তমানে যে ভূখণ্ডটিকে 'ইসরাইল' বলা হয়, এটিই সেই পবিত্র ভূমি, যাকে খৃস্টানদের থেকে মুক্ত করার জন্য সুলতান আইউবীর আমলে আল্লাহর এক একজন সৈনিক সেখানে নিজ দেহের রক্তের নজরানা দিয়েছিলো। সুলতান আইউবী কয়েকটি বসতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মাঝে-মধ্যে মনে হতো তাঁর হৃদয়ে একবিন্দু মমতা নেই। কিন্তু তিনি মমতার এমন এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, খৃস্টান ঐতিহাসিকরাও তার প্রশংসা করেছেন। তার নিকট দয়া ভিক্ষার জন্য খৃস্টানদের এক রানীও এসেছিলেন। এসেছিলো এক অসহায় গরীব খৃস্টান মহিলাও।

খৃস্টান রানীর নাম ছিলো সাবীলা। মহিলা প্রখ্যাত খৃস্টান সম্রাট রেমন্ডের স্ত্রী ছিলেন। হিত্তীন যুদ্ধের সময় তিনি তাবরিয়ার দুর্গের রানী ছিলেন। রেমন্ড হিত্তীনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার স্ত্রী তাবরিয়ার দুর্গ সুলতান আইউবীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবী তাকে বন্দি করেননি। সেই যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান সুলতান আইউবীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবী আক্রায় ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করছেন। তার নিকট সংবাদ আসে, রানী সাবীলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। সুলতান তাকে বারণ করেননি। বরং এগিয়ে গিয়ে রানীকে স্বাগত জানান।

'সালাহুদ্দীন!'– রানী সাবীলা বললেন– 'আপনি কি জানেন, কতো হাজার নাকি কতো লাখ খৃস্টান গৃহহীন হয়ে পড়েছে? তাদের উপর এই অবিচার আপনার নির্দেশে হয়েছে।'

'আর আপনারা যে নিরপরাধ মুসলমানদের গণহত্যা করিয়েছেন এবং করিয়ে যাচ্ছেন, সেটা কার আদেশে হয়েছিলো?'– সুলতান আইউবী তার উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন– 'আমি যদি রক্তের বদলা রক্ত দ্বারা গ্রহণ করি, তাহলে একজন খৃস্টানও রক্ষা পাবে না। তা আপনি কেনো এসেছেন? আমার নিকট এই অভিযোগ দায়ের করতে?'

'না'– রানী সাবীলা উত্তর দেন– 'আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। গাই অফ লুজিনান আপনার হাতে যুদ্ধবন্দি হয়ে আছেন। আমি তাঁকে মুক্ত করতে এসেছি।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো না, তাকে কেনো মুক্ত করতে

চাচ্ছেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তবে জানতে চাই, তাকে কোন্ শর্তে মুক্তি দেবো?'

'আপনার পুত্র কিংবা ভাই যদি শত্রুর হাতে বন্দি হয়, তাহলে কি আপনি তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন না?' রানী সাবীলা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'আপনাদের নিকট আমার যতো কমান্ডার ও সৈনিক বন্দি আছে, তারা সকলে আমার পুত্র-ভাই'– সুলতান আইউবী বললেন– 'যদি স্বয়ং আমিও বন্দি হয়ে যাই, তবু আপনার নিকট আমি মুক্তি ভিক্ষা চাইবো না। আমার কোনো পুত্র কিংবা ভাই আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আপনার নিকট যাবে না।'

'সালাহুদ্দীন!'– রানী সাবীলা বললেন– 'আপনি নিজে রাজা। নিশ্চয়ই বোঝেন, একজন রাজার কারাগারে পড়ে থাকা তাঁর জন্য কতো বড় অপমান। তিনি তো জেরুজালেম এবং আশপাশের দূর-দূরান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।'

'জেরুজালেম নয়– বায়তুল মুকাদ্দাস'– সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'তোমাদের গাই এই ভূ-খণ্ডটির লুটেরা ছিলেন। আমরা কোনো লুটেরাকে সম্রাট বলি না। যদি বলতেন, তিনি ইসলামের মূলোৎপাটন করে এখানে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তাহলে আমি আপনাকেও শ্রদ্ধা করতাম এবং তাকেও। আমি সেই লোকদের মন-প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করি, যারা আপন ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হোক তার ধর্ম ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি না নিজেকে রাজা মনে করি, না কারো রাজত্ব স্বীকার করি। রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। আমরা তাঁর রাজত্বের পাহারাদার ও সংরক্ষক মাত্র। আমরা আল্লাহর সৈনিক।'

'আমরাও খোদার রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ করছি।' রানী সাবীলা বললেন।

'আমি যে খোদায় বিশ্বাসী, আপনিও যদি সেই একই খোদায় বিশ্বাসী হতেন, তাহলে রাজার নয়– রাজার সাধারণ সৈনিকদের মুক্তির আবেদন নিয়ে আসতেন'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনার অস্বীকার না করা উচিত, এই ভূখণ্ড আমাদের– আপনাদের নয়। খৃস্টানরা এখানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ন্যায় থাকতে পারে– রাজা হয়ে নয়। আপনার খৃস্টান বন্ধুদের বলে দিন, তারা মানুষের খুন ও লুটপাট থেকে ফিরে আসুক এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাক। আপনাদের প্রতিটি অস্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। আপনারা আপন নিষ্পাপ মেয়েদেরকে পাপের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এবং তাদের

সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছেন। আপনারা আমাদের ধর্মনেতাদের ছদ্মবেশে নাশকতাকারী সন্ত্রাসী প্রেরণ করে আমার জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা হীরা-জহরত, মদ ও রূপসী মেয়েদের দ্বারা আমার জাতির মাঝে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছেন এবং গৃহযুদ্ধ করিয়েছেন। আপনারা হাশিশিদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার একাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। হ্যাঁ, ক্রুশের রানী! একটি কাজে আপনারা সফল হয়েছেন যে, আপনারা ইসলামী সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছেন।'

'আমার প্রিয় সুলতান!'– রানী সাবীলা বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মানসে বললেন– 'আমি এতো দীর্ঘ ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। আপনি গাই অফ লুজিনানকে মুক্তি দিন।'

'আমি জানি, এরপর আপনি আর আমার কাছে আসবেন না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'কেবল আমার এই তাঁবুতেই নয়– এরপর আপনাকে কোনোদিন এই ভূখণ্ডের কোথাও দেখা যাবে না। আমি আপনাকে আলোচনায় জড়িয়ে রাখতে চাই না। আপনাকে আমি একটি বার্তা দিচ্ছি। এই বার্তাটি আপনি আপনার ক্রুশের সকল পূজারীর কানে পৌঁছিয়ে দেবেন।'...

'কোথায় আপনাদের সেই বড় ক্রুশ, যার উপর হাত রেখে আপনারা শপথ নিয়েছিলেন যে, আরব ভূমিকে পদানত করবেন, মসজিদে আকসা ও খানায়ে কা'বাকে নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের উপাসনালয় বানাবেন? সেই ক্রুশ আমার কব্জায়। আর আপনাদের সেই প্রত্যয় এখন আমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার প্রত্যাশী। যে ভূখণ্ডটিকে আপনারা জেরুজালেম বলেন, সেটি এখন বাইতুল মুকাদ্দাস এবং চিরদিন বাইতুল মুকাদ্দাসই থাকবে।'

'আপনার বাহিনী উন্নত এবং সংখ্যায় বেশি'– রানী সাবীলা বললেন– 'আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব ত্রুটিপূর্ণ।'

'বাস্তবকে লুকাবার চেষ্টা করবেন না রানী সাবীলা!'– সুলতান আইউবী বললেন– 'নিজেকে ধোঁকা দেবেন না। আত্মপ্রতারণা পরাজয়ের লক্ষণ। আমার সেনাসংখ্যা কোনোদিন খৃস্টান বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিলো না। উন্নতও নয়। আমার ফৌজের কপালে কখনো বর্ম জোটেনি। আপনাদের

সালারদের তাঁবুতে যেরূপ রূপসী নারীরা শোভা পায়, আমার সালাররা সেরূপ নারী কখনো পায়নি। আমার সৈন্যদের অস্ত্র আপনাদের চেয়ে উন্নত নয়। তবে আমি আপনাকে আমাদের গোপন কথাটা বলে দিচ্ছি, আমার বাহিনীর কাছে একটি শক্তি আছে, আপনাদের বাহিনীর যার থেকে বঞ্চিত। আমরা তাকে ঈমান ও নবীপ্রেম বলি। আপনাদের বিশ্বাস যদি সঠিক হতো,তাহলে খোদা আপনাদের জাতির প্রিয়ভাজন হতেন। কিন্তু তারা তো অদ্বিতীয় এক খোদাকে এক পুত্রের জনক বানিয়ে রেখেছে। আপনারা খোদাকে মানুষের কাতারে নামিয়ে এনেছেন এবং তাঁর রাজত্বের কাছে নতি স্বীকারের পরিবর্তে নিজেদেরকে রাজার আসনে বসিয়েছেন।'

'আপনি কি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন?' রানী সাবীলা জিজ্ঞেস করেন।

'রানী সাবীলা!'– সুলতান আইউবী রানী সাবীলার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর আঁচ করে বললেন– 'আমার আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, আমি তাদেরকে বিবেক দিয়েছি, কিন্তু তারা চিন্তা করে না। আমি তাদেরকে চোখ দিয়েছি; কিন্তু তারা দেখে না। আমি তাদের কান দিয়েছি; কিন্তু তারা শোনে না। মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, আমি যখন তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত করি, তখন তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর মোহর এঁটে দেই। আপনি ইসলাম গ্রহণ না করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, বিজয় সে-ই লাভ করে, যার অন্তরে ঈমান থাকে। আমার জাতির কর্ণধারদের হৃদয় থেকে যখন আপনারা সম্পদ, নারী ও মদের মাধ্যমে ঈমান বের করে দিয়েছিলেন, তখন আমরা আপসে যুদ্ধ ও রক্তারক্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহ আমাদের শাস্তিদান করেছেন। সমগ্র জাতি পাপে লিপ্ত হয় না। পাপ করে কর্ণধাররা। কিন্তু শাস্তি ভোগ করে দেশের প্রতিজন নিরীহ মানুষ। জাতি পাপ করে না– তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়।'

'আমার আসল শক্তি হচ্ছে, আমি যখন পরাজিত হই, তখন তার দায়ভার নিজের মাথায় তুলে নেই। তখন জাতি পরাজয়কে জয়ে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। পরাজয়ের দায়ভার যদি একজন অপরজনের উপর চাপাতে চেষ্টা করে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে থাকে, তাহলে এক পরাজয়ের পর আরেক পরাজয় সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আমি যদি তা-ই করতাম, তাহলে দ্বিধাবিভক্ত সালতানাতে ইসলামিয়া বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়তো। মুহতারামা! আমাদের গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী আস-সালিহ

ছিলো কিংবা সাইফুদ্দীন, আপনি ছিলেন অথবা গোমস্তগীন। কিন্তু আমি আমার সালারদের বলে দিয়েছি, এ দায়-দায়িত্বও আমার। তার মোকাবেলায় আমি প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করেছি এবং আল্লাহর সৈনিকগণ রক্তের বিনিময়ে খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছি। রক্তের আঁঠায় জোড়া লাগানো খণ্ড পরে কোনোদিন আলগা হয় না রানী সাবীলা! আপনি স্মরণ করুন, আপনাদের বাহিনী মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। অথচ আজ আপনি আমার নিকট আপনার একজন সম্রাটের মুক্তি ভিক্ষা চাচ্ছেন। এ কোন্ কাজের ফল? সে কাজটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমি জীবনের বাজি লাগিয়ে সে কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ আমাকে তার জন্য পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।'

রানী সাবীলা মনোযোগ সহকারে সুলতান আইউবীর বক্তব্য শুনছিলেন। কিন্তু যৌবনদীপ্ত চিত্তাকর্ষক রূপসী নারী সাবীলার রাঙা ঠোঁটে অবজ্ঞার মুচকি হাসি, যে হাসির মর্ম সুলতান আইউবী ভালোভাবেই বোঝেন।

'আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আপনার মুখের হাসি বলছে, এই তাঁবু থেকে বের হয়েই আপনি আমার কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলবেন, যেভাবে হিত্তীন ও বাইতুল মুকাদ্দাসে আপনাদের বাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করেছিলো। কথাগুলো আমি আপনাকে এ জন্য বলছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ আছে, যাদের চোখে আবরণ পড়ে গেছে, তাদের আবরণ খুলে দাও এবং তাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ভেবে দেখুন সম্মানিতা রানী! আপনার স্বামী আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে চারবার সংহারী আক্রমণ করিয়েছিলো। একবার আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। সে অবস্থায় তারা আমার উপর হামলা চালিয়েছিলো। কিন্তু হলো কী? তারা নিজেরাই খুন হলো। একবার আমি একাকি তাদের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম আর তারা মারা গেলো। আপনার সেই স্বামী নিজেই শেষ পর্যন্ত সেই ফেদায়ীদের হাতে খুন হলো। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন।'...

'মন দিয়ে শুনুন রানী! হিত্তীনের রণাঙ্গন থেকে আপনার স্বামী যুদ্ধ না করে পালিয়ে গিয়েছিলো। আপনিও বিনাযুদ্ধে তাবরিয়ার দুর্গ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আপনারা সকলে যে বড় ক্রুশটির উপর হাত রেখে যুদ্ধ করার ও জীবন দেয়ার শপথ করেছিলেন, সেটি সেই রণাঙ্গনেই আপনাদের

সেই পাদ্রীর রক্তে ডুবে গিয়েছিলো, যাকে আপনারা ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ বলে থাকেন। সেই ক্রুশ এখন আমার দখলে। আর আপনি আমার নিকট গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছেন।'

'এ বিষয়গুলো আপনি আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন কেনো?' রানী সাবীলা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন।

'যাতে আপনি মহান আল্লাহর এই ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারেন'– সুলতান আইউবী উত্তর দেন– 'আপনার চোখের উপর রাজত্বের পট্টি বাঁধা আছে। রাজত্ব ও ক্ষমতা আপনার জন্য বিরাট এক গৌরবের বিষয়। তাছাড়া আশা করি, আপনি এই সত্যটাকেও অস্বীকার করবেন না যে, একজন রূপসী নারী হওয়ার জন্য আপনি গর্বিত। আমি একথা বলে আপনাকে খুশি করতে পারি যে, বাস্তবিকই আপনি সুন্দরী। তবে এ কথা বলে নিরাশও করবো যে, আপনার রূপে প্রভাবিত হয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না। আপনার অর্ধনগ্ন দেহ আমাকে সরল-সঠিক পথ থেকে সরাতে পারবে না।'

রানী সাবীলা একজন সাধারণ মহিলার ন্যায় হেসে ওঠেন এবং বলেন– 'আমাকে বলা হয়েছিলো আপনি পাথর।'

সুলতান আইউবী মুচকি হেসে বললেন– 'আপনার জন্য আমি অবশ্যই পাথর। কিন্তু আসলে আমি এমন এক মোম, যা ঈমানের উত্তাপে গলে যায় এবং মমতার জযবাও তাকে গলিয়ে দেয়। দৈহিক সুখভোগ ও বিলাসিতা মানুষকে অকর্মণ্য করে তোলে। এমন ব্যক্তি না নিজের কোনো কাজে আসে, না জাতির। খোদার দরবারেও তার কোনো স্থান থাকে না।'

'আমি আপনার হৃদয়ে মমতার জযবা সৃষ্টি করতেই এসেছিলাম'– রানী সাবীলা বললেন– 'গাইকে মুক্তি দিন। আমি শুনেছি সাচ্চা মুসলমানের ঘরে যদি দুশমন ঢুকে পড়ে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

এবার রানী সাবীলা অনুনয়-বিনয়ের সুরেই কথা বলতে থাকেন। সুলতান আইউবী বললেন, গাইকে এক শর্তে মুক্তি দিতে পারি। সে আমাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবে, জীবনে কখনো আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না।

রানী সাবীলা বললেন, লিখিত শপথনামা দেয়া হবে। এ-ও লেখা হবে, যদি তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং পরে কখনো গ্রেফতার হোন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন।

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। রানী সাবীলা চলে যান।

সুলতান আইউবী সেদিনই গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আদেশনামা দিয়ে দামেশ্‌কে দূত পাঠিয়ে দেন। তিন-চারদিন পর গাইকে সুলতান আইউবীর নিকট নিয়ে আসা হলো। সুলতান বললেন, চুক্তিনামাটি তাকে তার ভাষায় শোনাও। যদি সে প্রয়োজন মনে করে, তাহলে তার ভাষায়ও লিখে স্বাক্ষর নিয়ে নাও।

'আর তাকে বলে দাও, আমি তার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তাকে বলে দাও, আমি জানি সে এই চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তাকে আরো বলে দাও, রানী সাবীলার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি তাকে মুক্তি দেইনি। তাকে জানাতে চাই, আমি তার মতো অপরাধীকেও ক্ষমা করতে জানি। আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছি। কারো নিকট থেকে আমি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাই না। আর সে যেখানে যেতে চায়, নিরাপত্তা প্রহরায় পৌছিয়ে দাও।'

গাই অফ লুজিনান– যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা ছিলেন এবং হিত্তীন যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন– শপথনামায় স্বাক্ষর করে সুলতান আইউবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ান। সুলতান তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। গাই আগ্রহের সঙ্গে সুলতানের সঙ্গে হাত মেলান এবং বললেন– 'আইউবী! তুমি মহান।'

গাই অফ লুজিনান মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান।

❖ ❖ ❖

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ গাই অফ লুজিনানের মুক্তির ঘটনা উল্লেখ করে একে রানী সাবীলার কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রানী সাবীলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং গাইকে নিজের মতো একজন রাজা জ্ঞান করে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারা এও বুঝানোর কসরত করেছেন যে, সাধারণ ও গরীব লোকদের প্রতি সুলতান আইউবীর কোনো সমবেদনা ছিলো না। অথচ তাদের এই মূল্যায়ন সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এক গরীব খৃস্টান মহিলার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

গাই অফ লুজিনানের মুক্তির পর যখন খৃস্টানরা উপকূলীয় নগরী আক্রা অবরোধ করে রেখেছিলেন, সে সময়কার ঘটনা। খৃস্টান বাহিনীর ক্যাম্পের সঙ্গেই সেই খৃস্টান নাগরিকদের আশ্রয় শিবির ছিলো, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্থান হতে বেরিয়ে এখানে এসে সমবেত হয়েছিলো।

অবরোধের বয়স দু'বছর হয়ে গেছে। একদিকে সুলতান আইউবীর গেরিলা সৈনিকরা অবরোধকারী খৃস্টান সৈনিকদের কোনো না কোনো অংশের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাচ্ছে, উক্ত অঞ্চলের অসামরিক মুসলমানরাও তাদের নানাভাবে বিরক্ত ও অস্থির করে চলেছে। খৃস্টান নাগরিকরা সৈন্যদের সঙ্গে ছিলো বলে সৈন্যদের অনেক সাহায্য দিচ্ছে।

অসামরিক মুসলমানরা উক্ত অসামরিক খৃস্টানদেরও উত্যক্ত-পেরেশান করতে থাকে। তারা রাতে তাদের ক্যাম্পে ঢুকে যেতো এবং তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আসতো। কখনো কখনো এক-দু'জন খৃস্টানকেও তুলে নিয়ে আসতো এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে ঢুকিয়ে দিতো। সাধারণ খৃস্টানরা নিজ বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানাতে থাকে যে, মুসলমান চোর-ডাকাতরা রাতে তাদের মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাহিনী পাহারার ব্যবস্থা করে। তথাপি এই চুরি ও অপহরণের ধারা অব্যাহত থাকে।

এক রাতে এক ব্যক্তি খৃস্টানদের ক্যাম্প থেকে তিন মাস বয়সের একটি শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে আসে। মায়ের একমাত্র কন্যা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু। মহিলা হাউমাউ শুরু করে দেয়। খৃস্টান কমান্ডারদের নিকট যায়। সে পাগলের মতো হয়ে গেছে। খৃস্টানদের সেনাপতি পর্যন্ত গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। সেনাপতি তাকে পরামর্শ দেয়, সুলতান আইউবীর ক্যাম্প কাছেই আছে; তুমি গিয়ে বিষয়টা তাকে জানাও। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটিকে কোনো মুসলমানই তুলে নিয়ে গেছে।

পাগলপারা মা জিজ্ঞেস করে করে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে এসে হাজির হয়। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, তিনি তখন সুলতান আইউবীর পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিলেন এবং সুলতান কোথাও যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বসেছেন। এক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, এক গরীব খৃস্টান মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। সে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবী বললেন, তাকে এক্ষুনি নিয়ে আসো। নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ থেকে তার উপর বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে।

মহিলা সুলতান আইউবীর সামনে এসে ঘোড়ার সন্নিকটে ধপাস করে বসে পড়ে এবং মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সুলতান বললেন, ওঠে বলো তোমার উপর কে জুলুম করেছে?

'আমাদের বাহিনীর সেনাপতি বললেন, তুমি সুলতান আইউবীর

নিকট চলে যাও, তিনি খুব দয়ালু মানুষ। তিনি তোমার ফরিয়াদ শুনবেন'– মহিলা বললো– 'আপনার লোকেরা আমার একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু কন্যাটিকে তুলে এনেছে।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, মহিলার ফরিয়াদ-ক্রন্দনে সুলতান আইউবীর চোখে অশ্রু নেমে আসে। শিশুটি অপহৃতা হয়েছে সাত দিন হয়ে গেছে। সুলতান আইউবী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসেন। তিনি আদেশ করেন, এক্ষুনি খোঁজ নাও, শিশুটিকে কে এনেছে। তিনি মহিলাকে আহার করাতে বললেন এবং যেখানে যাওয়ার কথা ছিলো পরিকল্পনা মুলতবি করে দেন।

যেসব সাধারণ মুসলমান খৃস্টান ক্যাম্প থেকে মালপত্র নিয়ে আসতো, তারা বাহিনীর সঙ্গেই থাকতো। তাদের যে লোকটি শিশুটিকে তুলে এনেছে, সে ক্যাম্পেই অবস্থান করছে। সংবাদ শুনে সে সুলতান আইউবীর নিকট ছুটে গিয়ে বললো, মহামান্য সুলতান! শিশুটিকে আমি এনেছি এবং বিক্রি করে ফেলেছি। সুলতান আইউবী আদেশ করেন, যাও, মূল্য ফেরত দিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসো।

সুলতান আইউবী শিশুটির এসে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজ তাঁবুতে অবস্থান করেন। শিশুটি বেশি দূরে যায়নি। ফলে পেতে তেমন সময় লাগেনি। তার মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। সুলতান নিজ হাতে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেন। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে কলিজার টুকরোটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং এমন আবেগের সাথে আদর করে যে, (শাদ্দাদের ভাষায়) আমাদের সকলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সুলতান আইউবী মহিলাকে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় করে দেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ফিলিস্তীনের প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে খৃস্টানরা উৎখাত হয়ে গেছে। খৃস্টান জগতে কম্পন ও হতাশা নেমে এসেছে। সে যুগে সামরিক দিক থেকে তিনটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী জ্ঞান করা হতো– ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। তাদের পোপ স্বয়ং প্রতিটি দেশের সম্রাটদের নিকট গিয়ে গিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে তার বক্তব্য ছিলো নিম্নরূপ–

'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে উঠে না দাঁড়াও, তাহলে সমগ্র ইউরোপ থেকে ক্রুশ উৎখাত হয়ে যাবে এবং সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়ে যাবে। এই যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবীর ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ খৃস্টবাদ

ও ইসলামের যুদ্ধ। আমাদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের দখলে। জেরুজালেমের উপর মুসলমানদের পতাকা উড়ছে। হাজার হাজার খৃস্টান নারী মুসলমানদের কবলে চলে গেছে। তাদেরকে মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হচ্ছে। তোমরা কি ঘরে বসে ইসলামের ক্রমবর্ধমান এই ঝড়কে প্রতিহত করতে পারবে? তোমরা কী করে সহ্য করছো, যে ক্রুশের উপর হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো, সেটি মুসলমানদের হাতে চলে যাবে?'

এ জাতীয় উত্তেজনাকর সত্য-মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে পোপ বড় বড় খৃস্টান কমান্ডারদের উত্তেজিত করে তোলেন। জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক দু'লাখ সৈন্য নিয়ে সকলের আগে চলে আসেন। তিনি কারো সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রয়োজন মনে করেননি। সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন তিনি। সে অনুযায়ী তিনি দামেশ্‌কের উপর আক্রমণ চালান। তার জন্য দুর্ভাগ্য ছিলো যে, তিনি সুলতান আইউবীর রণকৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। দু'লাখ সৈন্যের উপর ভরসা করে তিনি আরব ভূখণ্ডকে দখল করতে এসেছিলেন। তার দামেশ্‌ক আক্রমণকে দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু ফ্রেডারিক এই দু'লাখ সৈন্য দ্বারা দামেশ্‌কের একটি ইটও খসাতে সক্ষম হননি। মুসলমান গেরিলারা তার রসদের উপর এমন দুঃসাহসী কমান্ডো আক্রমণ চালায় যে, তারা তার হাজার হাজার ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ি নিয়ে আসে। রসদগুলো তাদের বাহিনীর হাতে তুলে দেয়।

ফ্রেডারিক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। তার রসদের অভাব দেখা দেয়। বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারায়। তিনি পেছনে সরে গিয়ে নতুন উদ্যমে দামেশ্‌ক আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কিন্তু মুসলিম গেরিলারা তার বাহিনীকে স্থির হয়ে বসতে দেয়নি। পানির উৎসগুলোও মুসলমানরা দখল করে নেয়। ঘটনাটা ১১৯১ সালের ২০ জানুয়ারি মোতাবেক ৫৮৬ হিজরীর ২২ যিলহজ্বের। শোকাহত হয়ে জার্মানিরা তাদের ক্যাম্পে স্থানে স্থানে কাঠ সঞ্চয় করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যেনো ক্যাম্প জ্বলছে। এদিকে মুসলিম সৈন্যরাও নিজ ক্যাম্পে উল্লাসে মেতে ওঠে।

ফ্রেডারিকের এক পুত্র জার্মানি বাহিনীর কমান্ড হাতে তুলে নেয়। তার জানা ছিলো, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডও আসছেন। তারা রণতরী নিয়ে আসছেন। ফ্রেডারিকের পুত্র বাহিনীকে ফিলিস্তীনের উপকূলীয় নগরী আক্রার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। সুলতান আইউবী তার সালারদেরকে পূর্বেই দিক-নির্দেশনা দিয়ে

রেখেছিলেন। সে মোতাবেক তারা খৃস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ না করে যেতে দেয়। সালারদের জানা ছিলো, পথে তাদের কমান্ডো বাহিনী উপস্থিত রয়েছে। তাদের কৌশল ছিলো, তারা শত্রু বাহিনীর একেবারে পেছন অংশের উপর আক্রমণ করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো। তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক। রাতে জার্মানরা প্যারেড করার সময় কমান্ডোরা ছোট মিনজানিকের সাহায্যে তরল দাহ্য পদার্থ ভর্তি পাতিল এবং পরক্ষণেই জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়ছিলো। তাতে ক্যাম্পে আগুন ধরে যেতো।

জার্মান বাহিনী যখন আক্রা পৌঁছে, তখন তাদের সেনাসংখ্যা কমে বিশ হাজারে নেমে এসেছিলো। অথচ এই বাহিনী যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সংখ্যা ছিলো দু'লাখ। তাদের কিছু দামেশ্‌ক আক্রমণের সময় নিহত হয়েছে। কিছু রোগ ও ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গেছে। কিছু দামেশ্‌ক থেকে আক্রা যাওয়ার সময় পথে মুসলিম গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সেই সৈনিকদের সংখ্যাও কম ছিলো না, যারা ফৌজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। শেষমেষ যে বিশ হাজার রক্ষা পেয়েছিলো, তারা সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলো। তাদের অন্তর থেকে ক্রুশের শ্রদ্ধা ও নিজেদের শপথ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো।

ওদিক থেকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সম্রাটদ্বয় নদীপথে এগিয়ে আসছেন। ইংল্যান্ডের ফৌজ– যারা কাবরাস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে– কীরূপ এবং সংখ্যা কতো, সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সময়মতো জেনে ফেলেছেন। তারা ষাট হাজার। ফ্রান্সের বাহিনীর সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। আছে বিশ হাজার জার্মান ফৌজ। খৃস্টানদের আরো কিছু সৈন্য পূর্ব থেকেই পবিত্র ভূমিতে রয়েছে।

সুলতান আইউবী গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পান, যে সম্রাট গাই অফ লুজিনান ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন, কাউন্ট অফ কনড়াডের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি বাহিনী গঠন করেছেন, যাতে সাতশ' নাইট, নয় হাজার ফিরিঙ্গ সৈন্য এবং বারো হাজার ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসার-সৈন্য রয়েছে। এভাবে শুধু তার বাহিনীরই সেনা সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার হয়ে গেছে। আনুমানিক হিসেবে খৃস্টান যৌথ বাহিনীর সেনাসংখ্যা ৬ লাখে দাঁড়িয়েছে, যারা অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের দিক থেকে ইসলামী ফৌজ থেকে উন্নত।

সুলতান আইউবীর সঙ্গে দশ হাজার মামলুক ছিলো। এটি তার একটি নির্বাচিত বিশেষ বাহিনী, যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিলো। আক্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি বন্দর এলাকাও। প্রাকৃতিকভাবেই অঞ্চলটা এমন যে, নৌবাহিনীর এক বিশাল ও নিরাপদ ক্যাম্পরূপে গড়ে উঠতে পারে। আক্রা নগরীতে সুলতান আইউবীর সৈন্যসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সাহায্য নিতে পারছেন না। কেননা, এটিই সেই ভূখণ্ড, যার জন্য খৃস্টানদের এই মহা-সমরের আয়োজন-প্রস্তুতি। এর প্রতিরক্ষা এতোটুকুও দুর্বল করা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের নৌ-বহর অনেক শক্তিশালী ও ভয়ংকর। সুলতান আইউবী ভালোভাবেই জানেন, তাঁর মিসরী নৌ-বহর ইংল্যান্ডের বহরের মোকাবেলা করতে পারবে না।

সুলতান আইউবীর জন্য এ এক বিশাল ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ, যা তাকে বরণ করে নিতে হলো। কিন্তু তিনি এই ঝড়ের মোকাবেলা কীভাবে করবেন। তাঁর বাহিনী চারটি বছর অবিরাম যুদ্ধ করছে। গেরিলা ও কমান্ডো সেনারা পাহাড়-জঙ্গলে যুদ্ধ করেছে আর জীবন বিলাচ্ছে। নিজেও অনুরূপ জীবন অতিবাহিত করছেন। কাজেই বাহ্যিক বিবেচনায় এখন তাঁর এই বাহিনী যুদ্ধ করার উপযোগী নয়। কতো আর পারা যায়। শুধু ঈমানী চেতনার জোরে এই স্বল্প ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বাহিনীটির ৬ লাখ তরতাজা খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করা কীভাবে সম্ভব?

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান আইউবীর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। প্রতি মুহূর্ত গভীর ভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মাথায় যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে থাকতেন। তার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিলো। একবার অসুস্থও হয়ে পড়েন। তিন দিন বিছানায় পড়ে থেকে চতুর্থ দিন ওঠে বসেন। কিন্তু শরীরে পূর্বের শক্তি আর ফিরে আসেনি। তখন বয়স হয়েছিলো ৫৪ বছর। যৌবনে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এখনো পাহাড়-বন-বিয়াবনে যুদ্ধ করছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবেন বলে কসম খেয়েছিলেন। সে কসম তিনি পূর্ণ করেছেন। তারপর প্রতিজ্ঞা নেন, যে ক'দিন বেঁচে থাকবেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ইসলামের পতাকা অপসারিত হতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলো।

❖ ❖ ❖

আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও সমর বিশেষজ্ঞ এ্যান্থনি ওয়েস্ট হ্যারল্ড

ল্যাম্ব, লেনপোল, গিবন ও আরনল্ড প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন– 'সুলতান আইউবী একদিন মসজিদে গিয়ে বসেন। সারাদিন আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দু'আ করতে থাকেন, যেনো এই নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁকে ইসলামী বাহিনীকে সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বদানের তাওফীক দান করেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদ থেকে বের হন। তখন তাঁর চেহারায় স্থিরতা ও প্রশান্তি ছিলো।'

এ কথা ঠিক যে, সুলতান আইউবী মসজিদে গিয়ে সিজদাবনত হয়েছিলেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সে সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী ও কাহিনীকারগণ লিখেছেন, সুলতান দিনে নয়– রাতে মসজিদে আকসায় গিয়েছিলেন। তিনি সারারাত নামায, দু'আ, দরূদ ও অজীফা পাঠে অতিবাহিত করেন এবং ফজর নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হন।

সে রাতে মসজিদে তিনি একা ছিলেন না। মসজিদের বারান্দায় এক কোণে এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে ছিলো। লোকটি কখনো সিজদা করছিলো, কখনো হাত তুলে দু'আ করছিলো। লোকজন ঈশা'র নামায আদায় করে মসজিদ থেকে চলে যাওযার পর লোকটি মসজিদে এসে বসেছিলো। মুখটা তার কম্বলে ঢাকা ছিলো।

মুআজ্জিন যখন ফজরের আযান দেন, তখন সে নিজেকে কম্বলে ঢেকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকে। তারপর লোকটার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করে। কম্বলওয়ালা ব্যক্তি ঘুরে পেছন পানে এক নজর তাকিয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। তাকে অনুসরণকারী লোকটিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। সামনে একস্থানে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলো। কম্বলওয়ালা তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কী যেনো বলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তৃতীয় ব্যক্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। অনুসরণকারী লোকটি তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, লোকটি কে ছিলো?

'উহ্ তুমি!'– লোকটি বললো– 'তুমি ওকে অনুসরণ করছিলে?'

'আমি তার পা দেখেছি'– অনুসরণকারী লোকটি বললো– 'লোকটি পুরুষ নয়– নারী। তোমার আত্মীয়? তুমি তাকে চেনো?'

'এহতেশাম!'– লোকটি বললো– 'আমি জানি, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছো। যে কারো উপর নজর রাখা তোমার কর্তব্যের অংশ। আমি তোমার থেকে কিছুই গোপন রাখবো না। কিন্তু একজন নারীর মসজিদে যাওয়া গুনাহ্ তো নয়।'

'তা ঠিক'– এহতেশাম বললো– 'আমার সন্দেহটা হচ্ছে, সে নিজেকে কম্বলে মুড়িয়ে রেখেছে কেনো? শোনো আল-আস! রাতে আমরা তিনজন লোক মসজিদের চারদিকে পাহারার জন্য ঘোরাফেরা করতে থাকি। কারণ, সুলতান ভেতরে ছিলেন। তবে তিনি বিষয়টা জানতেন না। তিনি কাউকে কিছু না বলে মসজিদে এসেছিলেন। তিনি জানেন না, তাঁর পোশাকী রক্ষীদের ছাড়াও কেউ তার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এটা হাসান ইবনে আবদুল্লাহর ব্যবস্থাপনা। তুমি স্বয়ং ফৌজের একজন কমান্ডার। আমাকে তুমি ভালোভাবেই জানো। সে কারণে কথাগুলো এতো খোলাখুলি বলছি।'

'বলো এহতেশাম!– আল-আস বললো– 'বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং মসজিদে আকসার এতো নিকটে দাঁড়িয়ে কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। আমি তোমাকে বলে দেবো, মেয়েটা কে। তার আগে তুমি বলো, তার উপর কেনো তোমার সন্দেহ জেগেছে।'

'আমি রাতে তাকে বারান্দার কোণে দেখেছি'– এহতেশাম উত্তর দেয়– 'সুলতানের নিরাপত্তার খাতিরে তাকে ওখান থেকে তুলে দেয়া আবশ্যক ছিলো। ঈশার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। লোকটার চলে যাওয়া উচিত ছিলো। তখন সুলতান মিম্বরের সামনে ইবাদত ও অজীফায় মগ্ন ছিলেন। এই লোকটি কম্বলে ঢাকা ছিলো। সুলতানের উপর সংহারী আক্রমণ হতে পারতো। কিন্তু মসজিদ থেকে তো কাউকে বের করে দেয়া যায় না। আমি এ-ও দেখলাম, লোকটা অভিনব এক পন্থায় ইবাদত করছে। সিজদা করছে, উঠছে আর দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করছে। সে নিয়ম অনুযায়ী নামায পড়েনি। আমি আমার সঙ্গীদের বিষয়টা জানালাম। তারা একজন একজন করে ভেতরে গিয়ে এমনভাবে দেখে যে, সে টের পায়নি কেউ তাকে দেখছে। তারা বেরিয়ে এসে বললো, সন্দেহভাজন– নজর রাখতে হবে। কিন্তু তুলে দেয়া যাবে না। কারণ, আমি তার একেবারে পেছনে বসে তার হেঁচকি শুনেছি এবং কিছু শব্দও শুনেছি। যেনো সে নিজ পাপের ক্ষমা এবং খৃষ্টানদের পরাজয়ের দু'আ করছিলো।'...

'আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রাত কেটে গেছে। ফজরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। আমরা সারারাত পালাক্রমে তার উপর নজর রাখি। আযানের পর বেরিয়ে আসবার সময় মসজিদের বাতির আলোতে কম্বলের ফাঁক দিয়ে আমি তার পা দেখেছি। হাতও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে সে হাতখানা কম্বলে ঢেকে ফেলে। আমি তাকে অনুসরণ করতে শুরু করি।'

'হ্যাঁ, বন্ধু!'– আল-আস বললো– 'তুমি ঠিক দেখেছো। লোকটি পুরুষ নয়– নারী। আর খুবই রূপসী ও যুবতী। আমি তোমাকে আরো বলে দিচ্ছি, মেয়েটি একজন গুনাহ্গার নারী, যে কিনা বিগত দশ বছর আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছিলো।'

'খৃস্টান?'

'খৃস্টান ছিলো'– আল-আস উত্তর দেয়– 'এখন মুসলমান। আমি তাকে এক মুসলমানের ঘরে রেখেছি। তুমি তাকে দেওয়ানা বলতে পারো। দরবেশদের ন্যায় কথা বলে।'

'আর তুমি তার কথায় বিশ্বাস করেছো'– এহ্তেশাম বললো– 'তুমি রণাঙ্গনের যোদ্ধা। এই নারীদের ছলনা বুঝবে না।'

'আমার সঙ্গে আসো'– আল-আস বললো– 'তাকে দেখো, তার সঙ্গে কথা বলো। সন্দেহ দূর করো। এটা তোমারই কাজ। বিষয়টা তুমিই ভালো বুঝবে। এটা সত্য যে, আমি তার কথায় বিশ্বাস করেছি। তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমিই করেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

এহ্তেশাম আল-আসের সঙ্গে চলে যায়।

সেটি এক বুযুর্গের ঘর, যিনি দীর্ঘদিন যাবত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছেন। এহ্তেশাম ও আল-আস তাঁর দেউড়িতে গিয়ে বসে। বুযুর্গ নামায পড়তে মসজিদে গেছেন। এহ্তেশাম আল-আসকে বললো, আচ্ছা, উনি আসুন। এই ফাঁকে বলো তো, মেয়েটি কোথা থেকে কীভাবে এসেছে। তার ব্যাপারে আরো যা জানো বলো।'

'গত গ্রীষ্মের ঘটনা'– আল-আস বলতে শুরু করে– 'আমি মিসরের সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে গেরিলাদের একটি ইউনিটে ছিলাম। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় হয়ে গেছে। টিলা-পাথর ও মরুভূমিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। ওখানে আমাদের কোনো কাজ ছিলো না। একসময়

আমাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। আমার হাতে একটি সেনাদলের কমান্ড অর্পণ করা হয়। সঙ্গে ষোলজন গেরিলা ছিলো। প্রতিটি দল নিজ নিজ গতিতে ফিরে আসছিলো। একস্থানে অনেকগুলো টিলা স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলো। কোনো কোনোটি অতিশয় ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর লাগছিলো। আমার এক গেরিলা রসিকতা করে বললো, এগুলো জিন-পরীদের প্রাসাদ। এখানে রূপসী ও দুশ্চরিত্র নারীর প্রেতাত্মাও থাকতে পারে। শুনে আমাদের হাসি পায়। আমরা টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ি।'

'সেগুলোর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর স্থানেও আমরা রাত যাপন করেছি। এমন এমন জায়গায়ও বহু রাত ঘুমিয়েছি, যেখানে মানব কংকাল, মাথার খুলি ইত্যাদি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিলো। কিন্তু এই টিলাগুলোর ভেতরে ঢোকামাত্র ভয়ে আমাদের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা দাঁড়িয়ে যাই। আমি জীবনে এই প্রথমবার ভয় কী জিনিস অনুভব করি। আমার গোটা বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'আ-দরুদ পড়তে শুরু করে। সামনে এক টিলার ছায়ায় এক মহিলা বসে আছে। মহিলার সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র– একদম জন্মকালীন পোশাক পরিহিত। তার সম্মুখে আরেক নারী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে– সেও উলঙ্গ। উপবিষ্ট মহিলাকে যুবতী বলে মনে হলো। তার গায়ের রং গৌর। ওষ্ঠাধর মরুভূমির বালির ন্যায় শুষ্ক ও ফাটা ফাটা। মুখটা খোলা। মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত। উলঙ্গ দেহের হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। তবে এই অবস্থায়ও বুঝা যাচ্ছে, মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী।'...

'মনে প্রশ্ন জাগে– এরা মানুষ না অন্যকিছু। মাথায় উত্তর আসে– না, মানুষ হতে পারে না। এটা তো চলাচলের পথ নয় যে, এখান দিয়ে মানুষ গমনাগমন করছে আর দস্যু-তস্করা তাদের লুটে নিয়ে গেছে এবং এরা রক্ষা পেয়ে এখানে এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমি আমার সৈনিকদেরকে ভয় দেখাতে চাইলাম না। কিন্তু তারা নিজেরাই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আমার হৃদয়েও প্রত্যয় জন্মে গেছে, এরা পাপিষ্ঠ নারীর প্রেতাত্মা বৈ নয়। আমি এই আশায় দূরেই দাঁড়িয়ে থাকি যে, ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু উপবিষ্টজন বসেই থাকলো আর শায়িতজন শুয়েই রইলো। উপবিষ্টজন পিট পিট চোখে আমাদের দেখতে থাকে। আমার এক সঙ্গী আমাকে কানে কানে বললো, চলুন পেছনে ফিরে যাই। পাশের থেকে একজন বললো, হ্যাঁ চলে যাওয়াই ভালো হবে। তবে এদের দিকে পিঠ দেয়া যাবে না। ভয়ে সকলের গা ছম ছম করছে।'

'তাদের ও আমাদের মাঝে ব্যবধান বড়জোর পনের পা। আমরা সকলে খুব ধীরে একপা-একপা করে পেছনে সরে যেতে থাকি। এবার বসা মেয়েটি মাথায় ইঙ্গিত করে, যেনো আমাদের ডাকছে। আমি পেছন পানে আরো একপা তুললে সে আবারো মাথা দ্বারা ইশারা করে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। আমি বাস্তবিক কোনো শব্দ শুনেছিলাম, নাকি মনে কল্পনা এসেছিলো ঠিক বলতে পারবো না। আমার কানে শব্দ আসে– পলায়ন করো না আল-আস! ওরা মানুষ বৈ নয়। হঠাৎ আমার ডান হাতটা কোমরে চলে যায়। তরবারীটা খুলে এনে কোষমুক্ত করে ফেলি। আমার পা আপনা-আপনি সামনের দিকে এগুতে শুরু করে। আমি সঙ্গীদের কথা শুনতে পাই। তারা আমাকে সম্মুখে যেতে বারণ করছে। আমি আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে শুরু করি।'....

'আমি মেয়েটি থেকে তিন-চার পা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। সে ধীরে ধীরে ওঠে দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে পা বাড়ায়। তার মাথাটা দুলছে। একপা এগিয়ে আরেক পা তুলতে উদ্যত হয়। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমনভাবে পড়ে যায় যে, তার মাথাটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে এবং মাথার চুলগুলো আমার পায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আমি উলঙ্গ নারীর গায়ে হাত লাগাতে ইতস্তত করছিলাম। তাছাড়া ভয় তো আছেই। আমার দেখবার ছিলো, মেয়েটি মানুষ না অন্যকিছু। আমি বসে তার শিরায় হাত রাখি। শিরা চলছে। মনে ধারণা জন্মে, জিন-পরীদের হয়তো শিরা থাকে না। এবার তার থেকে সরে আমি শুয়ে থাকা মেয়েটির শিরা দেখি। কাঠফাটা গরম সত্ত্বেও তার দেহটা রাতের মরুভূমির বালির ন্যায় অস্বাভাবিক শীতল। তার শিরায় প্রাণ নেই। মুখটা খোলা। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে। শরীরটা সাদা। আমি তার মধ্যে মৃত্যুর সব লক্ষণ প্রত্যক্ষ করি।'...

'আর বসা থেকে ওঠে এসে যে মেয়েটি আমার পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিলো, তার দেহ গরম। এ প্রেতাত্মা কিংবা পরী হতে পারে না। আল্লাহ আমাকে বিবেক ও সাহস দান করেছেন। আমি আমার বাহিনীকে ডাক দেই। আমাদের সঙ্গে খাবার-পানি সবই ছিলো। সঙ্গীদের বললাম, তাড়াতাড়ি দু'টি চাদর আর কিছু পানি নিয়ে আসো। তারা চাদর ও পানি নিয়ে আসে। সূর্য এখনো মাথার উপর আসেনি। এখানে উঁচু টিলার ছায়া ছিলো। আমি একখানা চাদর টিলার পাদদেশে ছায়ায় বিছিয়ে তার উপর

সংজ্ঞাহীন মেয়েটিকে শুইয়ে দেই এবং অপর চাদর দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে রাখি। তার মুখে পানির ছিটা দেই। মুখটা খোলা ছিলো। তাতে ফোটা ফোটা পানি ঢেলে দেই। পানি তার কণ্ঠনালী গড়িয়ে ভেতরে চলে যায়।'...

'সঙ্গীরা আমাকে বারণ করছে, অহেতুক বিপদ ডেকে এনো না। কিন্তু এখন আর আমার কোনো ভয় লাগছে না। সঙ্গীদের কথাও কোনো ক্রিয়া করছে না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে। ঠোঁট দুটো একত্র হয়ে আবার খুলে যায়। আমি আবারো তার মুখে পানি দেই। তারপর আটি বের করে একটি খেজুর তার মুখে রাখি। সে খেতে শুরু করে। এবার মেয়েটি উঠে বসবার চেষ্টা করে। আমি তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দেই।'

আল-আস এহতেশামকে কাহিনী শোনাচ্ছে–

'আমি তাকে খাবার খেতে দেই। খাবার খেয়ে সে পানি পান করে। আরো খেতে চাইলে খালি পেটে অতো খাওয়া ঠিক হবে না বলে বারণ করি। সে ক্ষীণকণ্ঠে বললো, আমি তোমার ভাষা বুঝি ও বলতে পারি। ঐ মেয়েটি মারা গেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কারা? বললাম, আমরা ইসলামী ফৌজের কমান্ডো সেনা। বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। সে বললো, তাহলে তো তোমাদের থেকে কোনো করুণা আশা করতে পারি না। আমি বললাম, তুমি বোধ হয় মুসলমান নও। সে বললো, আমি মিথ্যা বলবো না। তবে সত্য বললেও তুমি আক্ষেপ করবে, কেনো বাঁচিয়ে রাখলাম। আমি বললাম, তুমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করো, তুমি মানুষ। শুনে মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ওঠে। আস্তে আস্তে তার চেহারার রং বদলে যেতে শুরু করে। দেহে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়ে গেছে।'...

'সহসা মেয়েটির দু'চোখের পাতা বুজে আসে। তার ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎই সে অবোধ শিশুর ন্যায় একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আমরা অনেক খুন ও লুণ্ঠন করেছি। বহু কমান্ডো আক্রমণ চালিয়েছি। কয়েকজন সঙ্গী আমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। মরা আর মারা আমাদের জন্য ছিলো শিশুর খেলার ন্যায়। কিন্তু একজন নারীর উপর হাত তোলা– হোক সে আমাদের শত্রু– আমরা মহাপাপ মনে করেছি। আমি সঙ্গীদের বললাম, সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। একটু পর এখানে ছায়া থাকবে না। আশপাশে ছায়া খুঁজে বের করে বিশ্রাম নাও। মেয়েটি জাগ্রত হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হবো।'..

'আমার এক-দু'জন সঙ্গী বললো, মেয়েটি গুপ্তচর মনে হচ্ছে। অন্যরা ভিন্নমত পোষণ করে বললো, এখানে নারী গুপ্তচরের কী কাজ থাকতে পারে? এরা গুপ্তচরও নয়– মানুষও নয়। আমি বললাম, আমরা গেরিলা সৈনিক। মিসর ও ফিলিস্তীনের সীমান্ত অঞ্চলে তৎপর ছিলাম। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এদেরকে এখানে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে নিজের মধ্যেই সন্দেহ জাগে, তা-ই যদি হতো, তাহলে কমপক্ষে এক-দু'জন পুরুষও তো থাকতো।'

'সূর্যাস্তের খানিক আগে মেয়েটির ঘুম ভেঙে যায় এবং উঠে বসে। আমি তার নিকটে গিয়ে বসি। সে পানি পান করে আরো কিছু খেতে চায়। আমি তাকে খাবার দেই। এবার সে ভালোভাবে কথা বলতে পারছে। মৃত মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, ওকে দাফন করে ফেলো। আমার সৈনিকরা ধার্মিক ছিলো। একজন নিজের চাদরটা দিয়ে দেয়। আমরা একটা কবর খনন করে চাদরে পেঁচিয়ে লাশটা দাফন করে রাখি।'

আল-আস এহতেশামকে জানায়–

'মেয়েটি তারা কারা, কোথা থেকে আসলো, কোথায় যাচ্ছে– এসব বলার পরিবর্তে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি কখনো খোদাকে দেখেছো? উত্তরে আমার যা বুঝে আসলো বললাম। সে বললো, আমি তোমার খোদাকে দেখেছি। এই এইমাত্র দেখেছি। বলবে, তুমি স্বপ্ন দেখেছো। খোদা আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে চোখ দিয়েছি। অন্ধকারেও তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেছেন, তুমি পাপ করেছো। এরপর যদি কখনো পাপের চিন্তা করো, তাহলে তোমার নিজ হাতেরই খঞ্জর দ্বারা তোমার চোখ দুটো তুলে ফেলবো। খোদা আমাকে এ কথাও বলেছেন, আমি তোমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখান থেকে আমি আমার প্রিয় রাসূলকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলাম।'...

'মেয়েটি এমন অনেক কথা বলে, যাদ্বারা প্রমাণিত হয়, মরুভূমির কষ্টকর সফর আর নানাবিধ বিপদাপদ তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। যেমন, সে বললো, তোমরা আমার দেহটা ঢেকে দিয়েছো কেনো? তাকে উলঙ্গই থাকতে দিলে কী হতো? আমি এখন শরীর নই– আত্মা। আত্মা যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দেহের পাপরাশি মুছে যায় ইত্যাদি। সে বেশিরভাগ এ জাতীয় কথা-বার্তাই বলতে থাকে। তাতে আমি নিশ্চিত হই, মেয়েটি অন্যকিছু নয়– মানুষই। আর তার বলা ছাড়াই আমার জানা হয়ে

গেছে, এরা সেই খৃস্টান মেয়েদের দলভুক্ত, যাদেকে আমাদের আমীর-উজির ও সালারদেরকে গাদ্দার বানানোর লক্ষ্যে আমাদের দেশে প্রেরণ করা হয়। আমার মনে সন্দেহ জাগে, মেয়েটি আমাদেরকে বোকা ঠাওরানোর চেষ্টা করছে। তার মাথাটা আসলে সম্পূর্ণ ঠিক আছে।'...

'আমি তাকে বললাম, ঠিক ঠিক বলে দাও, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে? সত্য বের করার জন্য আমি তাকে হুমকি-ধমকিও দেই। কিন্তু তার বলার ধরণ ও দেওয়ানা জাতীয় কথা-বার্তায় কোনো পরিবর্তন আসলো না। সূর্যাস্তের পর আমি তাকে আমাদের মালবাহী ঘোড়ার উপর বসিয়ে গন্তব্যপানে রওনা হই।'...

'আমার বাহিনী সামনের দিকে এগুতে থাকে। আমি মেয়েটির ঘোড়ার সঙ্গে অনেক পেছনে পড়ে যাই। এখন সে নিজেকে সামলাতে পারছে। কিন্তু কথা-বার্তা ঐ দরবেশদের ন্যায় বলছে। মধ্যরাতের পর আমরা যাত্রা বিরতি দেই। আমি মেয়েটিকে সকলের থেকে আলাদা রাখি এবং নিজে তার সঙ্গে থাকি। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় যেতে চাও? সে বললো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। বললাম, আমি তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে যাচ্ছি। সে বললো, অসুবিধা নেই। শুনেছি খোদা কয়েদখানায়ও থাকেন। তারপর আমি অন্য পন্থা অবলম্বন করি। আমি তার বেশ আপন ও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই। ভাবলাম, হয়তো সে আমার সঙ্গে সওদাবাজি শুরু করবে এবং প্রলোভন দেখিয়ে বলবে, আমাকে খৃস্টানদের কোনো এক অঞ্চলে পৌছিয়ে দাও। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। এসবের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলো না। পরবর্তী রাতে সে নিজের আসল পরিচয় প্রদান করে।'...

'মেয়েটি বললো, সে দেড় বছর কায়রোতে ছিলো। সেখানে তার পরিচয় ছিলো, সে বড় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা। এক মুসলিম শাসকের গণিকা ছিলো। মিসর সরকারের দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তার শত্রুতে পরিণত করে। তারপর তিনজনকে আপসে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে। কায়রোর রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দু'জন খৃস্টান গোয়েন্দাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করায়। একজন বিপজ্জনক খৃস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতাকারীকে– যার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা ছিলো– সেই মুসলিম কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ফেরার করায়। অবশেষে মিসরের গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলো।'...

'সেই মুহূর্তে সে হিত্তীন যুদ্ধের ফলাফলের কথা জানতে পারে। এ-ও অবহিত হয় যে, তাদের বড় ক্রুশ সুলতান আইউবীর হাতে চলে গেছে আর সেই ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছেন। মেয়েটি এ সংবাদও পায় যে, কয়েকজন খৃস্টান সম্রাট মারা গেছেন। কতিপয় যুদ্ধবন্দি হয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনানও বন্দি হয়েছেন। এ সংবাদগুলো তার মাথায় হাতুড়ির ন্যায় আঘাত করতে থাকে। তারপর সে আরো দু'টি সংবাদ পায়, তাদের চরবৃত্তি ও নাশকতার গুরু হারমান বন্দি হয়েছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে চলে গেছে। এসব সংবাদ তার মাথাটা উলোট-পালট করে দিয়েছে। তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রস্তুত করে কায়রো পাঠানো হয়েছিলো। পাপের প্রশিক্ষণটা শৈশবেই হয়েছিলো। তার ভেতরে চেতনার স্থলে ধোঁকা ও প্রতারণা ভরে দেয়া হয়েছিলো। তাকে জানানো হয়েছিলো, তোমাকে বড় ক্রুশ এবং যীশুখৃস্টের সন্তুষ্টির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর আক্রার বড় গীর্জায় ক্রুশের প্রধান পাদ্রী তাকে আশির্বাদ করেছিলেন।'...

'বিদায়ের প্রাক্কালে পাদ্রী তাকে বলেছিলেন, ক্রুশের রাজত্ব অজেয় এবং তার কেন্দ্র জেরুজালেম, যার সন্নিকটে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো। তাকে আরো বলা হয়েছিলো, ইসলাম কোনো ধর্ম নয় এবং মুসলমানদেরকে খৃস্টধর্মে দিক্ষিত করা কিংবা তাদের হত্যা করে পৃথিবীকে মুসলমানমুক্ত করা পুণ্যের কাজ। আর এই যে মেয়েরা ক্রুশের নামে সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে, তাদেরকে পরজগতে স্বর্গের হুর বানানো হবে। এভাবে পাপকে পুণ্যরূপে উপস্থাপন করে মেয়েটিকে প্রস্তুত করা হয়েছিলো।'...

'পরে যখন সে জানতে পারলো বড় ক্রুশও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তার বিশ্বাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সে দেখতে পায়, কায়রোতে তার যে পুরুষ সহকর্মীরা ছিলো, তারা ওখান থেকে পালাতে শুরু করেছে। একদিন এক সঙ্গীর সন্ধানে গিয়ে জানতে পারে, সে উধাও হয়ে গেছে। অপর এক সঙ্গী তাকে বললো, এখন আমাদেরকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো কেউ নেই। ভালো হবে, মুসলমান হয়ে কোনো একজন মুসলমানকে বিয়ে করে নাও। নতুবা এখান থেকে পালিয়ে যাও।'...

'মেয়েটি পাগলের মতো হয়ে যায়। সে তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নেয়। এক মুসলমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার প্রেমিক ছিলো। ফাঁকি দিয়ে তার থেকে দু'টি ঘোড়া নিয়ে সন্ধ্যার সময় দু'জন বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকার গাঢ়

হলে নগরী থেকে বেরিয়ে আসে। তারা খাবার-পানির কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। কিন্তু মরুভূমির সফর সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। কোথায় যাবে, তাও তারা জানতো না। আশা ছিলো, পথে কোথাও খৃষ্টান সেনাদল পেয়ে যাবে। কিন্তু তাদের নির্বুদ্ধিতা ছিলো, পথঘাট সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না নিয়েই রওনা হয়েছিলো।'...

'রাতটা কেটে গেছে। তারা ঘোড়া দ্রুত হাঁকিয়েছিলো। পরদিন সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসে যখন মরুভূমিকে ঝলসে দিতে শুরু করে, তখন ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় বেহাল হয়ে যেতে শুরু করে। তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারা মরুভূমিতে পানি ও শ্যামলিমা দেখতে শুরু করে। সেগুলোর পেছনে পেছনে তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতে থাকে। সেদিনটি ঘোড়া কিছুটা সঙ্গ দেয় বটে; কিন্তু পরদিনও যখন পানাহারের জন্য কিছু জোটেনি, তখন ঘোড়া দুটো প্রথমে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর লুটিয়ে পড়ে। অতপর আর ওঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।'...

'তারপর মেয়ে দুটোর যে সফর শুরু হয়েছিলো, এহতেশাম ভাই! তুমি তা ভালোভাবেই জানো। নির্দয় মরুভূমি এ ধরনের পথিকদের কোন্ পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছায়, তোমার তা জানা আছে। মেয়েটি আমাকে বলেছে, আমরা মানুষকে যেসব ধোঁকা দিয়েছিলাম, মরুভূমি আমাদেরকে তার চেয়েও বেশি নির্মম ধোঁকা দিয়েছে। আমি মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হতে দেখলাম। নিকটে গেলাম, তো নদী দূরে সরে গেলো। আমরা তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি। আমি হাত উপরে তুলে নাড়াতাম, চীৎকার করতাম ও তাদের পেছনে পেছনে দৌড়াতাম। বহু জায়গায় আমরা পানি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে সেগুলো পানি ছিলে না।'...

'মেয়েটি আমাকে বলেছে, তার যে অস্তিত্ব কায়রোর সরকারি কর্মকর্তাদের উপর যাদু প্রয়োগ করেছিলো, মরুভূমিতে সেই অস্তিত্ব মরে গেছে। তার হৃদয়ে আমাদের খোদার ভাবনা এসে গেছে এবং তার মধ্যে এই অনুভূতি কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হতে শুরু করেছে যে, ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ তাকে ধোঁকা দিয়েছেন আর এখন সে অন্যদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। তার মধ্যে বুঝ আসে, নিজের সম্ভ্রম উপস্থাপন করে কাউকে ধোঁকা দেয়া পুণ্যের কাজ নয়। মনে এই ভাবনাও জাগে যে, মুসলমানরা তাদের মেয়েদেরকে এভাবে ব্যবহার করে না। একদিন মরুভূমিতে তার এই অনুভূতিও জাগে, যেনো সে ও তার বান্ধবী মরে গেছে এবং নরকে

নিক্ষিপ্ত হয়েছে কিংবা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়ে গেছে এবং নরকের ন্যায় প্রজ্বলমান প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরছে।'...

'এক রাতে সে তার বান্ধবীকে বললো, আজীবনের লালিত বিশ্বাস থেকে আমার মন উঠে গেছে এবং এখন থেকে আমি মুসলমানের খোদাকে ডাকবো। উভয়ের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঠের ন্যায় শুকিয়ে গিয়েছিলো। কণ্ঠনালীতে কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছিলো। কথা বলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিলো। আপন বিশ্বাস থেকে সরে আসা এবং শত্রুর বিশ্বাস ধারণ করার বিষয়টি তার বান্ধবী ভালো চোখে দেখেনি। তাই সে তার মতে সায় দেয়নি। একসময় বান্ধবী শুয়ে পড়লে সে দূরে এক স্থানে চলে যায়। সে সিজদা করে ও হাত তুলে মহান আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। মেয়েটি সমগ্র রাত ক্রন্দন করে কাটায়। সিজদা ছাড়া ইবাদতের আর কোনো পন্থা তার জানা ছিলো না।'...

'তার ভাষ্য মতে, সে রাতেই হঠাৎ ধোঁয়ার ন্যায় শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। সে বললো, তুমি যদি অন্তর থেকে তাওবা করে থাকো, তাহলে তুমি যে খোদার সমীপে প্রার্থনা করেছো, তিনি এই মরুভূমি থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নেবেন।'...

'আমরা দশ-বারো দিন পর বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছি। এতোদিনে তার স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গেছে। দেহের রূপ-লাবণ্য ফিরে এসেছে। কিন্তু কথা-বার্তা সেই দেওয়ানার ন্যায়ই বলতে থাকে। সেরূপ কথা যদি তোমার সঙ্গেও বলতো, তুমি প্রভাবিত হয়ে যেতে। সে বহুবার বলেছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আর কোনদিন খৃস্টানদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। খোদা তাদেরকে পথেই ডুবিয়ে মারবেন। মেয়েটি এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে। রাতে তার ইবাদত শুরু হতো। পন্থা একটাই– সিজদা করা, ক্রন্দন করা ও প্রার্থনা করা।'...

'মেয়েটি এখন এই যাঁর ঘরে থাকছে, আমি বহুদিন যাবত তাঁকে জানি। অনেক বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। আমি তাঁর ভক্ত। আমি মেয়েটিকে তাঁর হাতে তুলে দেই।'...

❖ ❖ ❖

বুযুর্গ নামায পড়ে ফিরে এসেছেন। তিনি এহতেশামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'যার কাছে ইল্‌ম আছে, আল্লাহ এই ফজীলত তাকেই দান করবেন এটা জরুরি নয়। জানিনা কখন কোন্ ফরিয়াদ মেয়েটির মুখ থেকে

বের হয়েছিলো, আল্লাহ যা কবুল করে নিয়েছেন এবং মেয়েটিকে এই মর্যাদা দান করেছেন। মেয়েটি পাগল নয়, কাউকে ধোঁকাও দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি তাকে নামায পড়াতে ও শেখাতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ইবাদতের সেই একই পদ্ধতি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করছে আর যখন কথা বলছে, মনে হচ্ছে সে গায়েব থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে।'

'ও কি মসজিদে আকসায় সবসময়ই যাওয়া-আসা করে?' এহতেশাম জিজ্ঞেস করে।

'না'– বুযুর্গ বললেন– 'রাতে এ-ই প্রথমবার মসজিদে গেলো। আল-আস সকালে এসে জিজ্ঞেস করলো, বললাম ও মসজিদে গেছে। আল-আস তার পেছনে চলে যায়। সম্ভবত সে পথেই তাকে পেয়ে যায়।'

'সন্দেহটা এখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে যে, যে রাতে সুলতান আইউবী মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, কেবল সেই রাতে কেনো ও মসজিদে গেলো?'

'আমি তার উত্তর দিতে পারবো না।' বুযুর্গ বললেন।

এহতেশাম বললো, আমি মেয়েটিকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর নিকট নিয়ে যাবো। এটা আমার কর্তব্য। তারপর যা করার তিনি করবেন।

মেয়েটিকে যখন জানানো হলো, তোমাকে এহতেশামের সঙ্গে যেতে হবে, সে চুপচাপ তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আল-আসও সঙ্গে যায়। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ এহতেশাম ও আল-আস থেকে বৃত্তান্ত শোনে মেয়েটিকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়– 'এখন সমুদ্র থেকে আসা নৌবহর তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমাকে কেনো ভয় করছো? আমাকে তোমাদের সুলতানের নিকট নিয়ে চলো। তিনি রাতে যে দু'আ করেছেন, খোদা সব কবুল করে নিয়েছেন।'

অনেক চেষ্টার পরও তার থেকে কোনো কথা বের করা গেলো না। সুলতান আইউবীকে অবহিত করা হলো। সেদিনই সুলতানের আক্রা যাওয়ার কথা ছিলো। তিনি বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসো। মেয়েটি সুলতান আইউবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সুলতানের ডান হাতটা চুম্বন করে। তারপর মাথা তুলে এগিয়ে উঁকি দিয়ে সুলতানের চোখে কী যেনো দেখে। তারপর স্বগতোক্তি করার মতো করে বললো, এই চোখগুলো থেকে রাতে সিজদার মধ্যে অশ্রু বের হয়েছিলো। তোমাদের শত্রুর রণতরীগুলো এই অশ্রুতে ডুবে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। বাইতুল

মুকাদ্দাসের প্রাচীরের কাছেও কেউ ঘেঁষতে পারবে না। রক্তের নদী বয়ে যাবে। তারা পথেই মারা যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে অশ্রু আল্লাহর সমীপে প্রবাহিত হয়, ফেরেশতারা মুক্তা জ্ঞান করে সেগুলো তুলে নেয়। খোদা সেই মুক্তাগুলোকে বিনষ্ট করেন না। নিয়ত পরিষ্কার হলে পথও পরিষ্কার হয়ে যায়।'

মেয়েটিকে আসলরূপে ফিরিয়ে আনার বহু চেষ্টা করা হলো। কিন্তু সে এমন ধারায় কথা বলতে থাকে, যেনো অনাগত দিনগুলো দেখতে পাচ্ছে। অবশেষে দেওয়ানা সাব্যস্ত করেই মেয়েটিকে বুযুর্গের হাওয়ালা করে দেয়া হলো এবং বুযুর্গকে তার প্রতি নজর রাখতে বলা হলো।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মসজিদে আকসায় আল্লাহর সমীপে যে অশ্রু প্রবাহিত করেছিলেন, ফেরেশতারা মুক্তা মনে সেগুলো তুলে নিয়ে যায়। তিনি সর্বপ্রথম সংবাদ পান, সম্রাট ফ্রেডারিক মারা গেছেন। তার দিন কয়েক পর অপর এক খৃস্টান সম্রাট কাউন্ট হেনরির মৃত্যুর সংবাদ আসে। ইনিও খৃস্টানদের যৌথ বাহিনীর এক শরীক ছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, খৃস্টানরা কাউন্ট হেনরির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ পেতে দেয়নি। সুলতান সংবাদটা জানতে পেরেছেন অন্যভাবে।

সুলতান আইউবীর নৌ-কমান্ডোরা খৃস্টানদের দু'টি জঙ্গী নৌকা পাকড়াও করেছিলো, যেগুলো ফিলিস্তীনের তীর থেকে সামান্য দূর দিয়ে অতিক্রম করছিলো। তাতে পঞ্চাশজন খৃস্টান নৌ-সেনা ছিলো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

পরদিন খৃস্টানদের আরো একটি নৌকা ধরা পড়ে। তাতে একটি কোট ছিলো, যার গায়ে মনি-মুক্তা খচিত ছিলো। এটি কোনো এক সম্রাট ছাড়া কারো কোট হতে পারে না। জিজ্ঞাসাবাদে খৃস্টান সৈন্যরা বললো, এটি কাউন্ট হেনরির কোট এবং তিনি মারা গেছেন। এই নৌকায় নৌবাহিনীর কমান্ডার গোছের এক ব্যক্তি ছিলো। জানা গেলো, লোকটি কাউন্ট হেনরির ভাতিজা। তাদের সকলকে বন্দি করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হলো।

সম্রাট কাউন্ট হেনরি কীভাবে মারা গেলেন? কেউ বলেন, তিনি নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তিনি মাত্র তিন

ফুট গভীর পানিতে পড়ে মারা গেছেন। এক বর্ণনা মতে, নদীতে গোসল করতে নামবার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

সুলতান আইউবী যার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলেন, তিনি হলেন ইংল্যান্ডের যুদ্ধবাজ সম্রাট রিচার্ড, যিনি 'ব্ল্যাক প্রিন্স' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাকে সিংহ-হৃদয় রিচার্ডও বলা হতো। লোকটি অভিজ্ঞ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। উচ্চতায় যেমন দীর্ঘ ছিলেন, তেমনি তার বাহুও ছিলো লম্বা। তাতে তার তরবারী দুশমন পর্যন্ত পৌঁছে যেতো; কিন্তু দুশমনের তরবারী তাকে স্পর্শ করতে কষ্ট হতো। খৃস্টজগতে সকলের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ ছিলো। তার সামরিক শক্তিও ছিলো বেশি। তার নৌ-শক্তি ছিলো তৎকালীন পৃথিবীর সবচে' বেশি শক্তিশালী। এ ব্যাপারটিই এখন সুলতান আইউবীর ভয়ের কারণ।

সুলতান আইউবীর এক নৌ-কর্মকর্তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু। নৌ-বাহিনী প্রধান আবদুল মুহসিন। সুলতান আইউবী যখন সংবাদ পেলেন, রিচার্ড তার নৌ-বহর নিয়ে আসছে, তখন আবদুল মুহসিনকে আদেশ প্রেরণ করেন, যেনো তিনি রিচার্ডের বহরের মুখোমুখি না হন এবং নিজের রণতরীগুলো ছড়িয়ে রাখেন। সুলতান আইউবী হুসামুদ্দীন লুলুকে কয়েকটি জাহাজ ও নৌকাসহ আসকালান তলব করেন। তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন, দুশমনের জাহাজগুলোর উপর দৃষ্টি রাখবে। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িত হবে না। তদস্থলে নৌ-গেরিলাদেরকে দুশমনের বিচ্ছিন্ন জাহাজগুলোকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে।

সুলতান আইউবী দেখতে পাচ্ছেন, সমুদ্রেও তাকে গেরিলা যুদ্ধ লড়তে হবে। সময়টা ছিলো সুলতান আইউবীর জন্য খুবই কষ্টকর। রাতে ঘুমাতেন না। তিনি মজলিশে শূরায় বলেছিলেন, আমাদেরকে একটি উপকূলীয় নগরী কুরবান করতে হবে। হতে পারে সেটি আক্রা। আমি দুশমনকে বুঝাতে চাই, আমাদের যা কিছু আছে সব আক্রায় এবং আক্রা হাতছাড়া হয়ে গেলে মুসলমানদের কোমর ভেঙে যাবে। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখলমুক্ত করা সহজ হবে। সুলতান আইউবী মজলিশে শূরাকে জানালেন, আমরা যদি দুশমনকে আক্রা টেনে আনতে সক্ষম হই, তাহলে দুশমন আক্রার প্রাচীরের সঙ্গেই মাথা ঠুকতে থাকবে। মজলিসে শূরা অনুমোদন প্রদান করে, আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।

❖ ❖ ❖

এখন বাইতুল মুকাদ্দাস ও পবিত্র ভূমিকে সুলতান আইউবীর সেই অশ্রুই রক্ষা করতে পারে, যা তিনি মসজিদে আকসায় ঝরিয়েছিলেন। পারে সেই দু'আ, যা সুলতান আইউবী মসজিদে আকসায় সিজদাবনত হয়ে করেছিলেন। উক্ত মেয়েটিও মসজিদে আকসায় দু'আ করেছিলো। পরে সে সুলতান আইউবীর চোখে উঁকি দিয়ে বলেছিলো– 'তোমার দুশমনের জাহাজ তোমার চোখের অশ্রুতে নিমজ্জিত হতে দেখতে পাচ্ছি।'

কোনো ঐতিহাসিক বলতে পারছেন না, সে রাতে সুলতান আইউবী কী দু'আ করেছিলেন। তবে সব ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবীর ন্যায় মর্দে-মুজাহিদ রিচার্ডের যে নৌ-বহরে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে রোম উপসাগরে প্রবেশ করামাত্র সেই বহর ভয়াবহ এক ঝড়ের কবলে পড়ে গিয়েছিলো। সবগুলো জাহাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই বহরে ৫২০টি ছোট জাহাজ ছিলো। বড় জাহাজ ছিলো একাধিক। বহরটি সৈন্য, ঘোড়া, রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতে বোঝাই ছিলো।

ঝড়ের কবলে পড়ে বহরটি এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় যে, রিচার্ডের নিজের জীবনই বিপন্ন হয়ে যায়। ঝড় থামার পর কয়েক দিনে যখন জাহাজগুলোকে একত্রিত করা হলো, তখন জানা গেলো, পঁচিশটি বড় জাহাজ ডুবে গেছে। দু'টি বিশাল মালবাহী জাহাজও পানিতে তলিয়ে গেছে। সেগুলোতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ছিলো। রিচার্ডকে সবচে' বেশি ক্ষতিটির শিকার হতে হলো, সে হলো বিপুল নগদ অর্থ, যেগুলো তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন, সেই বিশাল অর্থ ভাণ্ডারটি তার রোম উপসাগরের অঞ্চলে হারিয়ে গেলো।

কারবাসের দ্বীপে এসে নোঙ্গর ফেলে রিচার্ড জানতে পারেন, ঝড় তার বহরের তিন-চারটি জাহাজকে কারবাসের কূলে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তার একটিতে তার যুবতী বোন জুয়ানা এবং বোনের হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়াও রয়েছে। এ দু'জনের ব্যাপারে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তারা ডুবে মারা গেছে। এখন জানতে পারলেন তারা জীবিত ও নিরাপদ আছে। কিন্তু কাবরাসের সম্রাট আইজেক জাহাজগুলোর সমুদয় মালামাল বের করে নিয়ে গেছেন এবং বোন ও বোনের হবু স্বামীকেসহ সকলকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। রিচার্ডকে আইজেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

হলো। পরাজিত করে তিনি আইজেককে একটি তাঁবুতে আটকে রাখেন। কিন্তু আইজেক রাতে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যান। রিচার্ড পনের-বিশ দিন পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে তাকে পাওয়া গেলো। রিচার্ড তার ঘোড়াটা নিয়ে নেন। সে এক অস্বাভাবিক দ্রুতগামী ঘোড়া। রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমিতে যুদ্ধ করতে আসেন, তখন এই ঘোড়াটি তার সঙ্গে ছিলো।

রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমির কূলে এসে ভিড়েন, ততোক্ষণে তার জোটভুক্ত খৃস্টানরা আক্রা অবরোধ করে ফেলেছে। সর্বপ্রথম যার বাহিনী অবরোধে অংশগ্রহণ করে, তিনি হচ্ছেন গাই অফ লুজিনান, যাকে রানী সাবীলা এই শর্তে মুক্ত করিয়েছিলেন যে, তিনি সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। তার সঙ্গে ফিলিপ অগাস্টাসের বাহিনী এসে যুক্ত হয় এবং অবরোধ শক্ত হয়ে যায়। শহরের ভেতরে মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। রসদ-পাতি যা ছিলো, তা এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিলো। অবরোধ ১১৮৯ সালের ১৩ আগস্ট শুরু হয়। আক্রা নগরীর অবস্থান হচ্ছে, তার একদিকে এল আকৃতির প্রাচীর। তিনদিকে নদী। নদীতে খৃস্টানদের নৌ-বহর বর্তমান। জাহাজগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীর থেকে দূরে খৃস্টান বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এভাবে স্থলের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সুলতান আইউবী নগরীতে নেই। তিনি বাইরে কোথাও অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এবং ভাবগতি দেখিয়ে দুশমনকে আক্রায় টেনে এনেছেন। খৃস্টানরা যখন অবরোধ শুরু করে, তখন তাদের জানানো হয়েছিলো, আইউবী ভেতরে আছেন। কিন্তু অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন তাদের একটি অংশের উপর পেছন থেকে আক্রমণ হলো, তখন তাদের খবর হয়, আইউবী ভেতরে নয়– বাইরে আছেন এবং তিনি খৃস্টানদের আক্রা অবরোধকারী বাহিনীকে অবরোধ করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবীর সমস্যা হচ্ছে, তাঁর সৈন্য কম। তথাপি আশা করছেন, তিনি অবরোধ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তার কামনা, অবরোধ বেশিদিন স্থায়ী হোক, যাতে খৃস্টানদের শক্তি এখানেই ব্যয় হতে থাকে। ১১৮৯ খৃস্টাব্দের ৪ অক্টোবর তিনি খৃস্টানদের উপর জোরদার আক্রমণ চালান। খৃস্টানরা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিলো। ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৯ হাজার খৃস্টানসেনা মারা যায়। কিন্তু তাদের ছিলো দু'লাখ সৈন্য। ৯ হাজারের মৃত্যুতে তাদের কোনো ক্ষতি হলো না।

কীভাবে শহর জয় করবে, তার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তারা। তাদের বাহিনী প্রাচীরের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। কারণ, প্রাচীরের উপর থেকে মুসলমানরা তাদের উপর তীর ছাড়াও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছে।

খৃস্টানরা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে যায়। নগরীর অভ্যন্তরে পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ ও প্রাচীর অতিক্রমের জন্য কাঠ দ্বারা চাকাওয়ালা উঁচু মাচান তৈরি করে নিয়েছে। এতো বিশাল মাচান যে, তাতে কয়েকশ' সৈনিক দাঁড়াতে পারে। তাকে মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত দাহ্য পদার্থ ও গোলা থেকে রক্ষা করার জন্য তার ফ্রেমগুলোতে তামার পাত চড়ানো হয়েছে। তারা যখন মাচানটি প্রাচীরের সন্নিকটে নিয়ে যায়, তখন মুসলমানরা প্রাচীরের উপর থেকে তার উপর দাহ্য পদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পদার্থগুলো মাচানের উপর গিয়ে পতিত হয় এবং অবস্থানকারী সৈনিকদের গায়েও গিয়ে পড়ে। পরপর কয়েকটি পাতিল এসে পতিত হওয়ার পর যখন মাচানটি ভিজে যায়, এবার এক এক করে প্রজ্বলমান কাঠ ছুটে আসতে শুরু করে। আগুনধরা কাঠগুলো তেলভেজা মাচানে এসে পতিত হওয়ামাত্র মাচানে আগুন ধরে যায়। মাচান জ্বলে যায় এবং তাতে অবস্থানকারী সৈন্যরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়।
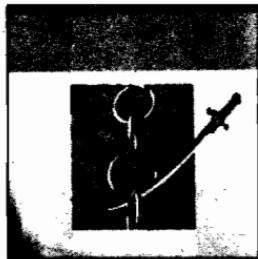
প্রাচীরের বাইরে একটি পরিখা ছিলো, যেটি পার হওয়া খৃস্টানদের জন্য দুঃসাধ্য ছিলো। তারা মাটি দ্বারা পরিখাটি ভরাট করতে শুরু করে। কিন্তু নগরীর ভেতরের সৈনিকরা এতোই দুঃসাহসী যে, তাদের একটি অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ করে করে ফিরে যাচ্ছে। পরিখা ভরাট করার জন্য খৃস্টানরা একটি পন্থা অবলম্বন করে যে, তারা তাদের মৃত সৈনিকদের লাশগুলো তাতে ছুঁড়ে মারছে। তখন থেকে তাদের যতো সৈনিক প্রাণ হারায়, সকলের মরদেহ উক্ত পরিখায় নিক্ষেপ করা হয়। পেছন থেকে সুলতান আইউবী তাদের উপর অনবরত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু খৃস্টানদের অবরোধ দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরো দৃঢ় হতে থাকে।

নগরীর সঙ্গে সুলতান আইউবী বার্তাবাহী কবুতরের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখেন। অপর মাধ্যমটি ছিলো এক ব্যক্তি, যার নাম ঈসা আল-আমওয়াম। লোকটি চামড়ার গায়ে বার্তা লিখে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার কেটে সংবাদ আদান-প্রদান করতো। কাজটা সে রাতে করতো। দুশমনের নোঙ্গরকরা জাহাজের তলে দিয়ে যাওয়া-আসা করতো। এক

রাতে সে এভাবেই আসে। নগরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলে এবং লিখিত বার্তা দেয়া হয়েছিলো। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– লোকটি যখন নিরাপদে নগরীতে গিয়ে পৌঁছতো, তখন একটি কবুতর উড়িয়ে দেয়া হতো। কবুতরটি আমাদের নিকট উড়ে আসতো। তাতে আমরা বুঝে নিতাম, ঈসা নিরাপদে পৌঁছে গেছে। আমরা কবুতরটি ফেরত উড়িয়ে দিতাম। যে রাতে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে গেলো, তার পরদিন কবুতর আসলো না। আমরা বুঝে ফেললাম, ঈসা ধরা পড়েছে। কয়েকদিন পর আমাদের নিকট সংবাদ আসে, ঈসার লাশ আক্রার কূলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। সোনাভর্তি থলেটি তার দেহের সঙ্গে বাধা ছিলো। লোকটি সোনার ওজন বহন করে সাঁতার কাটতে না পেরে ডুবে গিয়েছিলো।

মীর কারাকুশ ছিলেন আক্রার শাসনকর্তা। প্রধান সেনাপতি আলী ইবনে আহমাদ আল-মাশতুব। তারা বারংবার সুলতান আইউবীকে পয়গাম প্রেরণ করতে থাকেন, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করবো না। আপনারা বাইরে থেকে খৃস্টানদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখুন এবং যে কোনো প্রকারে হোক নগরীতে ফৌজ, অস্ত্র ও রসদ পৌঁছাতে থাকুন।

কিন্তু সুলতান আইউবী নগরীতে সাহায্য পৌঁছাবেন কীভাবে? জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। লাগাতার রাত জাগা, মানসিক অস্থিরতা আর চারদিকে পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধ এসব সুলতান আইউবীর শারীরিক অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছে। তিন-চারদিন পর্যন্ত তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আক্রা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

পায়রাটি

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁবুতে অসুস্থ পড়ে আছেন। তাঁর থেকে সামান্য দূরে আক্রার বাইরে তাঁর জানবাজরা আক্রা অবরোধকারী খৃস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তীনের ইতিহাসে সবচে' বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। কিন্তু অবরোধ ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

নগরীর ভেতরে সুলতান আইউবীর সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার। আর বাইরে নগরী অবরোধকারী খৃস্টানরা ৫ লক্ষাধিক। সুলতান আইউবী নগরীর বাইরে খৃস্টানদের পেছনে। তাঁর কাছে আছে দশ হাজার মামলুক, যাদের উপর তার অনেক ভরসা ছিলো। তারা পেছন থেকে খৃস্টানদের উপর অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো সাফল্য আসছে না। শত্রুর সংখ্যা বেশি হওয়ার পাশাপাশি অবরোধ না ভাঙার আরেকটি কারণ হচ্ছে, খৃস্টানরা আক্রার চতুর্দিকে স্থানে স্থানে গর্ত খনন করে রেখেছে। এই গর্তগুলো সুলতান আইউবীর বাহিনীর জন্য বিপজ্জনক রূপে দেখা দিয়েছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা আক্রমণ করতে এলে ঘোড়া গর্তে পড়ে যাচ্ছে।

আক্রার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। লাশের কোনো সংখ্যা নেই। আক্রার প্রাচীরের বাইরে নগরীর প্রাচীরসম দীর্ঘ ও চওড়া পরিখা ছিলো, যেটি পার হওয়া দুষ্কর ছিলো। খৃস্টানরা তাদের মৃত সৈন্য ও ঘোড়া দ্বারা সেই পরিখা ভরাট করে চলেছে। যুদ্ধের ডামাডোল এতো বেশি যে, আকাশে শকুন ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী উড়ছে না। শুকনরা নীচে নামছে এবং পেট পুরে লাশ খেয়ে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

শকুন ছাড়া আছে আর একটি পাখি– একটি কবুতর। কবুতরটি প্রায় প্রতিদিন আক্রা থেকে উড়ে এসে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে অবতরণ করছে এবং বহুক্ষণ পর ক্যাম্প থেকে উড়ে আবার আক্রা ফিরে যাচ্ছে। অবরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে এই কবুতর একদিন আক্রা থেকে উড়াল দেয়। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড তাঁবুর বাইরে দণ্ডায়মান। সঙ্গে তাঁর বোন জুয়ানাও আছে।

'এই পায়রাটার উপর দৃষ্টি রাখবে'– রিচার্ড আদেশ করেন– 'দেখামাত্র তার উপর বাজ ছেড়ে দেবে। এই একটি পায়রাই আমাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে।'

বোন জুয়ানা এবং তার হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়া রিচার্ডের নিকট দণ্ডায়মান। এই অল্প ক'দিন আগেও জুয়ানা সিসিলির সম্রাটের স্ত্রী ছিলো। সম্রাট মারা গেলে জুয়ানা ভর যৌবনেই বিধবা হয়ে যায়। ফিলিস্তীন জয় করে সঙ্গের ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য রিচার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জুয়ানা এতো রূপসী যে, কেউ বলবে না মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় পথে সিসিলি থেকে রিচার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

রিচার্ড জুয়ানার হাসি শুনতে পান। বোনের দিকে ফিরে তাকালে সে জিজ্ঞেস করে– ভাইজান! এই পায়রাটি মরে গেলে কি সালাহুদ্দীন আইউবীও মরে যাবেন?'

'এই পায়রাটি পিয়ন জুয়ানা!'– রিচার্ড বললেন– 'পায়ের সঙ্গে বার্তা বেঁধে ও সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট আক্রাবাসীদের চিঠি নিয়ে যায়। আইউবী এরই মাধ্যমে সেই চিঠির উত্তর আক্রায় পৌঁছিয়ে দেন। আইউবী বাইরে থেকে আমাদের উপর যে আক্রমণ চালাচ্ছেন, আক্রাবাসীদের বার্তা মোতাবেকই করে থাকেন। আক্রাবাসীদের জোশ-চেতনা এবং অস্ত্র ত্যাগ না করার প্রত্যয় এই পায়রাটির কারণেই অটুট রয়েছে জুয়ানা। অন্যথায় কোনো অবরুদ্ধ বাহিনী এতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এমন তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। তুমি তো দেখেছো, আমরা মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়ে কয়েক স্থান থেকে প্রাচীরের উপরের অংশ ফেলে দিয়েছি এবং আমাদের নিক্ষিপ্ত গোলা নগরীতে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে। তারপরও তারা অস্ত্র ত্যাগ করছে না।'

'আপনার আসল উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য তো জেরুজালেম, যার থেকে আপনি এখনো অনেক দূরে'– জুয়ানা বললো– 'আক্রা জয় করতে যদি কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে জীবনেও জেরুজালেম পৌঁছতে পারবেন কি? আমাদের গোয়েন্দা ও মুসলিম যুদ্ধবন্দিরা বলছে, নগরীর ভেতরে মাত্র দশ হাজার সৈন্য আছে। আমাদের সংখ্যা প্রথমে ৬ লাখ ছিলো। এখন ৫ লাখ। অবরোধ ১১৮৯ সালের আগস্টে শুরু হয়েছিলো। এখন ১১৯১ সালের আগস্ট চলছে। দুই বছর ভাইজান! এখনো আপনি দশ হাজার অবরুদ্ধ সৈন্যকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি। আমি জানি, আপনি এই অবরোধ অভিযানে এসে যোগ দিয়েছেন মাস কয়েক হলো। কয়েক মাস সময়ও কম

নয় ভাইজান। কিন্তু এই কয়েক মাসে আক্রা নগরীর সামান্য প্রাচীর ভাঙা আর মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর কিছু অংশে আগুন লাগানো ব্যতিরেকে আপনি কোনো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন কি? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না।'

রিচার্ড তার হবু ভগ্নিপতিকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। সে চলে যায়। রিচার্ড বোনকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করেন–

'বড় ক্রুশ এবং জেরুজালেমের মর্যাদা ও পবিত্রতার দাবি হচ্ছে, তুমি ভুলে যাও, তুমি আমার বোন। তুমি সেই ক্রুশের কন্যা, যেটি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে এবং যে জেরুজালেম আমাদের নবীর উপাসনালয় ছিলো, সেটিও এখন মুসলমানদের দখলে। তুমি জানো, আমাদেরকে ইসলামের বিনাশ সাধন করতে হবে। আর তুমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছো, মুসলমানরা আত্মহত্যার ন্যায় যুদ্ধ করছে। এরা মৃত্যুর পরোয়া করে না। এরা বিজয় অর্জন করার লক্ষ্যে লড়াই করে। আমি এই প্রথমবার তাদের যুদ্ধ দেখলাম। এখানে আমি এই প্রথম এসেছি। মুসলমানদের উন্মাদনার যে কাহিনী কানে শুনেছিলাম, এখন তা চোখে দেখলাম। আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছিলো, মুসলমানদেরকে ঘায়েল করার উত্তম পন্থা নারী। একজন নারী নাকি একজন ক্ষমতাধর ও যুদ্ধবাজ মুসলমানকে কুপোকাত করে ফেলতে পারে। তাদের মাঝে যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেটি আমাদের সম্রাটগণ তাদেরকে ক্ষমতার মোহ, সোনা-মাণিক্য এবং মদ ও নারীর নেশায় আচ্ছন্ন করে সংঘটিত করিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী লোকটা এমন পাথর যে, তাকে কোনো কিছুতেই গলানো সম্ভব হয়নি। তার যে ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছিলো, তরবারীর জোরে তিনি তাদেরকে নিজের অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন কিংবা তাদের অন্তরে ইসলামী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন।'

'হ্যাঁ, এসব আমিও শুনেছি'– জুয়ানা বললো– 'মুসলিম আমীর ও শাসকদের নিকট গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার জন্য আমাদের যে মেয়েদের প্রেরণ করা হতো, তাদের আত্মত্যাগের কাহিনীও শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে, এ পদ্ধতিটা সফল হয়নি।'

'ব্যর্থও যায়নি'– রিচার্ড বললেন– 'মুসলমানদের জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করার জন্য যদি এই মেয়েগুলোকে ব্যবহার না করা হতো, তাহলে তারা বহু আগে শুধু জেরুজালেমই নয়– অর্ধেক ইউরোপ দখল করে নিতো। আমরা নারীর দেহের রূপ-যাদু প্রয়োগ করে এবং তাদের কতিপয় উজির-সালারকে

সুলতান বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের ঐক্য ভেঙে দিয়েছিলাম। তাদেরকে আপসে যুদ্ধ করিয়ে করিয়ে তাদের সামরিক শক্তি খর্ব করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।'

'আপনি এসব কথা আমাকে কেনো শোনাচ্ছেন?' জুয়ানা বললো- 'আপনার বর্ণনা ভঙ্গিতে হতাশা কেনো? আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?'

'আমি তোমাকে বলেছি, তুমি ভুলে যাও তুমি আমার বোন'- রিচার্ড বললেন- 'তুমি ক্রুশের কন্যা। ক্রুশের বিজয়ের জন্য তুমি বহু কিছু করতে পারো। তুমি দেখতে পাচ্ছো, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করছি আবার পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎও হচ্ছে। আমরা এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট দূত প্রেরণ করছি। সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমি তাকে আমার কতিপয় শর্ত মান্য করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছি; কিন্তু সে মানছে না। তাকে বলেছি, তোমরা জেরুজালেম ও বড় ক্রুশটা আমাদের দিয়ে দাও আর তোমরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও। সালাহুদ্দীন আইউবীও আমার দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'আপনি নিজে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন না কেন?'

'তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হচ্ছেন না'- রিচার্ড উত্তর দেন- 'তাছাড়া তিনি অসুস্থ। মনে হচ্ছে তার ভাই আল-আদিল তারই ন্যায় পরিপক্ব মুসলমান ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। সে সালাহুদ্দীন আইউবীর স্থান দখল করছে। আমি তার মাঝে একটি দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছি। লোকটি যুবক এবং প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছে। আমি লোকটার হৃদয় জয় করার চিন্তা করছি। আমি তাকে বন্ধু বানাতে সক্ষম হবো। কিন্তু তোমার কাজ আমি কীভাবে করবো বলো। তোমার কি লোকটাকে পছন্দ হয়?'

'তাঁর মানে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা দীর্ঘদিন যাবত যে কাজটা করে আসছে, আপনি আমার দ্বারা সেই কাজ নিতে চাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ'- রিচার্ড বললেন- 'তার হৃদয়টা জয় করে নাও। পাগলকরা ভালোবাসা প্রকাশ করো। তুমি তাকে বিয়ে করার আগ্রহ ব্যক্ত করো। আমি মধ্যখানে এসে সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবো, যদি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনার ভাই আর আমার বোনকে দিয়ে দেন, তাহলে আমি আল-আদিলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়েতে প্রস্তুত আছি। তুমি আল-আদিলকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত করবে। তাকে প্রলোভন দাও, এই সুবিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের তুমি সুলতান হয়ে যাবে। আমি আশাবাদী, তুমি

তাকে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষ বানাতে সক্ষম হবে।'

জুয়ানা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। রিচার্ড উত্তরের অপেক্ষায় তার প্রতি তাকিয়ে আছে। অবশেষে জুয়ানা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো– 'আমি চেষ্টা করবো।'

'মুসলমানদেরকে এই প্রক্রিয়ায় পরাজিত করা যেতে পারে'– রিচার্ড বললেন– 'আমি যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত আমি বেঁচে থাকবো না। তাছাড়া আমাকে ইংল্যান্ডও ফিরে যেতে হবে। ওখানকার পরিস্থিতি ভালো নয়। বিরোধীরা আমার অনুপস্থিতিতে সুযোগ নিচ্ছে।'

রিচার্ডের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসা পায়রাটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর তাঁবুর সম্মুখে পাতা মাচানটার উপর এসে বসে। দারোয়ান ছুটে এসে তার পা থেকে বাঁধা বার্তাটি খুলে তাঁবুতে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবী শরীরে বেশ দুর্বলতা অনুভব করছেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। তথাপি তিনি উঠে বসে বার্তাটি পড়তে শুরু করেন। বার্তাটি আক্রার শাসনকর্তা মীর কারাকুশ এবং সেনাপতি আল-মাশতুব প্রেরণ করেছেন। পত্রে তারা নতুন কোনো সংবাদ দেননি। অবস্থা শোচনীয়, নগরী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত নই ইত্যাদি। তারা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, আপনি এই আশঙ্কা রাখবেন না, জীবন থাকতে আমরা অস্ত্র সমর্পণ করবো। কিন্তু খৃস্টানদের উপর বাইরে থেকে আরো জোরদার আক্রণ করে আমাদের সাহায্য করা আপনার পক্ষে অধিক জরুরি হয়ে পড়েছে। সৈনিকদেরকে বলুন, নগরবাসীরা যেরূপ জযবার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তোমরাও তেমনি জযবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাও। অর্ধেক নগরীর পুড়ে গেছে। সৈন্যও অর্ধেক কমে গেছে। কিন্তু জনসাধারণের জোশ-জযবা এতো প্রবল যে, তারা পানাহার ছেড়ে সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। মহিলারও আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। তারা নিজেরা কম খেয়ে সৈন্যদের খাওয়াচ্ছে।

তারা প্রাচীরের বিবরণ এভাবে প্রদান করে যে, খৃস্টানদের মিনজানিকের অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে কয়েক স্থান থেকে প্রাচীর ভেঙে গেছে। উপরের অংশ শেষ হয়ে গেছে। শত্রুরা তাদের নিহত সৈনিক ও মৃত ঘোড়ার লাশ দ্বারা বাইরের পরিখা ভরাট করে দেয়ালের নিকটে আসার চেষ্টা করছে। আপনি যখন দফের শব্দ শুনতে পাবেন, তখন পেছন থেকে খৃষ্টানদের উপর অত্যন্ত তীব্র আক্রমণ চালাবেন। খৃস্টানরা যখন প্রাচীরের উপর আক্রমণ

চালাবে, আমরা তখন দফ বাজাবো। আপনি এমন জানবাজ প্রস্তুত করুন, যারা সমুদ্র পথে আমাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছিয়ে দেবে।

সুলতান আইউবী জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ান। তিনি পত্রের উত্তর লেখান। তাতে তিনি আক্রাবাসীদের প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সাহস প্রদান করেন। লিখেছেন, জানবাজরা আগেই নগরীতে অস্ত্র পৌঁছানোর জন্য চলে গেছে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। ইসলামের বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে। খৃস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পরিবর্তে আক্রা আসুক এটা আমারই প্রচেষ্টা ছিলো, যাতে আমি এখানেই আটকে রেখে তাদের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিতে পারি। তোমরা আক্রার প্রতিরক্ষার জন্য নয়– মসজিদে আকসার সুরক্ষার জন্য লড়াই করছো।

পত্রখানা পায়ে বেঁধে কবুতরটিকে রওনা করিয়ে সুলতান আইউবী তাঁর সালারদের তলব করেন। বললেন, প্রতিজন কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিকের নিকট গিয়ে কথা বলার সময় ও সুযোগ আমার নেই। শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাকে আমি এই জিহাদে ব্যয় করতে চাই। আমার কমান্ডার ও সৈনিকদের বলো, তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের জন্য যুদ্ধ করো। এখন আর চিন্তা করো না, তোমরা তোমাদের সুলতানের নির্দেশে যুদ্ধ করছো। এ-ও ভেবো না, তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিনিময় দান করবেন।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান আইউবী অতীতে কখনো এমন আবেগপ্রবণ হননি। মা কোলের শিশুটিকে হারিয়ে ফেললে যেমন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, সুলতান আইউবীও সেদিন তেমনি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি ঘুমাতেন না। বিশ্রাম করতেন না। আমি তাঁকে বহুবার বলেছি, সুলতান! স্বাস্থ্যটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখুন। এভাবে শরীরটা একেবারে শেষ করে ফেলছেন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে। সুলতানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এসেছিলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'বাহাউদ্দীন! আমি খৃস্টানদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস দেবো না। সেই পবিত্র ভূ-খণ্ডটির অবমাননা আমি হতে দেবো না, যেখান থেকে আমার প্রিয় রাসূল আল্লাহর দরবারে মিরাজে গমন করেছিলেন। যেখানে আমার রাসূল সিজদা করেছিলেন।' হঠাৎ তিনি গর্জে ওঠে বললেন, 'না বাহাউদ্দীন! না। আমি মৃত্যুবরণ করেও ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দেবো না।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, এক রাতে সুলতান আইউবী এতো

অস্থির ছিলেন যে, আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকি। তাঁর ঘুম আসছিলো না। আমি তাঁকে কুরআনের দু'টি আয়াত স্মরণ করিয়ে বললাম, আয়াতগুলো পড়তে থাকুন। তিনি চক্ষু বন্ধ করে নেন এবং তার ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে। আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে ওঠেন– 'ইয়াকুবের কোনো খবর আসেনি? সে নগরীতে ঢুবে যাবে।' বলে আবারো ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, সুলতান ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন।

সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে আক্রার প্রাচীরটাকে এমন দেখা যেতো, যেনো পিঁপড়েরা কোনো বস্তুর উপর দলা বেঁধে আছে। রাতে আক্রার প্রাচীরের উপর প্রদীপ হাঁটা-চলা করতো। অন্ধকারে প্রাচীরের উপর দিয়ে আগুনের গোলা ভেতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হতো। প্রাচীর টপকে ভেতর থেকে বাইরেও তেমনি গোলা আসতো। সুলতান আইউবীর কমান্ডো সেনারা প্রতি রাতে দুশমনের উপর গেরিলা হামলা চালাতো।

ঘুমের ঘোরে সুলতান আইউবী যে ইয়াকুবের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি হলেন তার নৌ-বাহিনীর একজন অতিশয় দুঃসাহসী কাপ্তান। আক্রা নগরীতে রসদ ও অস্ত্র পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। নগরীর যেদিকটায় নদী, সেদিকে খৃস্টানদের নৌ-বহর ছড়িয়ে ছিলো। অথচ নগরবাসীদের জন্য সরঞ্জাম পৌঁছানো খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিলো। সুলতান আইউবী ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য নৌ-বাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবক তলব করেন। দুঃসাহসী কাপ্তান ইয়াকুব সুলতানের ডাকে সাড়া দেন। তৎকালের কাহিনীকার কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এবং আরো দু'জন ঐতিহাসিক ইয়াকুবের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি হালবের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াকুব নৌ ও স্থল বাহিনী থেকে ৬৫০ জন সৈন্য বেছে নেন। তাদেরকে তিনি নিজ জাহাজে তুলে বৈরুত চলে যান। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্র বোঝাই করে আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেই অস্ত্র ও রসদের পরিমাণ এতো বেশি ছিলো যে, হাতে পেলে আক্রাবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত যুদ্ধ করতে সক্ষম হতো।

ইয়াকুব তার সৈনিকদেরকে বলে রাখেন, প্রয়োজনে জীবন কুরবান করে দিতে হবে। যে কোনো মূল্যে হোক জাহাজ আক্রা পৌঁছাতে হবে। কিন্তু জাহাজটি আক্রার সামান্য দূরে থাকতেই খৃস্টানদের চল্লিশটি জাহাজ তাকে ঘিরে ফেলে। ইয়াকুবের জানবাজরা প্রাণপণ মোকাবেলা করে। জাহাজ চলতে

থাকে এবং ইয়াকুব জাহাজটিকে আক্রার কুলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এক ফরাসী ঐতিহাসিক দ্য উইনসোফ লিখেছেন, তারা জিন ও প্রেতাত্মার ন্যায় লড়াই করে। তবু দুশমনের ঘেরাও থেকে বেরুতে সক্ষম হয়নি। অর্ধেকেরও বেশি মুসলিম সৈন্য খৃস্টানদের তীর খেয়ে মারা যায়।

ইয়াকুব যখন দেখলেন, পাল ছিঁড়ে গিয়ে জাহাজ আপন গতিতে মাঝের দিকে এবং দুমশনের কব্জায় চলে যাচ্ছে, তখন তিনি তার জানবাজদের চীৎকার করে বললেন– 'আল্লাহর কসম! আমরা মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবো। দুশমনকে না জাহাজ দখল করতে দেবো, না তার থেকে কোনো বস্তু ছিনিয়ে নিতে দেবো। জাহাজে ছিদ্র করে দাও। সমুদ্রকে জাহাজের ভেতর ঢুকে যেতে দাও।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, ইয়াকুবের যে ক'জন জানবাজ তখনো জীবিত ছিলো, তারা ডেকে গিয়ে জাহাজের তলদেশ ফুটো করতে শুরু করে। ছিদ্র হয়ে গেলে সাগরটা জাহাজে ঢুকতে শুরু করে। একজন জানবাজও জাহাজ থেকে লাফিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেনি। সকলে জাহাজসহ সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে যায়। এটি ১১৯১ সালের ৮ জুনের ঘটনা।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবী তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ঘোড়া সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতো। তিনি উচ্চশব্দে আদেশ করেন– 'দফ বাজাও।' দফ বেজে ওঠে। এটা আক্রমণের সংকেত। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর বাহিনী আক্রমণের জন্য সমবেত হয়ে যায়। সুলতান আইউবী বললেন– 'আজ দুশমনকে ভেদ করে প্রাচীরের নিকট পৌঁছে যেতে হবে।' তিনি ঘোড়া হাঁকান। তাঁর সবক'টি ইউনিট, আরোহী ও পদাতিক বাহিনী তাঁর পেছনে পেছনে রওনা দেয়। বাহ্যত এটি ছিলো এলোপাতাড়ি আক্রমণ। কিন্তু সুলতান আইউবী বাহিনীকে আগেই বিন্যস্ত করে রেখেছেন। খৃস্টানরা মুসলমানদের এরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসতে দেখে তাদের পদাতিক বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়। তারা তীর বর্ষণ করতে শুরু করে দেয়।

আক্রমণের নেতৃত্ব সুলতান আইউবী স্বয়ং দিচ্ছিলেন। তাঁর মামলুকরা বিদ্যুতের ন্যায় ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রুসেডারদের সৈন্য ছিলো অনেক বেশি। মুসলমানরা এমনভাবে যুদ্ধ করে, যেনো তাদের জীবিত পেছনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। অশ্বারোহীরা ঘোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে আর আক্রমণ করছে। এই যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয়, ততোক্ষণে সাঁঝের

আধার নেমে এসেছে। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো বিপুল– সংখ্যাতীত। কিন্তু সুলতান আইউবী যে উদ্দেশ্যে আক্রমণটা করেছিলেন, তা সাধিত হয়নি।

এরূপ হামলা এটিই প্রথম ও শেষ আক্রমণ ছিলো না। আক্রা দু'টি বছর অবরুদ্ধ থাকে। এই সময় সুলতান আইউবী পেছন থেকে এরূপ কয়েকটি আক্রমণ করিয়েছেন। প্রতিটি আক্রমণেই তাঁর জানবাজরা বীরত্বের এমন সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, যেমনটি অতীতে তারাও দেখাতে পারেনি। এই সময়ে সুলতান আইউবী মিসর থেকেও সাহায্য পেয়ে যান এবং কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র তাকে সৈন্য ও সরঞ্জাম প্রেরণ করে। পুরো কাহিনী লিখতে গেলে শেষ হবে না। শুধু জিহাদের স্পৃহা নয়– সে ছিলো উন্মাদনা। সেসব আক্রমণে আক্রার অবরোধ ভাঙা যায়নি বটে; কিন্তু ক্রুসেডারদের হৃদয়ে ভয় ধরে যায় যে, মুসলমানরা এখান থেকে তাদেরকে জীবিত বেরিয়ে যেতে দেবে না। খৃষ্টানদের সৈন্য বেশি ছিলো বিধায় তাদের প্রাণহানিও ঘটেছে বিপুল। এই সুবিপুল লাশ আর আহতদের দেখে খৃস্টানদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছিলো। মুসলমানদের অভাবিতপূর্ব এই বীরত্বে স্বয়ং রিচার্ডও প্রভাবিত হতে শুরু করেছেন।

এ সময়ে রিচার্ড সুলতান আইউবীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত প্রেরণ করতে থাকেন। দূত আল-আদিলের নিকট যেতো আর আল-আদিল প্রস্তাবটা সুলতানের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন। তার দাবি ছিলো, আমাদের জেরুজালেম আমাদেরকে দিয়ে দাও, আমাদের ক্রুশটা ফিরিয়ে দাও এবং হিত্তীন যুদ্ধের আগে যেসব অঞ্চল আমাদের দখলে ছিলো, সেগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও। সুলতান আইউবী 'জেরুজালেম' নাম শুনে আঁৎকে ওঠতেন। তথাপি তিনি আল-আদিলকে রিচার্ডের সঙ্গে সন্ধি বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, রিচার্ড ও আল-আদিল যখন রিচার্ডের নিকট যেতেন কিংবা রিচার্ড আল-আদিলের নিকট আসতেন, তখন রিচার্ডের বোন জুয়ানাও সঙ্গে থাকতো। এই বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আল-আদিল রিচার্ডের শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সাক্ষাৎ-যোগাযোগের এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। রক্তক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং আক্রাবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠেছিলো। অবরোধকারীদের মধ্যে অন্যান্য খৃস্টান সম্রাটও ছিলেন। তন্মধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড সকলের নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন।

❖ ❖ ❖

'আমি এতোটুকু সফলতা অর্জন করেছি যে, তিনি আমার ভালোবাসা বরণ করে নিয়েছেন'– জুয়ানা ভাই রিচার্ডকে বললেন– 'কিন্তু সকল মুসলমান আমীর-শাসকদের মাঝে যে দুর্বলতাটি পাওনা যায় বলে আপনি জানিয়েছেন, সেটি তার মধ্যে পাইনি। তিনি আমাকে বিবাহ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বটে; কিন্তু তার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করার পরিবর্তে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলছেন।'

'মনে হচ্ছে, এ বিদ্যায় পারদর্শী মেয়েরা যেভাবে যাদু প্রয়োগ করে, তুমি তেমনটি প্রয়োগ করতে সক্ষম হওনি'– ভাই রিচার্ড বললেন– 'আল-আদিল চরিত্রে পরিপক্ব সে আমিও দেখেছি। ইতিমধ্যে আমি তাকে বলে ফেলেছি; সে (তুমি) যদি আপনাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়, তাহলে আপনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নিন, আর ভাইকে বলুন যেনো তিনি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনাকে দিয়ে দেন, যেখানে আপনারা স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে রাজত্ব করবেন। তিনি উত্তর দিয়েছেন, ধর্মই যদি পরিবর্তন করলাম, তাহলে এতো খুন-খারাবির আবশ্যক কী ছিলো? আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমার বোনকে পছন্দ করেন? তিনি উত্তর দেন, সে আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে আমি ততোটুকু কামনা করি, যতোটুকু সে আমাকে কামনা করে। আমি তাকে বললাম, আপনাদের এই প্রেম-ভালোবাসায় আমার কোনো আপত্তি নেই।... শিকার জালে এসে পড়েছে। এখন ধরে বোতলে ভরার দায়িত্ব তোমার।'

'আচ্ছা!'– জুয়ানার হঠাৎ মনে পড়ে যায়– 'আমার সেবিকা দুটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রাতে এখানেই ছিলো। সকাল থেকে উধাও!'

'আমার মনে হচ্ছে, ওরা উধাও-ই থাকবে'– রিচার্ড বললেন– 'ওরা মুসলমান ছিলো।

'ওরা সিসিলির মুসলমান ছিলো'– জুয়ানা বললো– 'আমার বিয়ের সময় থেকে ওরা আমার সঙ্গে ছিলো।'

'মুসলমান যেখানকারই বাসিন্দা হোক, সকলের চেতনা একরকমই হয়ে থাকে।'– রিচার্ড বললেন– 'সে কারণেই আমরা এ জাতিটাকে বিপজ্জনক মনে করি এবং ঐক্য বিনষ্ট করে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওরা এখানে এসে দেখলো, আমরা তাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, অমনি তাদের কাছে চলে গেলো।'

রিচার্ড ঠিকই বলেছিলেন। ততোক্ষণে তারা সুলতান আইউবীর নিকট

পৌঁছে গেছে। তারা সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললো, এমন কিছু কথা আছে, যা সুলতানকেই বলতে হবে। তারা সুলতান আইউবীকে জানায়, আমরা সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছি। শৈশব থেকেই চাকরানি হয়ে রাজমহলে সময় অতিবাহিত করেছি। সম্রাট রিচার্ডের বোন জুয়ানা রাজার স্ত্রী হওয়ার পর বয়স, রূপ-সৌন্দর্য ও দৈহিক আকার-গঠনের সুবাদে আমাদেরকে তার খাস চাকরানি নিযুক্ত করা হয়। সিসিলিতে মুসলমান ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে জন্য সেখানে ইসলাম জিন্দা ছিলো। আমরাও ধর্মের কথা ভুলিনি। জুয়ানা বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সম্রাট রিচার্ড ক্ষমতার মসনদে আসীন হন। এখানে আসবার সময় তিনি বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। এখানে এসে আমরা খৃস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখে চাকরি থেকে আমাদের মন ওঠে গেছে।

মেয়ে দুটো দৈহিকভাবে মানানসই হওয়ার পাশাপাশি যেমন চালাক, তেমনি সতর্ক। তারা সুলতান আইউবীকে জানালো, জুয়ানা রিচার্ডকে বলছিলো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাই আল-আদিলকে ফাঁসিয়ে ফেলেছি। আল-আদিল যদি ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যান, তাহলে তাদের বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা ও জেরুজালেম দখল করা সহজ হয়ে যাবে। মেয়ে দুটো এই সন্দেহও ব্যক্ত করে যে, জুয়ানা ও আল-আদিল গোপনে কোথাও মিলিত হয়ে থাকেন। তথ্যটা সুলতান আইউবীকে জানানোর জন্যই তারা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এই মেয়ে দুটোর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন, সুলতান আইউবী তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মেয়ে দুটোর রিপোর্টে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন বটে; কিন্তু তাঁরই সহোদর তাকে ধোঁকা দিচ্ছে, এ তথ্য তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। প্রতিজন সালারের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিলো। কিন্তু ভাই আল-আদিল ও দু'পুত্র আল-আফজাল ও আয-যাহিরের উপস্থিতিতে তিনি বহু পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকতেন। খৃস্টানদের উপর যখন পেছন থেকে আক্রমণ হতো, তার নেতৃত্ব হয় তিনি নিজে দিতেন কিংবা এই তিনজন। তাছাড়া খৃস্টান সম্রাট বিশেষত রিচার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব আল-

আদিলের উপর ন্যস্ত ছিলো। সুলতান এ বিষয়ে আল-আদিলের সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক মনে করলেন। কিন্তু আক্রার যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিলো। মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য আসছিলো। আল-আদিলকে কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। তাঁর সম্পর্কে সুলতান আইউবী শুধু এটুকু সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, আজ তিনি অমুক স্থানে আক্রমণ করেছেন, আজ অমুক স্থানে। সুলতান তাঁর পুত্রদেরও দেখা পাচ্ছেন না। তিনি এখন স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন।

অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে আক্রান্ত প্রাচীর একস্থান থেকে ভেঙে যায়। খৃস্টানরা সে পথে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো, জায়গাটা উভয় পক্ষের লাশে ভরে যাচ্ছে। অবশেষে কবুতর ভেতর থেকে পয়গাম নিয়ে আসে– 'কাল নাগাদ যদি আমাদের কাছে সাহায্য এসে না পৌঁছায় কিংবা আপনি যদি বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙার চেষ্টা না করেন। তাহলে আমরা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হবো। কারণ, নগরীর শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে। নগরী জ্বলছে। অল্প ক'জন সৈন্য বেঁচে আছে। যারা বেঁচে আছে, তারাও দু'বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে করে জীবন্ত লাশ হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবীর চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ সকল বাহিনীকে একত্রিত করে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালান। এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যে, ইতিহাসের পাতা কেঁপে উঠতে শুরু করে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মানব-মস্তিষ্ক এরূপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কল্পনাও করতে অক্ষম। মুসলমানরা রাতেও খৃস্টানদেরকে স্থির থাকতে দেয়নি। মধ্যরাতের পর সুলতান আইউবী তাঁবুতে ফিরে এসে এমনভাবে পালংকের উপর পড়ে যান, যেনো তাঁর দেহটা জখমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আদেশ দেন, সকালেও এরূপ আক্রমণ হবে। কিন্তু ভোরের আলো তাঁকে যে দৃশ্য দেখালো, তাতে তাঁর মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। আক্রার প্রাচীরের উপর ক্রুসেডারদের পতাকা উড়ছে। খৃস্টান সৈন্যরা স্রোতের ন্যায় নগরীর ভেতরে অনুপ্রবেশ করছে। দিনটি ছিলো জুমাবার। ৫৮৭ হিজরীর ১৭ জমাদিউস সানি মোতাবেক ১২ জুলাই ১১৯২ খৃস্টাব্দ।

আল-মাশতুব ও কারাকুশ শর্তের ভিত্তিতে চুক্তিতে সই করেছিলেন। তথাপি সুলতান আইউবীকে দেখতে হলো, ফিরিঙ্গিরা প্রায় তিন হাজার মুসলমানকে কয়েদি বানিয়ে রশিতে বেঁধে আক্রার বাইরে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে

সামরিক লোকও আছে, বেসামরিক লোকও আছে। তাদেরকে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। চারদিক থেকে খৃস্টান বাহিনীর আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা সেই হাত-পা বাঁধা নিরস্ত্র মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খৃস্টানরা এতো পৈশাচিকতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন করবে, মুসলিম বাহিনীর সে ধারণা ছিলো না। যখন খৃস্টানরা মুসলিম বন্দিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, মুসলিম সৈন্যরা কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে খৃস্টানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু ততোক্ষণে হাত-পাবাঁধা বন্দিরা শহীদ হয়ে গেছে। উভয় বাহিনীর মধ্যে আবারো তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো।

❖ ❖ ❖

ইতিমধ্যে রিচার্ডও সুলতান আইউবীর ন্যায় গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তার উপর খৃস্টজগতের অনেক নির্ভরতা ছিলো। লোকটি সিংহ-হৃদয় ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রার অবরোধে যেখানে তিনি সফল হয়েছিলেন, সেখানে তার মনোবলও ভেঙে গিয়েছিলো। মুসলমানরা এতো প্রাণপণ লড়াই করে থাকে তার ধারণা ছিলো না। তার গন্তব্য ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আক্রা জয় করার পর রোম উপসাগরের কূল ঘেঁষে রওনা হয়েছিলেন। সম্মুখে আসকালান ও হীফা ইত্যাদি বৃহৎ নগরী ও দুর্গের অবস্থান। সুলতান আইউবী তার মতলব বুঝে ফেলেন। এই নগরী ও দুর্গগুলোকে দখল করে এখানে ক্যাম্প স্থাপন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করার মতলব এঁটেছেন।

সুলতান আইউবী বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে যতো বড় ও যতো বেশি প্রয়োজন কুরবানী দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি আদেশ প্রদান করেন– 'আসকালানকে ধ্বংস করে দাও। দুর্গ ও নগরীটা ধ্বংস্তূপে পরিণত করে দাও।' শুনে সালার ও উপদেষ্টাদের মাথায় যেনো বাজ পড়ে। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতো বিশাল নগরী! এতো শক্ত দুর্গ! সুলতান আইউবী গর্জে ওঠে বললেন– 'নগরী আবার গড়ে ওঠবে। মানুষ জন্ম নিতে থাকবে। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য বোধ হয় সালাহুদ্দীন আইউবী আর জন্মাবে না। নিজেদের সকল নগরী এবং শিশুদেরসহ সব মানুষ মসজিদে আকসার জন্য কুরবান করে দাও।'

সুলতান আইউবী বাস্তবিকই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তিনি বাস্তবতাকে লুকাবার চেষ্টা করেননি। গেরিলা ইউনিটগুলোকে খৃস্টান বাহিনীর পেছনে লেলিয়ে দেন। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসরমান রিচার্ড বাহিনীর পেছন

অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে রিচার্ডের অগ্রযাত্রা মন্থর হয়ে যায়। তাদের রসদ অনিরাপদ হয়ে পড়ে। রিচার্ড আসকালান যাচ্ছিলেন। তিনি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন, ততোক্ষণে নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানে যে মুসলিম ফৌজ ছিলো, তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রিচার্ডের পথে যে ক'টি দুর্গ জয় করার কথা ছিলো, সবগুলো আগেই ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানরা এমন ত্যাগও স্বীকার করতে পারে ভেবে রিচার্ডের মাথা খারাপ হয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি বুঝে ফেলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করা সহজ হবে না।

ফ্রান্সের সম্রাট রিচার্ডকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। এ রিচার্ডের জন্য বিরাট এক ধাক্কা। তিনি আক্রা জয় করেছেন ঠিক; কিন্তু এই সফলতার মধ্যেও মুসলমানরা তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। আক্রা হাত থেকে ছুটে যাওয়া সুলতান আইউবীর জন্য আক্ষেপের বিষয় ছিলো। কিন্তু তাঁর কৌশল সফল হয়েছে যে, তিনি ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছেন। এবার তিনি পুনরায় নিজের বিশেষ পদ্ধতির যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। সে হচ্ছে, গেরিলা ও কমান্ডো আক্রমণের ধারা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমান গেরিলারা রাতের অন্ধকারে ঝড়ের ন্যায় আসতো এবং খৃস্টান বাহিনীর পেছন অংশের উপর কমান্ডো আক্রমণ চালিয়ে বিপুল ক্ষতিসাধন করে অদৃশ্য হয়ে যেতো। ফলে খৃস্টানদের এক মাসের পথ অতিক্রম করতে তিন মাস সময় লেগে যেতো। ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রার গতি মন্থর করে দিয়ে নিজে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করে ফেলেন।

'কিছু করো জুয়ানা! ক্রুশের খাতিরে কিছু একটা করো'– রিচার্ড তার বোনকে বললেন– 'আল-আদিলকে হাত করে নাও। যুদ্ধ করে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারবো না।'

'তিনি আমাকে চাচ্ছেন'– জুয়ানা উত্তর দেয়– 'রওনার সময়ও তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। আমি বলতে পারি, তিনি আমাকে মনে-প্রাণে কামনা করছেন। কিন্তু বলছেন, আমি মুসলমান হয়ে যাই। আমার কোন শর্তই মানতে রাজি হচ্ছেন না।'

ওদিকে সুলতান আইউবী ভাই আল-আদিল, পুত্রদ্বয় এবং সালারদের সঙ্গে

কথা বলছেন। তাঁর মুখে এখন দু'টি মাত্র বুলি– ইসলাম, বাইতুল মুকাদ্দাস। তিনি সকলকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সভা শেষে আল-আদিল সুলতান আইউবীর সঙ্গে একাকীত্বে মিলিত হন এবং বললেন– 'রিচার্ড আমাকে তার বোনকে বিয়ে করতে বলছেন। শর্ত দিচ্ছেন, ইসলাম ত্যাগ করে আমাকে খৃস্টান হতে হবে।'

'তোমার ইসলামের সঙ্গে বেশি ভালোবাসা, নাকি রিচার্ডের বোনের সঙ্গে?'

'উভয়ের সঙ্গে।'

'তাহলে তাকে তোমার ধর্মে দিক্ষিত করো এবং বিয়ে করে নাও'– সুলতান আইউবী বললেন– 'আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

'আমি আপনার নিকট বিয়ের অনুমতি নিতে আসিনি'– আল-আদিল বললেন– 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি, রিচার্ডের ন্যায় একজন সাহসী এবং যুদ্ধবাজ সম্রাটও এতো নীচে নামতে পারলেন! আমি স্বীকার করছি, তার বোনটাকে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি আপন ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।'

'আর সেও নিজ ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারী করবে না।'

'জাহান্নামে যাক'– আল-আদিল বললেন– 'এই অস্ত্র দ্বারা রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারবে না।'

সুলতান আইউবীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রিচার্ডের এই হীন আচরণটাকে লুকাবার চেষ্টা করেছেন। তারা লিখেছেন, রিচার্ড খৃস্টধর্ম গ্রহণের শর্তে আল-আদিলকে তার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ডের বোন আল-আদিলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করেন। এখানে আক্রা অপেক্ষা বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার আশংকা ছিলো। তিনি পূর্বে যেসব শর্ত আরোপ করে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, এখানে এসেও সুলতান আইউবীকে সেসব শর্ত আরোপ করতে শুরু করেন। বারংবার এক কথা কারুরই ভালো লাগে না। একবার সুলতান আইউবী বিরক্ত হয়ে রিচার্ডের দূতকে অপমান করে তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

এ সময়ে সুলতান আইউবী সংবাদ পান, রিচার্ডের অসুখ হয়েছে। এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে, বাঁচবার আশা নেই। সুলতান রাতে তাঁবু থেকে বের হয়ে রিচার্ডের তাঁবু অভিমুখে রওনা হন। কোথায় যাচ্ছেন আল-আদিল ছাড়া কাউকে বলেননি। আল-আদিল বললেন, অমুক স্থানে

রিচার্ডের বোন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আপনি তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

জুয়ানা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে দৌড়ে এসে বলে ওঠে– 'তুমি এসে পড়েছো আল-আদিল?' সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নেমে জুয়ানাকে ঘোড়ায় বসিয়ে চুপি চুপি রিচার্ডের তাঁবুর দিকে রওনা দেন। জুয়ানা সুলতানকে কিছু বলছিলো। সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমার ভাষা আমার ভাই বোঝে– আমি বুঝি না।' জুয়ানা কী বললো সুলতান বুঝতে পারেননি।

সুলতান আইউবী রিচার্ডের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। রিচার্ড সত্যিই গুরুতর অসুস্থ। সুলতান আইউবীর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি দোভাষী ডাকেন। সুলতান আইউবী প্রথম কথাটা বললেন– 'বোনকে সামলাও। আমার ভাই আপন ধর্ম ত্যাগ করবে না। বলো তোমার কষ্টটা কী? আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। এমন ভেবো না, তোমাকে মুমূর্ষু দেখে গিয়ে আমি আক্রমণ করবো। সুস্থ হও, যুদ্ধ পরে করবো।'

রিচার্ড বিস্ময়াভিভূত হয়ে ওঠে বসেন এবং সম্ভবত অলক্ষ্যেই বলে ওঠেন– 'তুমি মহান সালাহুদ্দীন আইউবী! তুমিই সত্যিকার যোদ্ধা!'

রিচার্ড সুলতান আইউবীকে কষ্টের কথা জানান। সুলতান বললেন– 'আমাদের অঞ্চলে রোগাক্রান্ত মানুষকে আমাদের ডাক্তারই সুস্থ করে তুলতে পারে। ইংল্যান্ডের বাহিনী যেমন এখানে এসে অথর্ব হয়ে যায়, তেমনি তোমাদের ডাক্তারও এখানে এসে আনাড়ি হয়ে যায়। আমি ডাক্তার পাঠাবো।'

'সালাহুদ্দীন! আমরা আর কতোকাল একে অপরের রক্ত ঝরাতে থাকবো?'– রিচার্ড বললেন– 'আসো, সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলি।'

'কিন্তু তুমি বন্ধুত্বের যে মূল্য দাবি করছো, আমি তা পরিশোধ করতে পারবো না'– সুলতান আইউবী বললেন– 'তোমরা খুন-খারাবিকে ভয় করছো। আমার জাতি বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে নিজেদের প্রতি ফোঁটা রক্ত কুরবান করে দেবে।'

ফিরে এসে সুলতান আইউবী তাঁর প্রাইভেট ডাক্তারকে রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সেরে ওঠতে বহুদিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে রিচার্ডের পক্ষ থেকে সন্ধির নতুন নতুন শর্ত আসে। রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস থেক হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। শুধু এতোটুকু সুবিধা প্রার্থনা করেন যে, খৃস্টান পর্যটকদের

বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হোক এবং উপকূলীয় কিছু অঞ্চল খৃস্টানদের দিয়ে দেয়া হোক। সুলতান আইউবী রিচার্ডের এই দু'টি দাবি মেনে নেন। তাঁর বাহিনীও যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। নিজেও একদিকে যেমন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অপরদিকে অসুস্থ। তাই এ মুহূর্তে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

রিচার্ড মুসলমানদের চেতনা ও নির্ভীকতায় ভয় পেয়ে গেছেন। তার স্বাস্থ্যও হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া নিজ দেশে বিরুদ্ধবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছিলো। তাই তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়া তার আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো।

৫৮৮ হিজরীর ২২ শাবন মোতাবেক ১১৯১ খৃস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১১৯২ সালের ৯ অক্টোবর রিচার্ড বাহিনীসহ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৩ বছর। রিচার্ড রওনার আগে সুলতান আইউবীকে বার্তা পাঠান, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর আমি জেরুজালেম জয় করতে আসবো। কিন্তু তারপর কোন খৃস্টান আর বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৬৭ সালে আরবদের অনৈক্য এবং তাদের সেসব দুর্বলতা, যেগুলো সুলতান আইউবীর আমলে খৃস্টানরা মুসলিম আমীরদের মাঝে জন্ম দিয়েছিলো বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়।

রিচার্ডের রওনার পর সুলতান আইউবী ঘোষণা দেন, বাহিনীর যেসব সৈন্য হজ্বে যেতে চাও নাম লেখাও। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজ্বে পাঠানো হবে। তালিকা প্রস্তুত হয়ে যায়। আগ্রহী সকলকে হজ্বের উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। স্বয়ং সুলতান আইউবীর নিজের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা ছিলো হজ্ব করবেন। কিন্তু জিহাদ তাকে সুযোগ দেয়নি। আর যখন অবসর পেলেন, তখন তাঁর নিকট হজ্বে যাওয়ার অর্থ ছিলো না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ নিতে বলা হলো। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এই অর্থ আমার নয়। সুলতান আইউবী নিজেকে হজ্ব থেকে বঞ্চিত করলেন। রাজকোষ থেকে কোন অর্থ নিলেন না। মিসরী কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, মৃত্যুর সময় সুলতান আইউবীর সর্বমোট সম্পদ ৪৭ দেরহাম রুপা এবং এক টুকরো সোনা ছিলো। নিজস্ব কোনো বাসগৃহ ছিলো না।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী ১১৯২ সালের ৪ নবেম্বর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে

দামেশ্‌ক গিয়ে পৌঁছেন। তার চার মাস পর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এই বীর মুজাহিদ মহাকালের মহানায়ক ইহলোক ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। দামেশ্‌ক পৌঁছার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্বচক্ষে দেখা পরিস্থিতি কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'... তাঁর শিশু সন্তানরা দামেশ্‌কে ছিলো। একটানা পরিশ্রম ও সর্বশেষ অসুস্থতার পর বিশ্রামের জন্য তিনি এ নগরীকেই পছন্দ করেন। সন্তানরা তাঁকে দেখে বেশ আনন্দিত হয়েছিলো। দামেশ্‌ক ও আশপাশের মানুষ তাদের বিজয়ী সুলতানকে দেখার জন্য দলে দলে আসতে শুরু করে। স্বজাতির এই ভক্তি ও আন্তরিকতা দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরদিনই জনসভার আয়োজন করেন, যেখানে সুলতানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার এবং কারো কোনো অভিযোগ কিংবা দাবি-দাওয়া থাকলে পেশ করার অনুমতি প্রদান করেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, ধনী-গরীব, শাসক-জনতা সকলে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এসে ভিড় জমায়। কবিরা সুলতানের শানে কবিতা আবৃত্তি করেন।

'বিরামহীন যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যস্ততা সুলতান আইউবীকে না দিনে কখনো বিশ্রাম নিতে দিয়েছে, না রাতে একটু শান্তির ঘুম ঘুমাতে দিয়েছে। তিনি শারীরিকভাবেও ভেঙে পড়েছিলেন এবং মানসিকভাবেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ক্লান্ত শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য তিনি দামেশ্‌কে হরিণ শিকার করাকে ব্যস্ততা বানিয়ে নেন। তিনি ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে শিকার খেলায় মেতে ওঠেন। তার ইচ্ছা ছিলো, দিন কয়েক বিশ্রাম করে মিসর চলে যাবেন। কিন্তু দামেশ্‌কের রাষ্ট্রীয় কাজ তাঁকে আটকে রাখে।'...

'আমি সেসময় উজিরের দায়িত্ব নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলাম। একদিন দামেশ্‌ক থেকে সুলতান আইউবীর একখানা পত্র এসে পৌঁছে। তিনি আমাকে দামেশ্‌ক যেতে বলেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু লাগাতার মুষলধারা বৃষ্টির কারণে পথঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো। ঊনিশ দিন পর্যন্ত আমি বেরই হতে পারলাম না। অবশেষে ২৩ মহররম শুক্রবার রওনা হয়ে ১২ সফর মঙ্গলবার দামেশ্‌ক গিয়ে পৌঁছি। সে সময় বৈঠকখানায় আমীর ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ সুলতানের অপেক্ষা করছিলেন। সুলতানকে আমার আগমনের সংবাদ জানালো হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে তার খাস কামরায় যেতে বললেন। আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'বাহু প্রসারিত

করে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর চেহারায় এমন প্রশান্তি ও স্থিরতা আমি অতীতে কখনো দেখিনি। তার দু'চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।'...

'পরদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর খাস কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলে জিজ্ঞেস করেন, বৈঠকখানায় কারা আছে? আমি বললাম, আপনার পুত্র আল-মালিকুল আফজাল, কয়েকজন আমীর এবং আরো অনেক লোক। তারা আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি জামালুদ্দীন ইকবালকে বললেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ওজরখাহি করে বলে দাও, আজ আমি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে পারবো না। তিনি আমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলেন। আমি চলে যাই।'...

'পরদিন তিনি অতি প্রত্যূষে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি বাগানে সন্তানদের নিয়ে খেলা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, বৈঠকখানায় কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী আছে কি? তাকে জানানো হলো, ফিরিঙ্গিদের দূত এসে বসে আছে। সুলতান বললেন, তাদেরকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। সন্তানরা সেখান থেকে চলে যায়। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আমীর আবু বকর– সুলতান যাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন– সেখানে থেকে যায়। ফিরিঙ্গিরা এলে শিশুটি লোকগুলোর দাড়িবিহীন চেহারা এবং তাদের পোশাক দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করে। শিশুটি এর আগে কখনো দাড়িবিহীন পুরুষ দেখেনি। সুলতান আইউবী বললেন, আমার পুত্র আপনাদের দাড়িবিহীন চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্যার মোকাবেলায় সুলতান শিশুটিকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়ার পরিবর্তে দূতদের বললেন, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। তিনি তাদেরকে আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকেই বিদায় করে দেন।'...

'তাদের চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, খাবার যা আছে নিয়ে আসো। তাঁর সম্মুখে হাল্কা কিছু খাবার এনে হাজির করা হলো। তাতে ক্ষিরও ছিলো। তিনি সামান্যই খেলেন। আমি অনুভব করলাম, যেনো তাঁর ক্ষুধা মরে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমিও খেলাম। তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কথাবার্তা কম করছি। ক্ষুধামান্দ্য এবং দুর্বলতা অনুভব করছি।'...

'আহারের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– হাজীরা ফিরে এসেছে কি? আমি বললাম, রাস্তায় অনেক কাদা। চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। আশা করি, কাল নাগাদ এসে পৌঁছবে। সুলতান বললেন, আমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে যাবো। বলেই তিনি একজন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন, হাজীরা

আসছে। রাস্তায় কাদা ও পানি আছে। এখনই লোক পাঠাও, পথের কাদা-পানি পরিষ্কার করাও। আমি তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে চলে আসি। আমি দেখলাম, সুলতানের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতায় বেশ ভাটা পড়ে গেছে।'...

'পরদিন ঘোড়ায় আরোহণ করে তিনি হাজীদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। আমিও ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছু নেই। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল সঙ্গ নেয়। মানুষের মাঝে দাবানলের ন্যায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সুলতান বাইরে এসেছেন। জনতা কাজ-কর্ম ত্যাগ করে ছুটে আসে। তারা তাদের বিজয়ী সুলতানকে কাছে থেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। সুলতান তাঁর এই পাগলপারা ভক্তদের মাঝে হারিয়ে যান। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আমাকে বললো, সুলতান তো বর্ম পরিধান করে বের হননি! আমার ভয় লাগছে। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতোক্ষণ! সে সময় সুলতানের সঙ্গে দেহরক্ষী ছিলো না। আমি ভিড় ঠেলে সুলতানের নিকট গিয়ে বললাম, হযরত! আপনি বিশেষ পোশাক পরে বের হননি। শুনে তিনি এমনভাবে চমকে ওঠেন, যেনো তাঁকে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি বললেন, পোশাকটা এখানেই নিয়ে আসো। কিন্তু পোশাক এনে দেয়ার মতো সেখানে কেউ ছিলো না। আমার বেশ ভয় লাগছিলো।'...

'আমার মনে হতে লাগলো, যেনো কোনো অঘটন ঘটে যাবে। আমি তাকে বললাম, আমি এখানকার পথঘাট চিনি না। অন্য কোনো রাস্তা আছে কি, যেখানে লোকজন কম হবে এবং আপনি ফিরে যেতে পারবেন? তিনি বললেন, একটি রাস্তা আছে। তিনি ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দেন। জনতার ভিড় ছিলো গণনাতীত। সুলতান আইউবী ঘোড়াটা বাগ-বাগিচার মধ্যকার এক রাস্তায় তুলে দেন। আমি ও আল-মালিকুল আফজাল তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁর জীবনেরও আশংকা অনুভব করছিলাম এবং স্বাস্থ্যেরও। আমরা আল-মাইবানার কূপ হয়ে দুর্গে এসে প্রবেশ করি।'...

'শুক্রবার সন্ধ্যায় সুলতান আইউবী অস্বাভাবিক দুর্বলতা অনুভব করেন। মধ্যরাতের সামান্য আগে তাঁর গায়ে জ্বর আসে– চোরা জ্বর। শরীরের ভেতরে বেশি ছিলো, বাইরে কম অনুভব হচ্ছিলো। সকাল নাগাদ তিনি বেশ কাহিল হয়ে পড়েন। কিন্তু গায়ে হাত দিলে তেমন গরম অনুভব হচ্ছিলো না। আমি তাকে দেখতে গেলাম। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল শিয়রে বসা ছিলো। সুলতান বললেন, রাত অনেক কষ্টে কাটিয়েছি। তিনি এদিক-ওদিকের কথা শুরু করে দেন। আমরা গল্প-গুজবে তাঁকে সঙ্গ দেই। তাতে তার মন-মেজাজে

প্রফুল্লতা ফিরে আসে। দুপুর নাগাদ বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমরা বিদায় নিতে উদ্যত হলে তিনি বললেন, বসুন, খানা খেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে কাজী আল-ফজলও ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কারো কাছে আহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই ওজরখাহি করে চলে যান। আমি খাওয়ার রুমে চলে যাই। সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে উঠতে মন সরছিলো না। অন্তরটা তাঁর নিকট রেখেই খাওয়ার রুমে চলে যাই। দস্তরখান বিছানো হয়েছে। অনেক লোক বসে আছে। আল-মালিকুল আফজাল পিতার জায়গায় বসা। আফজাল সুলতান আইউবীর পুত্র বটে, কিন্তু সুলতানের স্থানে তাকে উপবিষ্ট দেখে বেশ কষ্ট লাগলো। অন্য যারা বসা ছিলেন, তাদেরও প্রতিক্রিয়া আমারই ন্যায় ছিলো। অনেকের চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে।'...

'সেদিনের পর থেকে সুলতান আইউবীর স্বাস্থ্য খারাপই হতে থাকে। আমি ও কাজী আল-ফজল প্রত্যহ কয়েকবার তাঁকে দেখতে যেতাম। একটু সুস্থতাবোধ করলেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। অন্য সময় চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতেন। আমরা তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর জীবনের জন্য সবচে' বড় আশংকাটা ছিলো, তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার অনুপস্থিত ছিলেন। চারজন ডাক্তার মিলে তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু রোগ দিন দিন বেড়েই চলছিলো।'...

'অসুখের চতুর্থ দিন সুলতানের অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে যায়। কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ জোড়া বেকার হয়ে যায়। দেহের ভেতরে রস শুকিয়ে যেতে শুরু করে। সুলতান আইউবী দুর্বলতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হন। ষষ্ঠ দিন আমরা তাঁকে ধরে তুলে বসাই। তাঁকে একটি ওষুধ সেবন করানো হলো, যার পর গরম পানি পান করার প্রয়োজন ছিলো। পানি আনা হলো। পানিটা হাল্কা গরম হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু গ্লাসটা মুখের সঙ্গে লাগিয়ে সুলতান বললেন, পানি অনেক গরম। তিনি পানি পান করলেন না। পানি ঠাণ্ডা করে আনা হলো। সুলতান বললেন, এবার একেবারে ঠাণ্ডা। সুলতান সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। শুধু হতাশা প্রকাশার্থে বললেন– 'ইয়া আল্লাহ! কেউ কি নেই, যে আমাকে হাল্কা গরম পানি এনে দিতে পারবে?'...

'আমার ও আল-ফজলের চোখে অশ্রু নেমে আসে। আমরা অন্য এক কক্ষে চলে আসি। কাজী আল-ফজল বললেন, জাতি কতো মহান এক ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে! তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে পানির গ্লাসটা মাথায় ছুঁড়ে মারতেন।'...

'সপ্তম ও অষ্টম দিন সুলতান আইউবীর অবস্থা এতো খারাপ হয়ে যায় যে, তাঁর জ্ঞান হারিয়ে যেতে শুরু করে। নবম দিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পানিও পান করতে পারলেন না। নগরীতে খবর ছড়িয়ে পড়ে, সুলতান আইউবীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছে। সমগ্র নগরীতে মৃত্যুর বেদনা ছেয়ে যায়। সব জায়গায় এবং সকলের মুখে তাঁর সুস্থতার জন্য দু'আ চলছে। ব্যবসায়ী ও সওদাগররা এমন ভয় পেয়ে যায় যে, তারা বাজার থেকে পণ্য তুলে নিতে শুরু করে। প্রতিজন মানুষ কিরূপ হতাশ ও অস্থির হয়ে ওঠেছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো ছিলো না।'...

'আমি ও আল-ফজল রাতের প্রথম প্রহর তাঁর কাছে থাকতাম এবং দেখাশোনা করতাম। তিনি কথা বলতে পারতেন না। অবশিষ্ট রাত আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভেতর থেকে কেউ আসলে জিজ্ঞেস করতাম, সুলতানের অবস্থা কেমন। প্রত্যুষে যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম, তখন বাইরে জনতার ভিড়। দণ্ডায়মান দেখতে পেতাম। তারা আমাদের নিকট সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করার সাহস পেতো না। আমাদের চেহারা দেখেই বুঝে নিতো, সুলতানের অবস্থা ভালো নয়। জনতা চুপচাপ আমাদের প্রতি তাকাতো আর আমরাও তাদের প্রতি এক নজর তাকিয়ে মাথানত করে বেরিয়ে যেতাম।'...

'দশম দিন ডাক্তারগণ তাকে নাড়ি পরিষ্কার করার ঔষধ সেবন করান। তাতে কিছুটা চৈতন্য ফিরে আসে। তারপর যখন জানতে পারলাম, সুলতান যবের পানি পান করেছেন, তখন আমরা সকলে আনন্দ অনুভব করলাম। সে রাতে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকি। জামালুদ্দীন ইকবালের নিকট সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ভেতরে গিয়ে তুরান শাহকে জিজ্ঞেস করে এসে আমাদেরকে জানালেন, সুলতানের উভয় ফুসফুসে বাতাস চলাচল করতে শুরু করেছে। আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। জামালুদ্দীনকে বললাম, আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন অবশিষ্ট শরীরে ঘামের লক্ষণ আছে কিনা। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখে ফিরে এসে জানালেন, অনেক ঘাম আসছে। এটি শুভ সংবাদ ছিলো। আমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে আসি।'...

'পরদিন মঙ্গলবার। সফরের ২৬ তারিখ। সুলতান আইউবীর অসুস্থতার একাদশ দিবস। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। আমাদেরকে জানানো হলো, ঘাম এতো বেশি ঝরছে যে, বিছানা বেয়ে

মেঝেতে গিয়ে পড়ছে। সংবাদটা ভালো ছিলো না। শরীরের রস-আদ্রতা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো। ডাক্তারগণ বিস্ময়ের সঙ্গে জানালেন, শরীর ভেতর থেকে শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুলতানের দেহে শক্তি বহাল রয়েছে।'...

'সুলতান আইউবী পুত্র আল-মালিকুল আফজাল দেখলেন, সুলতানের সেরে ওঠার কোনো আশা করা যাচ্ছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ আমীর-উজিরদের থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সকল বিচারপতিকে রেজওয়ান মহলে সমবেত করে বললেন, আপনারা কাগজ প্রস্তুত করে দিন, যাতে সুলতান আইউবী যতোদিন বেঁচে থাকবেন তাঁর আনুগত্যের হলফনামা থাকবে এবং তাঁর ওফাতের পর আল-মালিকুল আফজাল। আল-আফজাল ওজরখাহি করে বললেন, এ হলফনামা কখনো প্রস্তুত করাতাম না। কিন্তু সুলতানের অবস্থা বিপজ্জনক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে বিধায় কাজটা না করে পারলাম না।'...

'হলফনামা প্রস্তুত হয়ে গেছে। পরদিন হলফ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আমীর-উজিরদের তলব করা হলো। সর্বপ্রথম দামেশ্‌কের গবর্নর সা'দুদ্দীন মাসউদ শপথ করেন। তারপর সাহয়ুনের গবর্নর নাসরুদ্দীন আসলেন। তিনি এই শর্তে হলফ করেন যে, তিনি যে দুর্গের গবর্নর, সুলতান আইউবীর মৃত্যুর পর সেটি তার ব্যক্তি মালিকানা বলে গণ্য হবে। সকল আমীর-উজির ও গবর্নর আনুগত্যের শপথ করলেন। দু'-তিনজন হলফ করার আগে শর্ত আদায় করে নেন। হলফনামার ভাষ্য ছিলো নিম্নরূপ–

'এই মুহূর্ত থেকে বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরে আমি আল-মালিকুন নাস্‌র (সালাহুদ্দীন আইউবী)-এর অনুগত থাকবো, যতোদিন তিনি জীবিত থাকেন। তাঁর শাসন ক্ষমতাকে অটুট রাখার লক্ষ্যে অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবো। তাঁর খাতিরে নিজের জীবন, সম্পদ, তরবারী, সৈন্য এবং প্রজাদের ওয়াক্‌ফ করে দেবো। আমি তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ–নিষেধ মান্য করবো এবং তাঁর প্রতিটি আকাঙ্খা পূর্ণ করবো। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সুলতান আইউবীর পর এই আনুগত্য তাঁর পুত্র আল-মালিকুল আফজালের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেবো এবং তারপরে আল-মালিকুল আফজালের পুত্রদের জন্য। আমি আল্লাহকে হাজির-নাজির জ্ঞান করে প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করবো। তার জন্য নিজের জান-মাল, তরবারী ও সৈন্যদের ওয়াক্‌ফ করে রাখবো। এই আনুগত্যের শপথে আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি।'...

হরফনামার অপর অংশ ছিলো–

'আমি যদি আমার এই হলফের বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহলে এই শপথ ভঙ্গের দায়ে আমার স্ত্রী-স্ত্রীগণ তালাক হয়ে যাবে, আমি সকল ব্যক্তিগত ও সরকারি চাকরদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো এবং আমি খালি পায়ে পদব্রজে হজ্ব করতে বাধ্য থাকবো।'...

'৫৮৯ হিজরীর ২৬ সফর মোতাবেক ১১৯৩ খৃস্টাব্দের ৩ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর অসুখের একাদশ দিবস। তাঁর শরীরের শক্তি-সামর্থ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর বেঁচে থাকার আশা নেই। রাতে এমন এক সময়ে আমার ও কাজী আল-ফজল ইবনে যকির ডাক পড়ে, যে সময়ে পূর্বে কখনো ডাকা হয়নি। ইবনে যকির পুরো নাম আবুল মাআলী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। হযরত ওসমান (রা.)-এর বংশের লোক। আইন ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার পর সুলতান আইউবী মসজিদ আকসায় প্রথম জুমার খুতবা দেয়ার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছিলেন। পরে তাঁকে দামেশ্‌কের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিলো।'...

'আমরা গেলে আল-মালিকুল আফজাল বললেন, আপনারা তিনজন বাকি রাত সুলতানের সঙ্গে থাকুন। তিনি শোকাহত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজী আল-ফজল আপত্তি তুলে বললেন, রাতভর মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে সুলতানের স্বাস্থ্যের সংবাদ শোনার অপেক্ষা করে। আমরা যদি সারারাত ভেতরে থাকি, তাহলে তারা অন্য কিছু ভেবে বসবে এবং নগরীতে ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। আল-আফজাল যুক্তিটা মেনে নেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আপনারা চলে যান। তিনি আমাদের পরিবর্তে ইমাম আবু জাফরকে ডেকে পাঠান। ইমাম আসলে আল-ফজল বললেন, আপনি সুলতানের কাছে থাকুন। আল্লাহ না করুন যদি রাতে মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলে তাঁর শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি।'...

'পরে ইমাম আবু জাফর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনের শেষ রাতের যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, আমি তা লিপিবদ্ধ করছি। তিনি বলেছেন, আমি সুলতান আইউবীর শিয়রে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। সে সময় সুলতান কখনো অচেতন হয়ে পড়ছিলেন, কখনো জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলেন। আমি বাইশতম পারার সূরা আল-হজ্ব তিলাওয়াত করছিলাম। যখন পড়লাম– 'আল্লাহই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী ও সত্য। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন

এবং প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন।' তখন আমি সুলতানের কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বলছিলেন– 'এটা সত্য কথা। এটা সত্য কথা।' এই ছিলো সুলতান আইউবীর জীবনের শেষ উচ্চারণ। তাঁর অল্পক্ষণ পরেই কানে ফজরের আযান ভেসে আসে। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। আযান শেষ হওয়ামাত্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী অতি নীরবে ও শান্তিতে ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান। ইমাম আবু জাফর আমাকে আরো বলেছেন, যখন আযান শুরু হয়, তখন সুলতান একটি আয়াত পড়ছিলেন– "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমরা তাঁরই নিকট সাাহয্য প্রার্থনা করি।" সে সময়ে তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠেছিলো। চেহারাটা তাঁর জ্বলজ্বল করছিলো। সেই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যান।'...

'আমি যখন গিয়ে পৌঁছি, ততোক্ষণে সুলতান আইউবী ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে চলে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর জাতির গায়ে কোনো কারণে সত্যিকার অর্থে যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে, সে ছিলো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মৃত্যু। দুর্গ, নগরী, জনতা ও তাবৎ পৃথিবীর মুসলমানদের উপর এমন এক কালো মেঘ ছেয়ে যায় যে, একমাত্র আল্লাহই জানতেন, তা কতো গভীর ও গাঢ় ছিলো। সাধারণত মানুষ প্রিয়জনের জন্য জীবন দেয়ার কথা বলে থাকে। কিন্তু কাউকে জীবন দিতে দেখা যায়নি। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারবো, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনের শেষ রাতে কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, সুলতানের পরিবর্তে কে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছো, তাহলে আমাদের মধ্যে বহু মানুষ নিজেদের জীবন কুরবান করে সুলতানকে বাঁচিয়ে রাখতো।'...

'সেদিন নগরীতে প্রতিজন মানুষকে অশ্রুসিক্ত দেখা গেছে। জনতা ক্রন্দন ছাড়া সব ভুলে গিয়েছিলো। কোনো কবিকে শোকগাঁথা শোনাবার অনুমতি দেয়া হয়নি। কোনো ইমাম, বিচারপতি কিংবা কোনো আলিম জনতাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেননি। তাঁরা নিজেরাই ডুকরে কাঁদছিলেন। সুলতান আইউবীর সন্তানরা কাঁদতে ও চীৎকার করতে করতে রাস্তায় নেমে পড়েছিলো। তাদের দেখে মানুষের কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিলো।'...

'যোহর নামাযের সময় হয়ে গেছে। ততোক্ষণে সুলতানকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয়ে গেছে। আদালতের এক কর্মকর্তা আদ-দালায়ী সুলতানকে জীবনের শেষ গোসল করান। আমাকে বলা হয়েছিলো। কিন্তু আমার মন

অতোটা শক্ত ছিলো না। আমি অস্বীকার করি। মাইয়েতকে বাইরে রাখা হয়েছে। যে কাপড়খানা দ্বারা লাশ ঢেকে রাখা হয়েছিলো, সেটি কাজী আল-ফজল দিয়েছিলেন। যখন জানাযা জনতার সম্মুখে রাখা হলো, তখন পুরুষদের ক্রন্দনরোল আর মহিলাদের চীৎকারে আকাশের কলিজাও বুঝি ফেঁটে যেতে শুরু করেছিলো।'...

'কাজী মুহিউদ্দীন ইবনে যাকী নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সুলতান আইউবীর নামাযে জানাযায় কতো মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলো, আমি তার সংখ্যা বলতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারবো, কান্না আর ফোঁপানির কারণে কেউ দু'আ-কালাম পাঠ করতে পারছিলো না। অনেকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চীৎকার করে করে কাঁদছিলো। জামাতের চারদিকে মহিলারা জড়ো হয়ে মাতম করছিলো। নামাযে জানাযার পর লাশের খাটিয়া বাগিচার সেই ঘরটিতে রাখা হলো, যে ঘরে সুলতান আইউবী অসুস্থতার দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলেন। আসরের সামান্য আগে মহাকালের মহানায়ক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দাফন সম্পন্ন করা হয়। জনতা যখন নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছিলো, তখন মনে হয়েছিলো যেনো কতগুলো লাশ হেঁটে যাচ্ছে। আমি সঙ্গীদের নিয়ে কবরে কুরআন পাঠ করতে থাকি।'...

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবনে দু'টি বাসনা ছিলো। ফিলিস্তীনকে খৃস্টানদের থেকে মুক্ত করা এবং হজ্ব করা। তাঁর প্রথম বাসনাটি পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি অর্থের অভাবে পূরণ হয়নি। তাঁর কাছে হজ্ব করার মতো অর্থ ছিলো না। ব্যক্তিগত পকেট শূন্য ছিলো। নবচন্দ্রের কাঁচি দ্বারা ক্রুসেডীয় ফসল কর্তনকারী মর্দে-মুজাহিদ, মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের সম্রাট এমন গরীব ছিলেন যে, অর্থাভাবে হজ্ব করতে পারেননি! তাঁকে যে কাফন পরানো হয়েছিলো– সে আমি, কাজী আল-ফজল ও ইবনে যাকী চাঁদা করে ক্রয় করেছিলাম।'...

আজো ফিলিস্তীন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য তেমনি মাতম করছে, যেমন করেছিলো ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ দামেশ্‌কের নারীরা।

[সমাপ্ত]

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে ফেলে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ISBN 984-8925-09-9